শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ বি, এ,

প্রণীত।

১৯১৫।

প্রকাশক
শ্রীআশুতোষ ধর
'আশুতোষ' লাইব্রেরী ৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা।

ঢাকা,
আশুতোষ প্রেসে
শ্রীরেবতীমোহন দাস দ্বারা মুদ্রিত।

'মৃগনাভি'র

এই

গল্পাঞ্জলি

আমার প্রত্যক্ষ দেবতা

শ্রীযুক্ত রাজা শিবকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর

পিতৃদেবের শ্রীচরণে

পরম ভক্তিভরে

উৎসর্গ করিলাম।

কৈফিয়ৎ

কোনো নিপুণ সাহিত্যিককে সারথি করিয়া তাঁর প্রশংসা পত্রের আড়ালে নিজের অক্ষমতা ঢাকিয়া আত্ম-প্রকাশ করাটাকে আমি বড় ভয় করিয়া চলি। কারণ, নিজের অক্ষমতার জন্য দায়ী যে আমি ছাড়া আর কেহ নয়—পাঠক পাঠিকার নিকট একথাটাও কোনো প্রশংসা-পত্রের আড়ালে ঢাকা পড়িবার নয়। সেই জন্য হাল-ফ্যাশন বজায় রাখিতে চেষ্টা না করিয়া নিজের 'কৈফিয়ৎ' নিজেই লিখিতে বসিয়াছি।

সাহিত্য চর্চ্চা, এমন কি সৌখীন সাহিত্য-চর্চ্চাও মস্ত একটা সাধনা। এ পথে যাঁরা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁরা জানেন, মা সরস্বতীকে তুষ্ট করিতে হইলে, এক জীবনের একাগ্র নিষ্ঠার প্রয়োজন। একটা অখণ্ড মানবজন্ম রাজস্ব দিয়া মা সরস্বতীর মনোরঞ্জন করা, ঠিক আমাদের মত সৌখীন সাহিত্যিকের কর্ম্ম নয়। বাংলায় দু চার জনই সাহিত্যের জন্য এমন করিতে পারিয়াছেন এবং তাঁর সেই পরিমাণে সিদ্ধিলাভও করিয়াছেন, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

কিন্তু সত্যের খাতিরে আমাকে স্বীকার করিতে হইবে, দুর্লভ মৃগনাভির পাগল-করা সৌরভের খোঁজে আমি অনেক দিন হইতেই বাংলার সাহিত্য-কুঞ্জে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছি। হৃদয়ের কস্তুরী ফোটে নাই,—গন্ধ কোন্ সুরলোক প্লাবিত করিয়া ছুটিয়া আসে, বলিতে পারি না,—কিন্তু আমার নিকট সে গন্ধের আভাষ টুকু মিথ্যা নয়, তাই আমার এত ছুটাছুটি! সে ছুটাছুটিও আবার অনেকটা তাদেরই মত,—যাদের দু একটার নাভিতে কচিৎ কখনো কস্তুরী জন্মিয়া

সমুদয় বন ভূমি ও হৃদয়-ভূমি পাগল করিয়া দেয়। এই ছুটাছুটি করিতে করিতে চিত্তের ভিতরে যা কুড়াইয়া পাইয়াছি, তাকেই আমার নিকট মৃগনাভি বলিয়া মনে হইয়াছে ;—বাস্তবিক সে মৃগনাভি নয়। খাঁটি জহুরীর নিকট জিনিষটা যে কি, নিত্য সত্যের নিরিখে যে তার সঠিক মূল্যই বা কত টুকু, সে সব দুর্ভাবনা আমার না করিলেও চলে। তবে এইটুকু বলিয়া রাখা দরকার, যে আমার এই ভুলের মধ্যেই 'মৃগনাভি'র জন্ম। পাঠক-পাঠিকাদের এ কথাটা সূচনাতেই বলিয়া রাখার উদ্দেশ্য এই যে, একথাটা আগে জানা থাকিলে, তাঁরা গ্রন্থকারের অনেক ত্রুটী সহজেই মার্জ্জনা করিতে পারিবেন।

বাংলা ভাষায় গল্প লিখিতে বসিয়া, খাঁটী বাংলার মাটী হইতে আমি খুব বেশী রস সংগ্রহ করিতে পারি নাই,—তার কারণ নিজের জীবনে অভিজ্ঞতার অভাব। জীবনের দৈর্ঘ্যের মাপে সকলের অভিজ্ঞতা জন্মে না। ছোট গল্পের সাজিটী সমগ্র মানব জীবনের বিচিত্রতায় ভরিয়া তোলাও যে-সে কথা নয়। গল্প লিখিতে গিয়া অনেক বড় বড় লেখককেও মূল-ধনের অভাবে নাকি অনেক সময় চোরাই মালের সেনাক্তের দাগ মুছিয়া, নিজের মাল বলিয়া সেগুলিকে বাজারে চালাইতে হইয়াছে, এমন প্রমাণ ঢের পাওয়া যায়। 'মৃগনাভি'র গ্রন্থকারও এ আন্-লিমিটেড্ কোম্পানীর এক জন অংশীদার, এ ন্যায্য স্বত্বের দাবী অস্বীকার করা যায় না। তবে, আমি চোরাই মাল ও নিজের মালগুলি এক সঙ্গে সাজাইয়া পাঠক-পাঠিকার নিকট উপস্থিত হইতেছি। আমি বলিয়া না দিলেও কোন্ গল্পটা আমার নিজস্ব কোন্টা পরস্ব, সেটা চতুর পাঠক পাঠিকার পক্ষে বাছিয়া লওয়া কঠিন হইবে না।

ছোট গল্পের দৈর্ঘ্যের দিকে নজর রাখিয়া, কথা ফেণাইবার লোভ সব সময় সম্বরণ করিতে পারি নাই। এ চার্জ্জের উত্তরে আমার

কৈফিয়ৎ এই যে, আর্ট জিনিষটা পাকা লোকের হাত হইতে কাঁচা লোকের হাতে পড়িলে যে তার কি দুর্দ্দশা হয়, এটা তারি অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মাত্র !

তবু, এত অক্ষমতার চিহ্ন বুকে লইয়াও 'মৃগনাভি' মুদ্রা-বন্ত্রের মোহ এড়াইতে পারিল না কেন, তার কারণ পূর্ব্ববঙ্গের মাটীতে এ পর্য্যন্ত ছোট গল্পের অঙ্কুর ভাল করিয়া গজায় না। 'মৃগনাভি' এ হিসাবে খাঁটী পূর্ব্ববঙ্গের জিনিষ বলিয়া, ইহার একটা স্বতন্ত্র দর আছে মনে করি। যখন'সৌরভ' 'প্রতিভা' ও 'ঢাকা-রিভিউ' প্রভৃতির শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয়দের স্নেহ ও সৌজন্যে আমার গল্পগুলি মাসিক-পত্রে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের অনেক পরিচিত অপরিচিত, সাহিত্যিক ও অসাহিত্যিক আমার নব-জাত গল্পগুলিকে কি পরিমাণ স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন, সে কথা আমি কখনো ভুলিতে পারিব না। অনেক লোকের ভাল-লাগার মধ্যেই ছোট গল্পের সার্থকতা। তাই অনেক ত্রুটীর বোঝা মাথায় লইয়াও আজ 'মৃগনাভি' বাংলার সাহিত্যের মজলিসে উপস্থিত করিতে সাহসী হইলাম।

সুসঙ্গ—দুর্গাপুর—
ঝুলন পূর্ণিমা—শ্রাবণ,
১৩২২।

শ্রীসুরেশচন্দ্র শর্ম্মা।

সূচী।

যাদুকর

আমি যখন সম্পদের মাঝখানে, তখন সে অতি দীন হীন কাঙ্গালের বেশে আমার দ্বারে এসে উপস্থিত হলো। যে সময়ে সে এ বিপুল সংসারে অনাথ, সঙ্গী-হীন ও নিরাশ্রয়, তখন আমারি অন্নবস্ত্রে সে মানুষ হয়েছে।

আমার বাড়ীতে তার আসার দিনটার কথা আজো আমার বেশ মনে পড়ে। তারিখটা ডায়েরির এক কোণে লেখা ছিল—২৬শে জানুয়ারী। তখন হিমের দৌরাত্ম্য বসন্ত-লক্ষ্মীর নুপুর-বাঁধা পদ-পল্লবের সুন্দর আঘাতে অনেকটা কোমলভাব ধারণ করেছে। দু একটা খঞ্জন তখনো চোখে পড়িত বটে ;—কিন্তু কোন্ এক অজানা দেশের পানে তখন তাদের পাখা চঞ্চল হয়ে উঠেছে! কুহুরব দীর্ঘতর মধুময় হয়ে আসছিলো। বৃক্ষলতার উপর তরুণ শ্যামলতা সবে রেখা দিয়ে উঠেছে,—বসন্ত যেন 'আসি' 'আসি' করছিল!

এমন দিনে, হঠাৎ এক দিন ভোর হতে না হতে ঘুম থেকে উঠে পড়লাম। তখনো ভাল করে ফরসা হয় নাই; ঘন-কুহেলীর মাঝে পূর্ব্বাকাশের আলোকতট তখনো অস্পষ্ট! পশ্চিম আকাশে ম্লান-

তারার ছিন্নহার গলায় পরে অন্ধকার ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। শুধু প্রভাতের শুকতারাটী কুয়াশার ভিতর দিয়ে বাষ্পাকুল অনিমেষ-নয়নে আমার পানে চেয়ে ছিল। বাড়ীর সমুখে পুকুর,—তার ঢালু পাড় থেকে জল অনেক নীচে নেমে গিয়ে, তট ও জলরেখার মাঝে কচি সেঁওলা দিয়ে একটা সবুজ স্নেহের সম্পর্ক, একটা বিচিত্র মায়া-বন্ধন রচনা করে রেখেছে। সে সময় আসন্ন প্রভাতের পানে চেয়ে জলে শত শত পদ্মের কুঁড়ি রাঙ্গা হয়ে উঠ্‌ছিল! বাঁকা চাঁদ ক্ষীণ-পাণ্ডুর বিরহের ছন্দে হেলে পড়েছেন—অন্ধকার তাঁর নীল বসনের প্রান্ত ধরে টান্‌ছিল! এমন সময় সে অপরিচিত, নামগোত্রহীন অভ্যাগতটীর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ! তখন সৌজন্য ও করুণা বই আমার নিকট তার আর কোন পাওনার দাবী ছিল না। তাই সে নিতান্ত শরণাগতের মত, অত্যন্ত বিনীতভাবে আমার কৃপার ভিখারী হয়ে উপস্থিত হলো!

কেউ জানে না, কোথা থেকে এলো সে—কোথা বা তার ঘর, আর কোথাই বা তার দেশ! সে তার বিদেশী ভাষায় কেঁদে কেঁদে যে কি বল্লে, তাও ভাল করে কিছুই বুঝ্‌তে পারা গেল না। কিন্তু ঠিক জানি না কেন,—তাকে দেখেই আমার মনে হলো যেন বহু দূরের যাত্রী সে,—বহু দূর থেকে, অনেক যাতনার পর আজ সে এখানে এসে পৌঁছাতে পেরেছে! দুর্ব্বল পা দুখানিতে ভর করে দাঁড়াবার শক্তি তার ছিল না। দাসদাসীদের জিজ্ঞাসা করে জান্‌তে পেরেছি যে, আজ সকালে আমারি প্রাঙ্গনে তাকে অতি নিরুপায় অবস্থায় পাওয়া গেছে—সঙ্গে তার না ছিল টাকা কড়ি, না ছিল

পোষাক পরিচ্ছদ! বাস্তবিক পথের ভিখারীকেও অমন রিক্ত সাজে, অমন সুর্ব্ব-শূন্য দৈন্যের রাজবেশে, বড় একটা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না!

সে তখন নিতান্ত দুর্ব্বল ও রক্তহীন। তাঁর ইঙ্গিতে আর্ত্তনাদে তারা শুধু এই মাত্র বুঝতে পেরেছে যে, সে শুধু একটু আশ্রয়ের ভিখারী। তাই দাসদাসীরা তাকে আমার নিকট এনে হাজির করেছে। এ ছাড়া তার সম্বন্ধে আর কারো কিছু জানা ছিল না—জান্‌বার উপায়ও ছিল না!

আমি খানিকক্ষণ সে নবাগত আগন্তুকটীর পানে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলাম—দেখে মনে হলো যেন সে একশো বছরের বৃদ্ধ! মাথাজোড়া একখানা টাক্—দেখ্‌তে অনেকটা গাছ গাছড়া ছাড়ানো একখানা পরিষ্কার প্লেটোর মত! মুখে গালে সর্ব্বত্র ঢিলা চামড়া কুঞ্চিত হয়ে গেছে। গায়ের রং অত্যন্ত ফ্যাকাসে—সমস্ত রাত্ ধরে জলে ভিজ্‌লে যেমনটী হয়, তেম্‌নি! কিন্তু সব চেয়ে তার চোক দুটী দেখে আমি একেবারে অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম। তার গাঢ় নীল চক্ষুদুটীর ভিতরে যেন লেখা ছিল—কত কালের অভিজ্ঞতা! সে যখন আমার পানে চাইত, তখন আমার ভিতরটা শরতের আকাশের মতো স্নিগ্ধ নীলিমায় রঞ্জিত হয়ে যেতো! মনে হতো যেন তার সুনীল দৃষ্টি উর্দ্ধে নীলাকাশ পর্য্যন্ত প্রসারিত—সে দৃষ্টির মাঝে যেন কত শতাব্দীর সুখদুঃখের সকরুণ ইতিহাস নীরবে লীন হয়ে আছে! এত সুখদুঃখের ভিতর দিয়ে যে এসেছে, তার পক্ষে সেদিনকার পথের কষ্ট অতি সামান্য,—তার প্রশান্ত চোক দুটী ভরিয়া যেন এই সান্ত্বনার কথাটীই দুটি প্রফুল্ল নীলোৎপলের মতো ফুটে উঠ্‌ছিল!

স্নেহ ও সমবেদনার সজল স্পর্শে সেবার তীর্থসলিল আমার হৃদয়ে আপ্‌নি উছলে উঠ্‌লো। আমি অতি কোমলভাবে, নিতান্ত আপনার মতো সে পথের কাঙ্গালকে আপনার ঘরে তুলে নিলাম।

অভ্যাগতের পরিচর্য্যার ভার স্ত্রীকে দিয়ে তাকে বল্‌লাম—"যেমন করে হোক্, আগে একে কিছু খাওয়াবার বন্দোবস্ত কর—জীবন মরণ এখনো ওর দুপাশে বসে আড়াআড়ি কচ্ছে!"

আমার কথার প্রতিবাদ করা কোনো কালেই আমার স্ত্রীর স্বভাব নয়। কিন্তু তবু সেদিন তিনি যে ভাবে আমার আদেশ গ্রহণ করলেন, তাতে এমনি একটা বিশেষ সৌন্দর্য্য ছিল যে, আমি তাতে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম, একথাটা অকপটে স্বীকার করলেও আমি স্ত্রৈণ বলে কবুল জবাব দিতে রাজি নই! বাস্তবিক সেদিনকার মত স্ত্রীকে আমি আর কখনো অত সুন্দর দেখি নি! শুধু স্ত্রীর উপর কেন, —সমুদয় নারী জাতির উপর—সেদিন আমার সমুদয় অন্তঃকরণটা একটা নূতনতর শ্রদ্ধার ভারে শিশিরার্দ্র পুষ্পগুচ্ছের মত নত হয়ে পড়েছিল!

[২]

মানুষের সহৃদয়তা যে চিরকালই অকৃতজ্ঞতার হাতে লাঞ্ছিত হয়ে আস্‌চে, সে কি করুণাময় বিধাতারই বিধান?—নিশ্চয় তাই হবে! নচেৎ আমি যাকে এত কষ্ট করে, এত যত্ন করে, কোনো মতে বাঁচিয়ে তুলেছিলাম, সে আমাকে কিরূপে পুরস্কৃত করেছিল?

কথাটা এখানে একটু স্পষ্ট করে বলা দরকার। আমি তো সে

অনাথকে আমার সংসারে বরণ করে নিলাম। কিছু দিন যত্ন-শুশ্রূষা করার পর, সে অবশ্য অনেকটা সুস্থ বোধ করলে। অবস্থা-বিপাকে পড়েও সত্যের খাতিরে একথা আমার অস্বীকার করবার যো নাই যে বয়সের দরুণ ও দীর্ঘ-পথশ্রমে প্রথম কিছু দিন তাকে আমার ঘরে, শীর্ণ বাতব্যাধিগ্রস্থ রোগীর মত চলচ্ছক্তিহীন অবস্থায় বাস করতে হয়েছিল। এর মধ্যে কোন ফন্দি ছিল কি না জানি না, কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত সে এমন হাব ভাব দেখাতে লাগ্‌লো, যেন উঠে হেঁটে চলে ফিরে বেড়াবার ক্ষমতা তখনো তার হয় নি।

আরো কিছু দিন গেল—ধীরে ধীরে তার শরীর থেকে অক্ষমতা ও ব্যাধির চিহ্ন সব দূর হয়ে গেল। যেন তার ক্ষীণ জীবনীশক্তির মাঝে একটি স্বচ্ছ লাবণ্যের ছায়া; একটা নবজীবনের জোয়ার এসে লাগ্‌চে, এমন মনে হতে লাগলো। যাক্, তাতে আমার খুসী হওয়া ছাড়া দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই—আমার অন্নের ভিতর এমন কি গুণ ছিল যে, যেদিন থেকে আমার অন্ন তার উদরসাৎ হলো, সেই দিন থেকে, তার আমার গৃহ ত্যাগ করবার আর কোন মতলব দেখা গেল না! ক্রমশঃ আমার মনে সন্দেহ প্রবল হয়ে উঠতে লাগ্‌লো যেন কি একটা গোপন মতলব হাসিল করার জন্য সে আমার দ্বারস্থ হয়ে দিন দিন গৃহস্থ হয়ে উঠ্‌ছে!

যতই দিন যেতে লাগ্‌ল ততই যেন আমি দিব্য চক্ষে দেখতে লাগ্‌লাম আমার নিজের দাসদাসী তারি আজ্ঞা পালনে ব্যস্ত, স্ত্রী সর্ব্বদা তারি মন পাওয়ার জন্য তারি সেবা শুশ্রূষা নিয়ে অস্থির। কি ভয়ঙ্কর সত্য কথা! পথের পথিক হয়ে স্ত্রীর হৃদয়ের ন্যায্য অধিকার

হতে স্বামীকেই বেদখলের চেষ্টা! তা সে যতই ভয়ঙ্কর হোক না কেন, সত্যকে আমি কিছুতেই চোখ টিপে দূরে রাখতে পাচ্ছিলাম না। যতই তার বিরুদ্ধ-দখল পাকা সত্বে পরিণত হতে লাগলো, ততই দেখতে লাগলাম, আমার সংসার সাম্রাজ্যে একটা স্বেচ্ছাচারী হিংস্রস্বভাব ছোট খাটো তুরস্কের সুলতান অধিষ্ঠিত হয়েচেন। সে যতই গৃহের সকলের উপর তার দ্বিধাহীন কড়া হুকুমগুলি জারি করতে আরম্ভ করলে, ততই যেন অধিকারের সূত্র আমার হাত থেকে খসে খসে পড়তে লাগল!

আমার চোখের উপর একটা বিরাট প্রলয় নিঃশব্দে নিরাপদে ঘটে যাচ্ছিল, অথচ আমি সব বুঝে সুঝেও যেন কিছুতেই ঘটনার এই অব্যাহত স্রোতে বাধা দিতে পাচ্ছিলাম না। পথের রাখাল বত্রিশ সিংহাসনে চড়ে রাজা হয়ে বসলো, আর আমি রাজা, রাজতক্ত পায় ঠেলে, রাজপোষাক ছিঁড়ে ফেলে, পথের রাখাল হতে চল্লাম! জগতে এর চাইতে বিচিত্র ব্যাপার, এর চাইতে বিরাট পরিবর্ত্তন আর কি হতে পারে? কিন্তু যাহা নীরব, তাহাই সামান্য নয়, যাহা আশ্চর্য্য, তাহাই অসম্ভব নয়। আমি আমার সহৃদয় পাঠকপাঠিকাদিগের নিকট বিনীতভাবে নিবেদন কচ্ছি, এজগতে সত্য অনেক সময় স্বপ্নের চাইতেও বিচিত্রবেশে দেখা দেয় বলে, সত্যকে ভ্রান্তি বলে অবিশ্বাস করা চলে না!

আরো কিছু দিন গেলে পর দেখা গেল, গৃহের চাকর বাকর এমন কি, স্ত্রী পর্য্যন্ত সে বিদেশীর ভাষা অনেকটা বুঝে নিয়েছে। একদিন দেখা গেল, "বিদেশী" বললে সে বিলক্ষণ চটে! আমি কি তবে নিজ গৃহে নির্ব্বাসিত, আমার কি তবে "যথারণ্যং তথা গৃহম্?"

প্রশ্নবোধক সন্দেহের কোনো কারণ ছিল না। আমি দিব্যচক্ষে স্পষ্ট দেখ্‌ছিলাম, যতই তার অধিকারের সীমা স্পষ্টতর হয়ে উঠ্‌ছে, আমি ততই ছায়ার দিকে সরে পড়ছি!

ওহে পান্থ, ওগো বিদেশী! কোন্ মায়াযষ্টির পরশে তুমি বিদেশকে স্বদেশের মত আপন করে নিয়ে পরকে মায়ায় ভুলিয়ে রেখেছ, কোন্ যাদুমন্ত্রে আমায় আপনার ঘরে বন্দী করে পলায়নের পথটী শুদ্ধ বন্দ করে রেখেছ, সেই গোপন কথাটী আমায় বলে দাও!

[৩]

আমার বাড়ীতে যে কামরায় সে দুর্গ রচনা করে আমার সংসারটীর উপর অজস্র গোলাবৃষ্টি কচ্ছিল, সে ঘরে, তার পাশে বসে নীরবে অনেকদিন অনেক কথা ভেবেছি। তার নীল চক্ষুর ভিতরে তার জীবন-রহস্য বুঝবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি। অনেক দিন স্বামী স্ত্রীতে নির্জ্জনে বসে ভেবেছি—কি তার ব্যবসা, কেনই বা তার এখানে আসা! সে কি বণিক্ না যাত্রী, ব্যবসায়ী না ভিক্ষুক, পথিক না চোর?—কে বলিতে পারে সে কি!—কেই বা তার তত্ত্ব জানে!

একদিন হঠাৎ আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল! একদিন সে অভ্যাগতটীর পাশে বসে আমার অভ্যাস মত তার ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান চিন্তা কচ্ছি—এমন সময় আমার নিজের শরীরটা হঠাৎ যেন বড় ভার ভার ঠেক্‌তে লাগলো। কাঁধ থেকে যেন বয়সের বোঝা গায়ের উপর ঝুলে পড়ে আছে,—সে ভার যেন আর বইতে পাচ্ছিনা। মনের

ভিতরেও এমনি একটা দুর্ভর বোঝা আমায় কেবলি মাটীর দিকে টান্‌ছিল! যখন এমনি মনে হচ্ছিল, তখন হঠাৎ তাকিয়ে দেখি—হরি! হরি!—আমার অভ্যাগতটীর শরীরের উপর থেকে স্থবিরভাব একেবারে অন্তর্হিত! তার স্বচ্ছ কপোলের উপর তরুণ যৌবনশ্রী একেবারে গোলাপী হয়ে উঠেছে! চোখের নীলতারা নির্গলিতাম্বুগর্ভ শরতের আকাশের মত, এক মধুর উজ্জ্বলতায় হেসে উঠেছে! কোথায় বা তার অতিথির মত কুণ্ঠিত ভাব, সলজ্জ চাহনি, কোথায় বা তার সে কাঙ্গাল বেশ, বিকল দেহ! তার অতীতে দুঃখকষ্ট, অক্ষমতা জড়তা, কাচের সাসি থেকে বাষ্পরেখাটীর মত, কখন যে কোথায় মিশে গেল, কে জানে!

আর সন্দেহ নাই। আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, আমার যৌবনের সজ্জিত কক্ষে সিঁধ কেটে চোর প্রবেশ করেছে। এ প্রলাপ নয়, কাহিনী নয়, সে অকৃতজ্ঞ পথিক বৃদ্ধ—আমার প্রস্ফুটিত যৌবন অপহরণ করেছে, আর আমি বিনা বাক্যব্যয়ে, রিক্তহস্তে, বার্দ্ধক্যের যষ্টি-কমণ্ডলু তুলে নিয়েছি! এখন আমার উকীল দরবারে জিজ্ঞাস্য, ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে এ আশ্চর্য্য ঐন্দ্রজালিক চুরিটী পুলিশ ধর্ত্তব্য কোন অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে কি না?

একটা প্রবল উত্তেজনায় আমি লাফ্ দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে পড়্‌লাম। সে কামরায় দেয়ালের একপাশে একখানা বড় আয়না ঝুলানো ছিল, তার সম্মুখে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ায়ে, বার বার রুমাল দিয়ে চোখ দুটো ভাল করে মুছে নিলাম। কারণ বার বার মনে হচ্ছিল, যা দেখ্‌ছি, তা যেন স্বপ্ন, যার সামনে দাঁড়িয়ে, সে যেন মায়ার

আরসী! তা না হলে এর ভিতরে অসম্ভব সম্ভবপর হয়ে ফুটে উঠ্‌লো কেমন করে!

আমি আয়নার ভিতরে নিজে ছায়ার পানে ভাল করে তাকিয়ে দেখি, আমার কপালের উপর এক গোছা কাঁচা পাকা চুল ঝিক্ মিক্ কচ্ছে! চোখের সামনে নিঃশব্দে যাদুকরের হাতে আমার সব অপহৃত হতে চল্লো; কোথাও এর প্রতিকার নাই! এতদিনে ঠেকে শিখ্‌লাম সংসারের নিরেট সত্য কথা,—মানুষের যৌবন, তারো স্থায়িত্ব নির্ভর করে চোরের অনুগ্রহের উপর! ভারি একটা বিরক্তি বোধ করে, আয়নার সমুখ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আমি ফের আমার অভ্যাগতটীর পানে চাইলাম, দেখি—সে তখন সৌন্দর্য্যের তরুণ ভাস্কর মূর্ত্তিটীর মত আমার পানে এক-দৃষ্টে তাকিয়ে আছে, মুখে তার বিস্ময়, চোখে তার হাসি! এমন সুন্দর মানুষ জীবনে আর কখনো আমার দেখা ঘটে নাই!

গায়ে ইলেক্‌ট্রিক্ ব্যাটারী দিলে শরীরের ভিতরে যেরূপ রিম্ ঝিম্ কর্‌তে থাকে, উত্তেজনায় আমার মাথার ভিতর রক্ত তেমনি রিম্ রিম্ কত্তে লাগলো। মনে হলো কি যেন এক অদ্ভুত যাদু মন্ত্রে আমার দেহ থেকে যৌবন-শোভা চুইয়ে নিয়ে, সে তার নিজের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে দিয়েছে! নিস্পন্দ পুতুলের মত আমি অবাক্ হয়ে দেখ্‌তে লাগলাম,—এক আশ্চর্য্য প্রক্রিয়ায় প্রতি মিনিটে মিনিটে নিঃশব্দে আমাদের উভয়ের মধ্যে এই বিচিত্র প্রতিকূল পরিবর্ত্তন সংঘটন করে দিয়ে এক অসম্ভব সত্য নিজকে অতি সন্দেহাতীত ভাবে সপ্রমাণ করে তুল্‌ছে!

আমি আবার রুমাল দিয়ে ভাল করে চোখ মুছে নিল'ম। এ তো স্বপ্ন নয়, দৃষ্টিভ্রম নয়! কিন্তু যা সত্য সত্যই সর্প, তাতে রজ্জুভ্রম বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে পারে না। আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলাম, এক শাখায় তার নব যৌবন পাঁপ্‌ড়ি মেলছে, আর এক শাখায় আমার যৌবনের শুষ্ক ফুল বার্দ্ধক্যের মূলে ঝরে পড়ছে! বেশ ধারণা হলো, —সত্য কখনো মিথ্যা হবার নয়, জগতের সেই চিরন্তন সত্য—এক-দিকে উদয়, অপর দিকে অস্ত—ঠিক একি সময়ে জীবনের দুই বিভিন্ন তন্ত্রীতে দুটী ভিন্ন সুর জাগিয়ে তুলেচে!

আমি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে একেবারে স্ত্রীর খাস কামরায় এসে হাজির! এক নিশ্বাসে সব কথাটা তাঁকে বলে ফেল্লাম। সব বলা শেষ হলে পর, বল্লাম ;—

"বাড়ীতে একি ভূতুড়ে কাণ্ড আরম্ভ হয়েচে! আমি বেশ বুঝতে পারি, সে আমার রক্ত চুষে নিচ্ছে। তোমাদের সবাইকে সে মন্ত্র পড়ে বশ করে ফেলেচে, তাই দেখে শুনেও তোমরা কিছু বুঝতে পাচ্ছ না!"

স্ত্রী তখন খাটের উপর শুয়ে, চুলের তরঙ্গে ঝালর দেওয়া বালিশ-টীকে উর্ম্মিল করে দিয়ে 'জীবন সন্ধ্যা' পড়ছিলেন। আমার রকম সকম দেখে, আর কথা শুনে, তিনি হিহি করে হেসে উঠলেন! হাসিটার মানে,—তোমার নালিশ এতই আজগুবি যে একে একমাত্র হেসে উড়িয়ে দেওয়াই চলে, বৃথা বাক্যব্যয় করবার কোন আবশ্যক নাই!

আমি সত্যই একটু আহত হলাম। মানুষের সত্যির দুঃখকে

হেসে উঠিয়ে দেওয়ার ভিতরে যে নিষ্ঠুরতা, সেটা আর যাই হোক না কেন,—স্ত্রীলোকের কখনো শোভা পায় না! তাই তাঁর হাসির ভিতরকার প্রচ্ছন্ন লবণের ছিট্‌টা আমার বুকের ভিতরে কেমন কুট্ কুট্ কত্তে লাগলো! কোথাকার একটা কে, তাকে অত আস্পর্দ্ধা দেওয়া! আবার সেই কথা বল্‌তে গেলে ঠাট্টা!

সে যাহোক স্ত্রীর এজলাসে আমার মামলার চূড়ন্ত নিষ্পত্তি হয়ে হুকুম হলো যে আমার খাস দখলের মামলা একতরফা ডিশমিশ হয়। মামলা হেরে গিয়ে আমি আরো ঘাব্‌ড়ে গেলাম। আমার ভাবনা হলো যৌবন তো সে নিয়েছে, তা নিক; কিন্তু এর পর যদি সে আমার জীবনের শিকড় ধরে টান দেয়, তবে? স্ত্রী হয় তো মনে করেছিলেন পুরুষ জাতের ধাৎটাই কিছু হিংসুটে! তা তিনি যাই মনে করুন না কেন, আমি জানি সে মায়াবীর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়!

[৪]

নানা প্রকার আশঙ্কা ও দুর্ভাবনায় আমি একেবারে শুকিয়ে উঠেছি। বার্দ্ধক্যের ধবল গিরি মাথার উপর ক্রমশঃ অভাবনীয় বেগে শুভ্র হয়ে উঠ্‌তে লাগলো! অভ্যাগত মহাশয়, ততক্ষণে সুযোগ বুঝে তাঁর বার্দ্ধক্যের মুখোসটী পরিত্যাগ করে, একেবারে কিশোর হয়ে বসেছেন! তার মাথার কুঞ্চিত কালো চুলগুলিতে কালো রেসমী ঝালরের শোভা! মুখে চোখে একটী সুন্দর চম্পক-গৌর কান্তি—তার উপর পূর্ণ স্বাস্থ্যের গোলাপী আভা ফুটে উঠেছে! আর আমার

সমুদয় সম্পদ, আমার সকল অধিকার, সে হৃদয়হীন অনধিকারীর পদতলে লুণ্ঠিত!

আমার চরিত্রের দুর্ব্বলতাটা ঠিক কোন যায়গায়, তা সে এত দিনে বেশ ঠাউরে নিয়েছে। তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিবার শক্তি ও সাহস যে আমি অনেক দিন হারিয়েছি, সেটা বুঝতে আর তার বাকী ছিল না! এখন দেখি, আমাদের ভাষায় তার অধিকারটা সম্পূর্ণ নিজস্ব করে নিয়েছে।

এত দিনে বুঝতে পেলাম,—সবি তার চালাকি! ঐ সব বিদেশী হাবভাব, কথা না বুঝিবার ছল, সবই মিথ্যা! এত দিন বিদেশীর মত কুণ্ঠিত ভাবে দিন কাটিয়েছে, পিছে কেউ জিজ্ঞাসা করে "কি দরকারে এখানে তুমি এসেচো, আর কত দিন এখানে থাক্‌বে?" প্রশ্ন বুঝতে পেলে একটা জবাব দিতে হবে তো? তার চাইতে চুপ করে নিরুত্তর হয়ে থাকাটা মন্দ নয়। তাই বুঝি বোবার শত্রু নাই, এই নীতিবাক্য বর্ম্ম-স্বরূপ করে সে এত দিন আত্মরক্ষা করেছে মাত্র! এখন সে টের পেয়েছে, আর আত্মগোপনের প্রয়োজন নাই; অধিকারের সত্ব এখন স্থায়ী হয়ে গেছে, তাই সে দিনের তুর্কী সুলতান আজ দেশীয় রাজপ্রতিনিধির বেশে দেখা দিয়েছেন!

আমি আমার অপ্রত্যাশিত বার্দ্ধক্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ক্রমশঃ আরো বেশী বৃদ্ধ হয়ে পড়্‌ছিলাম। তখন দেখ্‌তে পেলাম, আমার সর্ব্বশেষ আশঙ্কা,—যেটা নিজের মনেও স্পষ্ট করে ভাবতে সাহস করি নাই,—সেটাও সফল হতে চল্‌লো! আমার স্ত্রীর স্নেহের উপর যে সে এখন আমা অপেক্ষাও বড় অংশীদার, সে কথা আর

নিজের নিকটও কোন মতে চেপে রাখবার যো নাই! স্ত্রী আমাকে পরিষ্কার বলতে আরম্ভ করেছেন যে, সে যখন তাঁর পানে তার স্নেহ-ব্যাকুল নয়ন তুলে চায়, তখন তাঁর মনে হয়, সে যেন ছোট আমি! সে তার হৃদয়ের সবখানি ভালবাসা নিয়ে যখন্ তাঁকে আক্রমণ করে, তখন তিনি বলেন, সে স্নেহ-ঝটিকার মধ্যে আমারি ব্যাকুলতা!

তবে কি সে 'আমি' হতে চল্লো, আর আমি পর হতে চল্লেম! —এ কি মৃত্যু না প্রহেলিকা!

এক দিন দুপুর বেলা মন স্থির করে, স্ত্রীর দরবারে এসে উপস্থিত হলাম। যদি সত্যই ঘর আর অরণ্য আমার সমান হয়ে গিয়ে থাকে, তবে তো এখন আমার বানপ্রস্থের ব্যবস্থা করাই শ্রেয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে তখনো আমার খানিকটা সন্দেহ, কতকটা অহমিকা ছিল— অহমিকার বড় কঠিন প্রাণ, সহজে যায় না! মনে করেছিলাম, বান প্রস্থেই হোক বা জাহান্নমেই হোক, যাবার পূর্ব্বে স্ত্রীর সঙ্গে একটা চূড়ন্ত বোঝাপড়া দরকার। এই ভেবে অসময়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম।

তখন তিনি তাঁর খাসকামরার মেজেতে মাদুর পেতে সিঙ্গারের সেলাই কলের সঙ্গে সৌহার্দ্দ স্থাপন করছিলেন। বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছিল তাঁকে! মনে হচ্চিল, আমাদের বিশ বৎসরের দাম্পত্য জীবন তাঁর মুখশ্রী হতে বিবাহরাত্রির সলজ্জ মাধুরী খানি একটুকুও মলিন করে দেয় নাই! কিন্তু আমি যে বৃদ্ধ!—অন্তরে বাহিরে সর্ব্ব-প্রকারে বৃদ্ধ! তাই অনেকক্ষণ নিজের মনে নানারূপ তোলপাড়্ করে অবশেষে বিশেষ আর কোন ভণিতা না করে, কথাটা সোজাসুজি পাড়্লাম ;—

"আমার মনে হয়, সে তোমায় ভালবাসে, একি সত্যি না শুধু আমার বুঝ্‌বার ভুল ?"

স্ত্রী সেলাইএর কল হতে মাথা না তুলেই মৃদু হেসে জবাব কর্‌লেন ;—

"না, কখ্‌খনো না, তোমার আবার বুঝ্‌বার ভুল হলো কবে ?"

আমি খানিকটা কেসে নিয়ে পর কিছু অপ্রস্তুত ভাবে বল্লাম ,— "তা, প্রতিদানটার তোমার তরফ থেকে কিছু বাড়াবাড়ি হচ্চে না ?"

এবার স্ত্রী আমার পানে স্নেহোজ্জ্বল নয়নে চেয়ে উত্তর করলেন ;—

"ঈশ্বর সাক্ষী করে বলচি, তুমি যা বল্‌চো, তা নিরেট সত্যি কথা !"

স্বামীর নিকট সাধ্বী স্ত্রীলোকেরাও সব সময় সত্য কথা বলা উচিত বোধ করেন না। এমন অবস্থায় স্ত্রী যখন আমার নিকট সত্য গোপন করলেন না, তখন আমার আত্মগৌরব অনুভব করবার ওজুহাত ছিল বটে; কিন্তু তাই বলে অমনতর ভয়ঙ্কর কনফেশন্‌টা আমার খুব মুখরোচক হয়ে ছিল, তা স্বীকার করতে পারি না !

স্ত্রীর মুখে এমন স্পষ্ট জবাব শুন্‌তে পেয়ে আমি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বাগানের ভিতরে পায় চারি করে বেড়াতে লাগ্‌লাম। বেলা দুটো ; আকাশ ভরা রোদ ! ঝল্‌সে-যাওয়া আকাশ থেকে সূর্য্যদেব যেন পৃথিবীর উপর অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ কচ্ছিলেন। আমি চিন্তিত ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন সময় চপলপ্রকৃতি নৃত্যশীল স্বর্ণ-মৃগটার মত সে অভ্যাগতটা হাস্‌তে হাস্‌তে আমার নিকট উপস্থিত ! আমি কোনো কথা বললুম না। কথা বলার জন্য মনের ভিতর হতে কোনপ্রকার তাগিদ ছিল না ! তাকে আস্‌তে দেখে একটা

বকুলগাছের ছায়ায় আমি গম্ভীর ভাবে লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

সে আমার কাছে এসে, কোনোরূপ শিষ্টাচারের অপেক্ষা না রেখে, স্পষ্টাস্পষ্টি বলে উঠ্‌লে ;—

"তোমার সোণার ঘড়িটা আমায় দাও দেখি ?"

আমি অবাক হয়ে বল্‌লাম ;—

"বাঃ ! আমার ঘড়ি তোমায় দিতে যাবো কেন ?"

সে জোরে হি হি করে হেসে উঠ্‌লো !—যেন অমনতর আশ্চর্য্যের কথা সে জীবনে আর কখনো শোনে নাই !

তার পর হাসির উচ্ছ্বাসটা কিছু থাম্‌লে পর সে উত্তর কল্লে ;—

"আমার খুসী, তোমায় দিতে হবে !"

আমি রাগের চাইতে বেশী দুঃখিত হয়ে বল্‌লাম,—

"অমন কড়া হুকুম রাজা-বাদসাদেরই দেওয়া সাজে। তোমার আমার মুখে শোভা পায় না !"

আমার কথা শুনে, সে ঠিক্ বাদসাহী কড়া মেজাজেই বল্লে, —

"তুমি যে কতখানি বুড়ো হয়ে পড়েচো, তা এখনো টের পাচ্চ না ? এখনো তোমার সোণার ঘড়ির সখ গেল না ?—আশ্চর্য্য !"

কথাটা শক্ত, অপ্রিয় ও আশ্চর্য্যজনক, কিন্তু তাই বলে অসত্য নয়। সুতরাং তার উপহাসটা তীরের মত আমার হৃদয়ের অশ্রুবাষ্প ভেদ করে একেবারে মর্ম্মস্থলে গিয়ে বিদ্ধ হলো। আমি আর কোন কথা না বলে নিঃশব্দে পকেট হতে সোণার ঘড়িটী বের করে তার হাতে দিয়ে অশ্রুজড়িত কণ্ঠে বলে উঠ্‌লাম ;—

"তাইতো! এই নাও তোমার ঘড়ি! নিতে আর আমার বাকী রেখেচো কি তুমি, যে তুচ্ছ একটা ঘড়ি তোমার হাত থেকে ছিনিয়ে রাখ্‌বো! নাও—তুমি আমার যথা সর্ব্বস্ব নিয়ে যাও!"

মাথার উপরে দোতালার বারান্দা থেকে কলের গানের মতো নারীকণ্ঠের একটা সুমধুর হাসির হিল্লোল আমার কানের ভিতরে বেজে উঠ্‌লো! আমি চম্‌কে উঠে উপরের দিকে চেয়ে দেখি—স্ত্রী উপরের বারেন্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে, আমাদের পানে আনন্দোৎফুল্ল নয়নে চেয়ে হাস্‌চেন! সে চাহনিতে সুখ ছিল, অভিমান ছিল, আবার কতকটা সজল স্নেহবাষ্পও ছল্‌ছল্‌ করে উঠ্‌ছিল! আমায় দেখে তিনি হেসে বল্লেন,—

"আবার তুমিই বল আমিই ছেলেটাকে বেশী ভাল বাসি! অতিরিক্ত আদর, আর যখন যা'ই চাইবে, তখনি তাই দেবে—এই করে তুমি খোকার মাথাটা একবারে বিগড়ে দিতে আরম্ভ করেছ! দোষ তোমার যত, আমার তত নয় কিন্তু!"

প্রেসক্রপসন্‌

জজকোর্টের উকীল হারাণ বাবু, সকাল বেলা শোয়ার ঘরে মাদুর-পাতা তক্তপোষটার উপর বসিয়া, একরকম বাসিমুখেই,—অর্থাৎ তখন পর্য্যন্ত চা না খাইয়া,—দৈনিক খবরের কাগজটার উপর ঘুমন্ত ভাবে চোখ বুলাইতেছিলেন। এমন সময় পিছন দিক হইতে সুমধুর বলয় শিঞ্জন সহ অঞ্চল-বদ্ধ চাবির গোছাটার ঝণ্‌ঝণ্‌ শব্দ মিশ্রিত হইয়া, দাম্পত্য-যুদ্ধের রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। সহসা পশ্চাৎ দিক হইতে আক্রান্ত, বিপন্ন, অসহায় উকীল বাবু ভীত দৃষ্টিতে, কম্পিত হৃদয়ে তাকাইয়া দেখেন,—সর্ব্বনাশ!—আজ প্রেয়সী নীরদবালার আদ্যোপান্ত রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি! চোখের নিষ্করুণ চাহনিতে, উষ্ণতাসূচক আরক্তিম মুখশ্রীতে, মাথা হইতে পিঠ পর্য্যন্ত তরঙ্গায়িত এলোকেশে, সর্ব্বত্র উদ্যত রণবেশ একেবারে জাজ্বল্যমান!

স্নিগ্ধ প্রভাতের তরুণ রৌদ্র-কিরণ-মাখা স্বর্ণাঞ্চলখানা, সবে শ্যামল পৃথিবী বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। এমন সময় আকাশে অকাল প্রলয়ের সন্নিহিত ছায়া দেখিয়া, হারাণ বাবু ভারি ঘাবড়াইয়া গেলেন। ঘাবড়াইবার কথাও বটে!—কারণ আজ যখন ভোর হইতে না হইতেই এমন দুর্দ্দিনের ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে, তখন বহ্বারম্ভে যেমন তেমন করিয়া একটা লঘু ক্রিয়া হইয়া, যে গোলযোগ সহজে মিটমাট হইয়া যাইবে, তার আদৌ কোন সম্ভাবনা ছিল না!

হারাণ বাবু কি যেন একটা কথা বলি বলি করিতেছিলেন, কিন্তু

নীরদবালাকে তাড়াতাড়ি খুব কাছে আসিয়া পড়িতে দেখিয়া, কথাটা খুলিয়া বলিবার মত ভরসা তাঁর মনে যোগাইতেছিল না! দেখিতে দেখিতে নীরদবালা, বৈশাখী মেঘের মত, ঝড়ে-বৃষ্টিতে; বাতাসে-বিদ্যুতে, গর্জ্জনে-উচ্ছ্বাসে হারাণ বাবুর মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল। ঝঙ্কার পঞ্চমে চড়াইয়া, নীরদবালা বলিয়া উঠিল;—

"দিন রাত্ দেখ্‌চি তো খবরের কাগজ নিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা হয়! নগেনের একটা চাকরী খোঁজ করবার জন্য যে অত খোসামুদী করে মর্‌চি, সে কথা ভুলে বসে আছো, অবিশ্যি?"

মধুর প্রেমালাপের মধ্যে খাঁটী বীররসের মিশাল দিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা থাকা হেতু, নীরদবালা পাড়ার নব্যা কুললক্ষ্মীগণের নিকট অনেক দিন হইতেই যশস্বী হইয়াছিল। সুতরাং আজকার বৈশাখী ঝড়ের ভিতরে, হারাণ বাবুর জন্য কোথাও নূতনত্বের অনাস্বাদিত-মধু সঞ্চিত ছিল না। কিন্তু সে দিন যে কারণে অকাল মেঘোদয়, যে ব্যাপার লইয়া অসময়ে এরূপ বীর-রসের অভিনয় সুরু হইল, সে কথাটা এখানে একটু ভাঙ্গিয়া বলা দরকার,—নচেৎ ছোট গল্প লেখকের ব্যবসা একেবারে মাটী হইয়া যায়!

তা ব্যাপারখানার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট এইরূপ,—পূর্ব্বোক্ত নগেন বাবুটী আমাদের হারাণ বাবুর শ্যালক সপ্তর্ষি-মণ্ডলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল নক্ষত্র। দিদির অপরিমিত স্নেহ, এবং কাম-ধেনু জাতীয় ভগ্নি-পতির উপার্জ্জিত মক্কেল-নিঃসৃত অজস্র রৌপ্য-রসে, এই নক্ষত্রটীর এ পর্য্যন্ত কোনও রূপ ঔজ্জ্বল্য হানি হয় নাই। কিন্তু অদৃষ্টের ফেরে যাদের এরূপ নরম গালিচার উপর মানুষ হইতে হয়, তারা কালক্রমে চীনা-

মাটির পুতুলের মত সুন্দর হইয়া উঠিলেও, অত্যন্ত ভঙ্গপ্রবণ হইয়া পড়ে। আমাদের ঘাত-প্রতিঘাতের সংসারে কর্ম্মক্ষম হওয়ার পক্ষে যে পরিমাণ শক্ত মাল-মসলার প্রয়োজন, সে গুলির অভাবহেতু তাদের চরিত্রের গাঁথুনি শেষকালে অত্যন্ত কাঁচা হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং দেখিতে শুনিতে হাল ফ্যাশনের ফুট্‌ফুটে ফুলবাবুটী হইলেও, নগেন বাবু এ পর্য্যন্তও করিবার মত কোনও কাজেরই যোগ্যতা লাভ করেন নাই, এবং সেই জন্য হারাণ বাবুকে তাঁর জন্য একটা কিছু করিয়া দিতেই হইবে, অথচ যথেষ্ট হয়রাণ হইয়াও, হারাণ বাবু অসম্ভবকে কিছুতেই সম্ভবপর করিয়া তুলিতে পারিতেছিলেন না, এই অপরাধে তিনি আজ দাম্পত্য কার্য্য-বিধির অন্তর্গত, অবশ্য-কর্ত্তব্য-কার্য্যে স্বেচ্ছাকৃত অবহেলার অভিযোগে, নীরদবালার এজলাসে অভিযুক্ত! অভিযোগ গুরুতর, আইনের মর্ম্ম সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম,—বিচারপতি (?) সুনিপুণ! বিচারের ফলে অন্তঃপুর হইতে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনের আশঙ্কাও আছে!

নীরদবালা যখন নিজের স্বার্থসংশ্লিষ্ট মামলায় নিজেই জজ, নিজেই সাক্ষী হইয়া অত্যন্ত কড়া ভাবে বিচার আরম্ভ করিয়া দিল, তখন নিরুপায় হারাণ বাবু ভাবিয়া দেখিলেন ও ঠেকিয়া শিখিলেন যে, শুধু বিচার বিভাগেই নয়—দাম্পত্য-নীতিতেও এক্সিকিউটিব জুডিশ্যা-লের ভাগাভাগি বন্দোবস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, অন্তঃপুরে নিরীহ পুরুষ-জাতির বিড়ম্বনা লাঘব হওয়ার আশা আকাশ-কুসুম তুল্য! তাই আদালতে জজ সাহেবের ধমক্ খাইয়াও যাঁর মাথার শামলা এক ইঞ্চিও টলে নাই, আজ নীরদবালার তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া, সেই নির্ভীক হারাণ বাবুর হাত হইতে খবরের কাগজের অরক্ষণীয়

কলেবরটা, আলগোছে মাটিতে পড়িয়া গেল। তিনি গা মুড়ামুড়ি দিয়া, মাঝারি রকমের একটা 'হাই তুলিয়া, অনুতপ্ত স্বরে বলিলেন ;—

"মাপ কর নীরদ, কাল কোথাও বেরুতে টেরুতে পারিনি !"

নীরদবালা কৈফিয়ত তলবী কড়া মেজাজে জিজ্ঞাসা করিল ;—

"কেন বল দেখি ? পঞ্জিকায় লেখে, কাল দিনটা আগাগোড়া চব্বিশ ঘণ্টাই তো রবিবার ছিল !"

হারাণ বাবু ম্লান হাসি হাসিবার চেষ্টা করিয়া, অত্যন্ত কাহিলভাবে, উত্তর করিলেন ;—

"এক হপ্তা খাটুনির পর, রবিবারে নাকি স্বয়ং পরমেশ্বরও কয়েক ঘণ্টার ছুটী পেয়েছিলেন ;—অন্ততঃ বাইবেল শাস্ত্রে এরূপ লেখে।"

নীরদবালা পদ্ম-সরোবরে ভাসমান রাজহংসটীর মত লীলাভরে ঘাড়টা একটু বাঁকাইয়া, হাসিয়া বলিল ;—

"ইস্! বাইবেল শাস্ত্রে তোমার অতি-ভক্তিটা কদ্দিন হলো গজিয়েছে গো ? মক্কেল যদি হঠাৎ জুটে যায়, তবে টের পাওয়া যায়, মানুষের কত রবি সোমবার জ্ঞান থাকে! নিজের বেলা পারো—পরের বেলা পারো না, তাই বল !"

নীরদবালার সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধে হটিয়া গিয়া হারাণ বাবু কিছু কাবু হইয়া পড়িলেন। মেঝের উপর হইতে খবরের কাগজটা তুলিয়া লইবার সময়, ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চন সহকারে, সংক্ষেপে রায় দিয়া বলিলেন ;—

"মিছে বকো না, যাও—"

রাগে অভিমানে নীরদবালার মুখ হইতে গলা পর্য্যন্ত গোলাপী হইয়া উঠিল। সে নেক্‌ড়ে জাতীয় একটা থাবা মারিয়া, হারাণ বাবুর

হাত হইতে খবরের কাগজটা আবার ছিনাইয়া লইয়া, "মিছে বকা" কাদের ব্যবসা, সে সম্বন্ধে অনেকগুলি অপ্রিয় কথা সবিস্তারে, সালঙ্কারে খুলিয়া বলিতে যাইতেছিল। কাজেই বক্তৃতাটা হারাণ বাবুর নিকট তেমন মুখ-রোচক হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

অনন্যোপায় হইয়া, সুতীক্ষ্ণ উকিলী প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাহায্যে, তর্কের চাবিটা অবলীলাক্রমে ঘুরাইয়া দিয়া, বক্তৃতার স্রোতটা বিষয়ান্তরে প্রবাহিত করিয়া দিবার মতলব আঁটিয়া, হারাণ বাবু তাড়াতাড়ি তক্তপোষটার উপর হইতে নামিয়া পড়িলেন। তার পর, কুলুঙ্গির উপর হইতে, দেখিতে-হরতনের-টেক্কার-মত, কোণে-ফুল-পাতা-কাটা, একখানা সুন্দর আয়না পাড়িয়া লইয়া, তাড়াতাড়ি সেখানা নীরদবালার মুখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। মুখ ফুটিতে না ফুটিতে কলহান্তরিতার আরক্ত-সুন্দর মুখচ্ছবি স্বচ্ছ দর্পণের ভিতর ফুটিয়া উঠিল। হারাণ বাবু, মিঠে-কড়া রকম ঠাট্টার সুরে একটু হাসিয়া বলিলেন;—

"যা হোক চট্‌লে কিন্তু তোমায় ভারি চমৎকার দেখায়, নীরদ! চট্‌বার কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা তোমার!—"

উকীলের রসিকতা সব সময় বাঁধা মক্কেলেরও বরদাস্ত হয় না—চপলা স্ত্রীজাতি তো দূরের কথা! বিশেষতঃ, অভিমান জিনিষটা স্ত্রীজাতির এক প্রকার জাতীয় সম্পত্তি। এ হেন স্ত্রী-ধন হাতে থাকিতে, হারাণ বাবুর অপ্রাসঙ্গিক রহস্য বাণটা, যে নীরদবালার উচ্ছ্বসিত অভিমানরাশি ভেদ করিয়া, তার কোমল মর্ম্মস্থলের অনেক খানি যায়গা বিদ্ধ করিয়া ফেলিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোনও কারণ নাই!

নীরদবালার রূপের খ্যাতি, বন্ধু বান্ধবদের মহলে হারাণ বাবুর

ঈর্ষ্যার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং সেই খবরটা হারাণ বাবু নিজেই সর্ব্বাগ্রে নীরদবালার নিকট সবিস্তারে রিপোর্ট করিয়া, সময়ে অসময়ে, তার মনোরঞ্জন করিবার এবং নিজে তার স্নেহভাজন হইবার চেষ্টা করিতেন। যিনি মথুরার রাজা, তিনিই যে আবার ব্রজের রাখাল সাজিয়া, বাঁশী হাতে করিয়া শ্রীমতীর কুঞ্জে আনাগোনা করিতেন, সে কথাটাও নীরদবালার মনের অগোচর ছিল না। এমন অবস্থায়, নিজের রূপের কথা লইয়া অরসিকের রসিকতা, নীরদবালা কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিল না। সে হারাণ বাবুর হাত হইতে খবরের কাগজটা হেঁচ্‌কা টানে ছিনিয়া লইয়া, ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল ;—

"আমি যে কুচ্ছিৎ, তাতো দশ লোকেই জানে, তা নিয়ে আবার অত ঠাট্টা কেন!" আমি ম'লেই তুমি বাঁচো,—না? ভাবচো আপদটা কোন রকমে চুকে গেলেই আরেক খানা পছন্দ মত বিয়ের যোগাড় দেখ্‌তে পারো! সে হচ্চে না কিন্তু!—তোমার সুখের বৈরী অত শীগ্‌গীর মরচে না, তা নিশ্চয় জেনো!"

সকল স্ত্রীলোকের চটিবার ক্ষমতা সমান না হইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীজাতি মাত্রেরই যে পুরুষজাতির মনোভাব বিশ্লেষণ করিবার অসাধারণ অশিক্ষিত-পটুত্ব আছে, এবং তাহা যে সময় সময় উদীয়মান কবির উদ্দাম কল্পনাকেও পরাস্ত করে, এ বিষয়ে বোধ হয় গোঁড়া সফ্রিগেট্‌ বীরাঙ্গণারাও আমাদের প্রতিবাদ করিবেন না। হারাণ বাবুর মনে আর যত রকম কুমত্‌লবই থাকুক না কেন, নীরদবালার মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করার কোনও দুরভিসন্ধি সে সময় তাঁর মনে ছিল না।

এ সম্বন্ধে জ্ঞানকৃত কি অজ্ঞানকৃত কোনও রকম পাপই যে তাঁকে স্পর্শ করে নাই, সে কথা তিনি ইংরেজ জজকে দুই মিনিটে জলের মত পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন, কিন্তু বক্তৃতা করিয়া যে এ সম্বন্ধে নীরদবালার সন্দেহ-ভঞ্জন করিবেন, সে দুরাশা হারাণ বাবুর মনে কোনও কালেই ছিল না। উল্টা চেষ্টার ফলে নীরদবালার হৃদয়ে আবার নূতন করিয়া অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হইলে, হারাণ বাবুর মত ক্ষীণজীবী লোক আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন না, সে কথা তাঁর বেশ জানা ছিল! সুতরাং এ যুদ্ধে পরাভব স্বীকার করিয়া, নীরদবালার নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মস্বীকার পূর্ব্বক, প্রাণভিক্ষা করা বই, হারাণ বাবুর মত প্রাজ্ঞ, দূরদর্শী আইনজ্ঞ ব্যক্তির আর উপায়ান্তর ছিল না; তাই তিনি নষ্ট-নীড় অনুদ্গত-পক্ষ পক্ষি-শাবকের মত, নিতান্ত নিরুপায় ভাবে, বলিলেন;—

"দোহাই তোমার, থামো! দিনকার মত খোরাকী বেশ হয়েচে এখন! এর বেশী একদিনে হজম করে উঠিতে পার্‌ব বলে তো ভরসা হচ্চে না! তার উপর আজ কদ্দিন হলো যে কেমন গা-বমি-বমি করে, মাথা কন্ কন্ করে, সে আর তোমায় কি বল্‌বো! কাছারীতে মেজাজ এম্‌নি বিগ্‌ড়ে যায় যে বাঁধা মক্কেল গুলো পর্য্যন্ত ভাগ্‌তে আরম্ভ করেচে!"

তার পর, নিজের সার্টের আস্তিনটা কনুএর দিকে ঠেলিয়া দিয়া, হাতটার পানে সুললিত নাটকীয় ভাবে সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া, অত্যন্ত ক্ষীণভাবে বলিলেন;—

"দেখচো না, দিন দিন শরীরটা কেমন কাহিল হয়ে যাচ্চে!

নিশ্চয় ভিতরে ভিতরে একটা কিছু কঠিন ব্যারাম হয়েচে আমার,—সেটা এখন তোমরা কেউ তলিয়ে দেখ্‌চো না!"

হারাণ বাবু এতটা করুণ-রস অপব্যয় করিয়াও নীরদবালার হৃদয় ভিজাইতে পারিলেন না। হারাণ বাবুর কথা শুনিয়া, নীরদবালা একেবারে ন্যাকা সাজিয়া বসিল, বলিল ;—

"তাই তো, এমন ভিতরে ভিতরে অসুখ, অথচ বাইরে তার কোনো রকম লক্ষণ নেই! এতো ভালো কথা নয়,—শীগ্‌গীর ডাক্তার ডাকাও!"

কোথায় হারাণ বাবু বেকসুর খালাস পাইবেন, তা না হইয়া যখন তাঁর সাফাইটা শুদ্ধ অত্যন্ত হাস্যোদ্দীপক হইয়া উঠিবার যোগাড় হইল, তখন তিনি ভারি ঘাবড়াইয়া গেলেন। এখন ডাক্তার ডাকিয়া পরীক্ষা দিতে গেলে, ধরা পড়িবার আশঙ্কাটা একেবারে নিশ্চিত! তাই হারাণ বাবু "ন যযৌ ন তস্থৌ" ভাবে জবাব দিলেন ;—

"আজকালকার ডাক্তারগুলো তো আর ধন্বন্তরী নয়, যে এসেই অমনি আমায় চট্ করে সারিয়ে দেবে!"

নীরদবালা তার হাতের আংটীটার উপরকার পাথরটাকে লইয়া খেলা করিতে করিতে, চাপা ঠাট্টার সহিত বলিল ;—

"কবিরাজ অন্নদাকিঙ্কর ব্যাধি-ধন্বন্তরিকে, না হয়, ডেকে পাঠান যাক্ তা হলে! তাদের নেজে ধন্বন্তরী বাঁধা!"

উকীল বাবু মর্ম্মান্তিক হাসিয়া, অত্যন্ত কাহিল ভাবে জবাব করিলেন,—

"নাগো, ব্যামোটা যে নেহাৎ বৃহচ্ছাগলাদ্য ঘৃতে সেরে যাবে, তা তো মনে হয় না!"

তার পর, একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন ;—

"আগে পশুপতিকে না হয় একবার ডাক।"

নীরদবালার বিশ্বাস, হারাণ বাবুর ব্যারামের অজুহাতটা সম্পূর্ণ মন-গড়া।, স্বামী বলিয়া, তাহা মিথ্যা অপবাদটা প্রকাশ্যভাবে দিতে নীরদবালা কিছু কুণ্ঠাবোধ করিল, এই পর্য্যন্ত! পশুপতি ঘরের ডাক্তার ও স্বামীর অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাই নীরদবালা মনে করিল, মস্ত একটা লাটিন নামযুক্ত ব্যারামের জয়ধ্বজা উড়াইয়া দিয়া, পশুপতি বাবুর পক্ষে তাঁর পাওনার বিল্‌টা অসম্ভব রকম ভারি করিয়া দিয়া, বন্ধুত্বের খাতিরটা ঘনীভূত করিয়া তোলা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়! নীরদ মনে মনে হাসিয়া বলিল, ও সব চালাকিতে কুলাইবে না। কিন্তু প্রকাশ্যে বলিল ;—

"না, ব্যারামটা যখন শক্ত গোছের, তখন সিভিল-সার্জ্জন দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা দরকার"—

উকীল বাবু, পকেট-ডায়েরী হইতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইয়া বলিলেন ;—

"পাটের ফসলটা না উঠা পর্য্যন্ত, মামলার বাজার যেরূপ নরম, তাতে—"

নীরদবালা, হারাণ বাবুর কথাটা শেষ না হইতেই, প্রস্তাবটাকে হাসির জোরে একেবারে বাতিল করিয়া দিয়া, বলিয়া উঠিল ;—

"মামলার বাজার দেখে ব্যারাম হয় না, বা তার চিকিৎসাও চলে না—ও সব বক্তৃতা করো, তোমার জজ—ম্যাজিষ্ট্রেটদের কাছে!"

হারাণ বাবু ভাবিয়া দেখিলেন, নীরদবালার কথাটা একেবারে

বেঠিক নয়। তাই পুনরায় তর্কের পথে না গিয়া, কিছু উদার ভাবে বলিলেন ;—

"ভিজিটের বোলটা টাকা একেবারে মাঠে মারা যায় যে! তা কি আর কর্‌বো, ডাক্তার সাহেবকেই দেখান যাক্ তা হলে! কিন্তু তার আগে একবার পশুপতিকে ডাক!"

নীরদ ঘাড় বাঁকাইয়া, জেরার ভঙ্গিতে, জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?"

উকীল বাবু বলিলেন,—"ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে বড্ডো খাতির তার। সঙ্গে থাক্‌লে হাফ্ ভিজিটে হয়তো কাজ হাসিল হতে পারে।"

ব্যয়-সংক্ষেপের সম্ভাবনা দেখিয়া নীরদবালা এ প্রস্তাবে আর কোন আপত্তি করিল না। স্বামী স্ত্রীতে এই ভাবে একটা সাময়িক সন্ধি-স্থাপন হওয়ার পর, পশুপতি বাবুকে ডাকিয়া পাঠান হইল।

[২]

সন্ধ্যার পর চাঁদের আলো, স্নেহার্থী শিশুটীর মত, পৃথিবীর স্নিগ্ধ-নীল বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। পাশের বাড়ীতে মেয়েদের তাসের বৈঠকে সারাদিন আড্ডা দিয়া আসিয়া, সে সময় ঘরের বড় আয়নার সম্মুখে বসিয়া, নীরদবালা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত চুল বাঁধিতে ছিল।

সন্ধ্যা যতই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, ততই স্নেহের কোমলতা, নীরব জ্যোৎস্না-পাতের মত, নীরদবালার হৃদয় ধীরে ধীরে এক বিচিত্র মাধুর্য্য-বেষ্টনে জড়াইয়া ধরিতেছিল। সারাদিনটা স্বামীর উপর অযথা উপদ্রব করা হইয়াছে মনে করিয়া, এখন তার কেমন একটা কষ্ট বোধ হইতেছিল। কিন্তু হারাণ বাবুর নাড়ী ধরিয়াই যে প্রাজ্ঞ

ডাক্তার সাহেব তাঁর সখের ব্যারামটা একদম্ ধরিয়া ফেলিতে পারিয়াছেন, সে সম্বন্ধে নীরদবালার মনে আদৌ কোন সন্দেহ হইল না। নীরদবালা জাপানী খোপা বাঁধা শেষ করিয়া, যখন সবে "হেজেলীন্ স্নো"র শিশিটা খুলিয়া লইয়াছে,. এমন সময় হারাণ বাবু গৃহপালিত নিরীহ জন্তুবিশেষের মত, নিঃশব্দ-পদে ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন।

হারাণ বাবুকে ঘরে আসিতে দেখিয়া, নীরদ তাঁর মুখের পানে তাকাইয়া, জিজ্ঞাসা করিল ;—

"ডাক্তার সাহেব দেখে কি বল্লে ?"

হারাণ বাবু খুব এক পশলা হাসিয়া জবাব দিলেন,—

"না, তেমন কিছু নয় !"

কিন্তু এই কথাটা লইয়া হারাণ বাবুর এতটা হাসিবার কি কারণ ছিল, নীরদবালা সেটা ভাল করিয়া ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিল না। তাই হারাণ বাবুর জবাবটার ভিতরে সন্দেহ-জড়িত একটা হেঁয়ালীর গন্ধ অনুভব করিয়া, নীরদ জেরার স্বরে জিজ্ঞাসা করিল ;—

"তবু শুনি ! তেমন কিছু নয়, তবে কেমন কিছু ?"

হারাণ মুখখানা একটু অন্য দিকে সরাইয়া লইয়া বলিলেন ;—

"তা তিনি খুলে আমায় কিছু বল্লেন না। পশুপতির নামে শুধু একখানা চিঠি লিখে আমার হাতে দিয়ে বল্লেন,—ওরি ভিতরে অষুধ-পত্তর সব লেখা আছে।"

নীরদবালা অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল ;—

"বাঃ, পশুপতি বাবু তোমার সঙ্গে যান নি, ডাক্তার সাহেবের কাছে ?"

হারাণ বাবু একটু ভ্যাবাচেকা খাইয়া, বার কয়েক ঢোক গিলিয়া, উত্তর করিলেন ;—

"না, তাকে রাস্তা থেকে একটা কলে পাকড়াও করে নিয়ে গেল, তাই সে আমার সঙ্গে যেতে পারে নি। বেহারাকে দিয়ে তুমি চিঠিখানা পশুপতির ডিস্পেন্সেরীতে পাঠিয়ে দাও দেখি—সে অষুধ পত্তর একটা যা হয় কিছু পাঠিয়ে দেবে 'খন!"

নীরদবালা হাতের "হেজেলীনস্নো"র শিশিটার পানে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল ;—

"দেখ্‌চো তো আমার হাত বন্দ। তুমিই না হয় বেহারাকে ডেকে চিঠিখানা পাঠিয়ে দাও না ?"

হারাণ বাবু সহসা একটু অতিরিক্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন ;—

"না ভাই, তুমিই চিঠিখানা বিলি করবার বন্দোবস্ত কর—আমি ততক্ষণ একটু বাইরে থেকে আস্‌চি!"

হারাণ বাবুর ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া নীরদবালা এবার একেবারে পেট্রোলের কানিস্তারার মত জ্বলিয়া উঠিল। সে চটা সুরে বলিল ;—

"এই ঘরে এলে, আবার এখনি রাত্তির বেলা না বেরুলেই নয়! ক্লাবে হাজিরা মারা যায় বুঝি!"

হারাণ বাবু একটু মাথা চুলকাইয়া বলিলেন,—

"একটা জরুরী কাজ ছিল, আস্‌বার বেলা সেটা ভুলে গেছি। ফিরতে বেশী দেরী হবে না।"

নীরদবালা তবু আঠারো আনা সন্দেহের সুরে বলিল ;—

"ইশ্! অত রাত্তিরে আবার কাজ!"

নীরদবালার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই, হারাণ বাবু, ডাক্তার সাহেবের চিঠিখানা নীরদবালার আয়নার দেরাজের উপর ফেলিয়া দিয়া, চোখের পলকে অন্তর্ধান হইলেন।

রাত্রি সাড়ে আটটার মধ্যেও স্ত্রী-বৎসল হারাণ বাবু ঘরে ফিরিলেন না দেখিয়া, নীরদবালা চটিয়া লাল হইয়া উঠিল। একে সুন্দর মানুষ, তার উপর চটিবার লালিত্য!—নীরদবালার মুখখানা একেবারে টক্‌-টকে গোলাপটির মত রাঙ্গা হইয়া উঠিল। নীরদবালার বার বার করিয়া মনে হইতে লাগিল, এত রাত্রে এমন কি গোপনীয় জরুরী কাজ আসিয়া জুটিল, যা ঘরের স্ত্রীর কাছে বলিতেও হারাণ বাবুর আপত্তি ছিল। নীরদ যতই ভাবে, চিত্ত তার ততই আরো বিদ্রোহী হইয়া উঠে! অবশেষে সে মনে মনে স্থির করিল,—কাজ-টাজ কিছু নয়, ও সব কেবল ক্লাবে ইয়ার্কি জমাইবার ফন্দি! নীরদবালা যেন দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইল,—ডাক্তার সাহেব চট্ করিয়া ধরিয়া ফেলিয়াছেন, হারাণ বাবুর ব্যারাম ফ্যারাম সব চালাকি,—কেবল ভিজিটের খাতিরে একটা প্রেসক্রপ্‌সন লিখিয়া দিয়া, হারাণ বাবুকে মদ ধরাইবার ফন্দি করিয়া দিয়াছেন মাত্র!

সুতরাং ডাক্তার সাহেবের চিঠিখানা,—আয়নার দেরাজের উপর, যেখানে হারাণ বাবু ফেলিয়া গিয়াছিলেন, সেই খানেই পড়িয়া থাকিল। সেখানা যে পশুপতি বাবুর নিকট তাড়াতাড়ি পাঠাইয়া দেওয়া দরকার, সে সম্বন্ধে নীরদবালা নিজের হৃদয় হইতে বিশেষ জরুরী রকম কোনও তাগিদ পাইল না।

মৃগনাভি

রাত্রি নয়টার পরেও যখন হারাণ বাবু ঘরে ফিরিলেন না, নীরদবালা তখন শুইতে যাইতেছিল। এমন সময় সিঁড়ির উপর জুতার শব্দ শুনিয়া নীরদবালা মনে করিল, হারাণ বাবুর বুঝি এতক্ষণে বাসায় ফিরিবার সময় হইল। তাই রসনাগ্রে কয়েকটী বাছা বাছা সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণ সাজাইয়া লইয়া, নীরদবালা স্বামীকে অভিনন্দন করিবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু যে পুরুস মানুষটী কাশিতে কাশিতে বারান্দার উপরে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাকে দেখিয়া নীরদবালা জিব কাটিয়া, সরিয়া গিয়া, নিজের আব্রুরক্ষা করিবার জন্যই, অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কারণ, যিনি আসিয়া দাঁড়াইলেন, তিনি স্বয়ং পশুপতি ডাক্তার। হারাণ বাবুর অদৃষ্ট ভাল, তাই তিনি সে যাত্রা তীরের মুখে আসিয়া পড়েন নাই!

কোরাণে লেখা আছে, মহম্মদ যদি পর্ব্বতের নিকট না যান, তবে পর্ব্বতই মহম্মদের নিকটে আসিবে। তাই, ডাক্তার সাহেবের চিঠি নীরদবালা পশুপতি বাবুর নিকট পাঠাইল না বটে, কিন্তু সে চিঠির জন্য পশুপতি বাবু নিজেই নীরদবালার দরবারে আসিয়া দেখা দিলেন।

পশুপতি বাবুকে দেখিয়া, নীরদবালা তাড়াতাড়ি পরদার আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল, এবং নীরদবালার ইঙ্গিত মত, দুজনার মধ্যে আলাপ চালাইবার জন্য, ঝি আসিয়া দোভাষীর স্থান অধিকার করিল।

ডাক্তার পি এন্ ঘোষ, এল্ এম্ এস্ ওরফে পশুপতি বাবু হাল্কা ছন্দের মানুষটী। পরণে কেনামুর ছিটের কোটপেণ্টালুন, মাথায় জর্ম্মন বাবু-ক্যাপ। ছিন্ন পকেটের এক প্রান্ত হইতে, ষ্টেথো-

স্কোপ যন্ত্রের রবরের ডালাপালাগুলি, কেঙ্গারু শাবকের মত, মুখ বাহির করিয়া আছে। তাঁর পশার যেরূপই থাক্ না কেন, —কোথাও বাহির হইতে হইলে তিনি কখনো ভালরকম'ড্রেস' না করিয়া বাহির হইতেন না, এমন কি, বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতেও না! এ সম্বন্ধে তাঁর এটিকেট-জ্ঞান একেবারে নিখুঁত।

পশুপতি ঘরে ঢুকিয়াই, নিরীহ ভাল মানুষের মত, নীরদকে মুখ্যভাবে, ঝিকে গৌণ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"বাবু কোথা?—এখনো ফেরে নি—রাত যে ঢের হয়েচে!"

এই বলিয়াই পকেট হইতে ওয়েষ্ট এণ্ড কোম্পানীর একটা মজবুত নিকেলের ঘড়ি বাহির করিয়া, ঘড়ির পানে তাকাইলেন, কিন্তু ঘড়ির দাগ বা কাঁটা দেখিবার মত আলো তখন বারান্দায় ছিল না!

ঝি পরদার আড়াল হইতে বাহির হইয়া, ডাক্তারকে বলিল ;—

"ডাক্তার সাহেবের বাড়ী থেকে ফিরে এসেই, আবার একটা কি জরুরী কাজে বেরিয়ে গেছেন!"

ঝির কথা শুনিয়া পশুপতি বাবু একটু মুরুব্বিআনা ভাবে বলিলেন,—

"হারাণের আজো বাতিক্ দূর হলো না! ডাক্তার সাহেব কি বল্লে না বল্লে, ছোট ডাক্তার বলে কি একবার আমাদের বল্‌তেও নেই?"

পরদার আড়াল হইতে চুড়ির মিঠা আওয়াজ, পশুপতি বাবুর অভিযোগটা মধুর ভাবে সমর্থন করিল। পশুপতি বাবু কতকটা জনান্তিকে, কতকটা নীরদবালাকে শুনাইয়া শুনাইয়া, বলিলেন,—

"শরীরের উপর অত অত্যাচার কর্‌লে শরীর টেঁকে কি করে!

রাস্তা থেকে আমায় একটা কলে চলে যেতে হয়েছিল। নৈলে কি ও অমন বাড়াবাড়ি কত্তে পারতো! আমি হলে তো ওকে ঠাণ্ডায় কোথাও বেরুতেই দেই না! বৌদিদিকে বলো, হারাণের রাশ্‌টা যেন আরো একটু কসে ধরেন, বুঝ্‌লে ঝি?"

বাস্তবিক, ঝির বুঝিবার আগেই, বৌদিদি কথাটা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইয়াছিলেন! পশুপতি বাবুর কথা প্রসঙ্গে, ডাক্তার সাহেবের চিঠি খানার কথা, হঠাৎ নীরদবালার মনে পড়িয়া গেল। নীরদ তাড়াতাড়ি দেরাজ হইতে চিঠিখানা আনিয়া, ঝিকে দিয়া পশুপতি বাবুর হাতে দেওয়াইল।

ঝি আলো আনিলে পর, পশুপতি বাবু ডাক্তার সাহেবের চিঠি পড়িতে পড়িতে যেন একেবারে সাদা হইয়া উঠিলেন। খানিকক্ষণ চিঠিটা অন্যমনস্ক ভাবে নাড়া-চাড়া করিয়া, তিনি একটা প্রবল দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পশুপতি বাবুর মুখে উদ্বেগের ভাব দেখিয়া, নীরদবালার মুখ শুকাইল। সে ব্যস্ত হইয়া, ঝিকে দিয়া, পশুপতি বাবুকে জিজ্ঞাসা করাইল;—

"কি লিখেচে ডাক্তার সাহেব?—খারাপ টারাপ কিছু নয় তো?"

পশুপতি বাবু আবার বার কয়েক কাশিয়া, গলাটা কিছু পরিষ্কার করিয়া বলিলেন;—

"একটা ব্যারামের কথা বল্‌চে বটে। তবে কিনা—ও সব কি জানেন—ব্যারাম-পীড়ার কথা কেউ কিছু ঠিক করে বল্‌তে পারে না!"

পশুপতি বাবুর রকম-সকম ভাব-ভঙ্গি সম্পূর্ণ আশঙ্কা-সূচক! পাশ-করা ডাক্তারকেও ব্যারামের নাম শুনিয়া, এমন ভাবে ঘাবড়াইতে

দেখিয়া, হঠাৎ নীরদবালার হৃদয়টা ধক্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, মুখের উপরকার দুধে-আলতার রংটা হঠাৎ পালাইয়া যাওয়াতে, নীরদের মুখখানা, ফাল্গুণের নবোদ্ভিন্ন পল্লব-রাশির মত, সহসা অত্যন্ত পাণ্ডুর ভাব ধারণ করিল। এবার পরদার আড়াল হইতে মিহিসুরের একখানা অশ্রুসিক্ত, ভীতি-ব্যাকুল, মিনতিপূর্ণ, কোমল প্রার্থনা, আর দোভাষীর কোন অপেক্ষা না রাখিয়া, পশুপতি বাবুর কাণের কাছে, বেদনাপূর্ণ মধুর সঙ্গীতের মত, আসিয়া বাজিল ;—

"চিঠিতে ডাক্তার সাহেব কি লিখেচে, সবটুকু আমায় তর্জ্জমা করে পড়ে শোনান, ডাক্তার বাবু! আমার মন বড় অস্থির অস্থির কচ্চে!"

পশুপতি বাবু স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, পাতলা পরদার ভিতরে একটা ভারি রকমের নাড়াচাড়া পড়িয়া গেছে। তিনি চিঠিটার উপর আবার তাড়াতাড়ি একবার চোখ বুলাইয়া, কিছু ইতস্ততঃ করিয়া, জবাব করিলেন,—

"না—অমন কিছু নয়, তবে কিনা,—ও সব জানেনকি,—ডাক্তার সাহেবরাও তো একেবারে অভ্রান্ত নয়—ভুল মানুষ মাত্রেরই হতে পারে তো?"

নীরদবালার চিত্ত তখন উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কায়, একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইয়াছে। সে পরদার আড়াল হইতে, ডাক্তার বাবুকে নিজেই বলিয়া উঠিল ;—

"ডাক্তার বাবু, আমি আপনার পায় পড়ি, আমার কাছে কোন কথা লুকাবেন না—আমায় সব কথা খুলে বলুন!"

পশুপতি বাবু তখন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে, ভাঙ্গা বাংলায় ইংরেজীর তর্জ্জমা করিতে করিতে বলিলেন ;—

"ডাইলেটেসন্ অব্ দি হার্ট। তার মানে হচ্চে কিনা—ওর নাম কি—হার্ট ফেইলোর হতে পারে। এই টে বড্ডো খারাপ সিম্‌টম্, বুঝ্‌লেন কিনা—অষুধ লিখেচে ডিজিটেলিস্। ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিশ্রাম ও কার্য্যত্যাগ। রোগীর মনে কোন অশান্তি আস্‌তে দিতে হবে না, খুব প্রফুল্ল রাখ্‌তে হবে, বুঝ্‌তে পারলেন কি না। একবার হাওয়া বদ্‌লে আস্‌তে পারলে আরো ভাল হয়।"

বরফের মত হিম একটা আশঙ্কা, নীরদবালার হৃদয়ের রক্ত-স্রোত যেন সহসা বন্দ করিয়া দিল। একটা ভাষাতীত তীব্র বেদনায় তার সারামুখ যেন একেবারে নীল হইয়া গেল। বিদ্যুতের সচকিত নীলাভ পাণ্ডুর আলো লাগিয়া, নিশীথের গাছ-পালাগুলি যেমন বিশীর্ণমুখে শিহরিয়া উঠে, নীরদবালার সুন্দর মুখখানি যেন তেমনি বিবর্ণ হইয়া গেল! সে যেন স্পষ্ট শুনিতে লাগিল,—নিয়তির বিচারালয়ে নির্ম্মম অদৃষ্ট পুরুষ তাকে বজ্রকণ্ঠে বলিতেছেন :—"আজ তোমার স্বামীর মৃত্যুদণ্ড-বিধান করিলাম,—সেজন্য তুমি প্রস্তুত হইয়া থাক!" নীরদবালার মনে হইল, পশুপতির হাতের কাগজখানা যেন ডাক্তার সাহেবের ব্যবস্থা পত্র নয়,—সে যেন অদৃষ্ট রাজ-পুরুষের আপন স্বাক্ষর-যুক্ত সীল-মোহর করা মৃত্যুর ওয়ারেণ্ট! নীরদ শিহরিয়া উঠিল! তার অজ্ঞাতে, তার মুখ হইতে, একটা অস্ফুট আর্ত্ত-চিৎকার বাহির হইয়া সমস্ত বাড়ীটাকে যেন স্তম্ভিত করিয়া দিল।

নীরদবালাকে হঠাৎ এতটা অস্থির হইয়া পড়িতে দেখিয়া, পশুপতি বাবু অপেক্ষাকৃত নরম স্বরে বলিলেন ;—

"আপনি অত ব্যস্ত হলে চল্‌বে কেন! রোগ এখনো চিকিৎসার বাইরে গিয়েচে বলে মনে হয় না, আর ডাক্তার সাহেবের প্রেস্‌ক্রুপ্‌সন্‌-টাতেও আমার মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগ্‌চে! হারাণকে আমিও দেখ্‌চি তো—হন্‌ না কেন তিনি ডাক্তার সাহেব!"

যে মানুষ সমুদ্রে পড়িয়াছে, আশ্রয়ের জন্য, সাগরে ভাসমান এক টুক্‌রা কাঠের মূল্য, তার নিকট নিতান্ত সামান্য নয়! পশুপতির কথায় নীরদ একটু আশ্বস্ত হইয়া, অশ্রু-রুদ্ধ স্বরে বলিল ;—

"আমি অমন কি ভাগ্যি করেচি যে, ডাক্তার সাহেবের ভুল সাব্যস্ত হয়ে, আমার কপাল ফিরে যাবে!"

পশুপতি বাবু তাকে সাহস দিয়া বলিলেন ;—

"ও সব কিছু কাজের কথা নয়, 'মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ' বলে একটা কথা আছে। আগে আমি একবার ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আসি, তার পর অষুধের বিলি বন্দোবস্ত করবো, এখন তা' হলে আমি আসি?"

তার পর, একটু চিন্তা করিয়া, নিরদবালাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ;—

"কিন্তু খুব হুঁসিয়ার থাক্‌তে হবে। দেখ্‌বেন রোগী যেন এসব কথা ঘুণাক্ষরেও না জানতে পারে। তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে।"

পশুপতি চলিয়া যাইবার সময়, নীরদবালার রুদ্ধ অশ্রু-বেগ, নব-বর্ষার প্লাবনের মত, তার মুখের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে কাঁদিতে

কাঁদিতে কতক নিজে বলিল, কতক ঝিকে দিয়া বলাইল,—স্বামীর চিকিৎসার জন্য যত টাকা লাগে লাগুক, সেজন্য ডাক্তার বাবু যেন কোন চিন্তা না করেন। দরকার হয় তো, সে তার গহনা বেচিয়া, স্বামীর জন্য একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে। তার যথাসর্ব্বস্বের বিনিময়ে, যে তার স্বামীকে সুস্থদেহে ফিরাইয়া দিতে পারিবে, জন্ম-জন্মান্তরে সে তার ঋণ শোধ করিতে পারিবে না!

আশ্চর্য্য! যে নীরদবালা, অল্পক্ষণ পূর্ব্বে, স্বামীর মুখে তার অসুখের কথা শুনিয়াও, তাঁকে তীক্ষ্ণ জ্বালাময় বাক্য-বাণে বিদ্ধ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে নাই, সে-ই এখন স্বামীর জীবন রক্ষার জন্য কি না করিতে পারে! এই জন্যই যাঁরা জটিল স্ত্রীচরিত্রকে দেবতার বুদ্ধিরও অগম্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নিতান্ত কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করাটা সঙ্গত বোধ করি না!

পশুপতি বাবু কিন্তু নীরদবালার কান্নার বাড়াবাড়ি দেখিয়া একটু হাসিলেন। বাস্তবিক, মানুষের কান্না দেখিয়া শুধু ডাক্তারেরাই হাসিতে পারে! এটা যে নিরেট সত্য কথা, সে সম্বন্ধে দেশী-বিলাতী সকল রকম রোগী ও নীরোগ জীবিত মনুষ্যই, একবাক্যে ডাক্তারদের বিরুদ্ধে রয়েল-কমিশনে সাক্ষ্য দিতে পারে!

পশুপতি বাবু বিদায় লইবার সময়, একটা পান মুখে পুরিয়া, হৃষ্টচিত্তে বলিলেন;—

"আমরা তো সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটী করবো না, বিশেষ, হারাণ আমার বন্ধু ব্যক্তি! আপনার গয়না-পত্তর বেচ্‌তে হবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। হারাণের নগদ ফিসের উপর দিয়ে ভিজিটের টাকা

তো চালিয়ে নেবোই, পারি তো এক আধ খানা নূতন গয়নাও আপনাকে দেওয়াতে পারবো!

[৩]

পশুপতি বাবু চলিয়া গিয়াছেন,—হারাণ বাবু তখনো ফিরেন নাই! উজ্জ্বল দীপালোকিত গৃহ! নীরদ সে ঘরে একা। ঘরের বাহিরে, মৃদু জ্যোৎস্নার আবছায়া জড়ানো, আমাদের শ্যামল পৃথিবী!

আজ নীরদবালার চক্ষে, ঘরের ভিতরটা, নির্জ্জন বন্দী-শালার মত নীরস, এবং বাহিরের পৃথিবীটা, অস্তিত্বহীন শূন্যলোকের মত, নিতান্তই নির্ভরশূন্য, বলিয়া মনে হইল। মনে হইল, যেন সম্মুখের বিরাট প্রান্তর-গুলি, স্তরে স্তরে উন্মুক্ত হইয়া, দূরে মূর্ত্তিহীন, প্রেতলোকের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে! নীরদ যেন ইহলোকের সীমা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে!—তার প্রেম-বেদনা-বিহ্বল হৃদয়টীর বিনিময়ে, সুদূর পরলোক হইতে, তার স্বামীর প্রাণটুকু ফিরিয়া পাইবার জন্য, নীরব মৃত্যুলোকের দ্বারে, সে একাকী, বিনিদ্র, অশ্রু-হীন চক্ষে, যেন কত যুগযুগান্ত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে! সে কঠিন মৃত্যুলোকের লৌহ-দ্বারে, যেন কত শত শত নারীর কোমল হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেছে,—কিন্তু কোথায়, মা সাবিত্রি!—আর তো নারীর সুমঙ্গল হৃদয়-ধারায় মৃত্যুরাজ্যের দুর্গদ্বার মুক্ত হইতে চায় না!

নীরদ কাঁদিয়া ফেলিল। প্রিয়জনের অমঙ্গল-আশঙ্কায় মানুষের মন বাস্তবিক এমনি বিচলিত হইয়া থাকে!

নীরদবালা শূন্য ঘরে কতক ক্ষণ একাকী পায়চারী করিয়া,

কপালের ঘাম আঁচলে মুছিয়া, খোলা জানালা দিয়া কিছুকাল বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিল। বাহিরে যতদূর দেখা যায়, সুদূর বনশ্রী মৃদু জ্যোৎস্নায় নিতান্ত প্রসন্ন;—সম্মুখস্থিত ফুলবাগানের ছোট ছোট গাছগুলি, মৃদু পবনে মর্ম্মরিত হইয়া, জ্যোৎস্নাঙ্কিত শাখা-বাহু আকাশের পানে মেলিয়া দিয়া, যেন নীরদবালার মতই অস্থিরভাবে সান্ত্বনা খুঁজিয়া মরিতেছিল! আজ যখন সন্নিহিত বিপদের ম্লান ছায়ায়, পুঞ্জীভূত বেদনার অশ্রু-ধারায়, নীরদবালার নিকট বাহিরের জল-স্থল অত্যন্ত ঝাপ্‌সা হইয়া উঠিল, তখন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের মত, অম্লান লাবণ্য-পুঞ্জের মত, অশ্রু-ধৌত পূণ্য-রেখার মত, তার সমুদয় অন্ধকার হৃদয় পূর্ণ, সমুজ্জ্বল ও কল্যাণমণ্ডিত করিয়া ফুটিয়া উঠিল, একটী মধুর, দেবোপম, অনিন্দ্য-কান্তি, প্রিয়দর্শন মনুষ্য-মূর্ত্তি!—সে মূর্ত্তি তার স্বামীর!

আমাদের নব্যবঙ্গের গৃহ-লক্ষ্মীদের হৃদয়ে, স্বামীর এই রূপ প্রেম ও কল্যাণে মণ্ডিত করিয়া দিয়া, তার উপর সৌন্দর্য্যের দেবতা, জ্যোৎস্না-নিশির সমুদয় উজ্জ্বলতা, নব-বসন্তের সমুদয় মাদক গুঞ্জন, বিকচোন্মুখ ফুলগুচ্ছের সমুদয় সুমিষ্ট গন্ধ, বর্ষা-রজনীর সমুদয় স্নিগ্ধ সরসতা, মুক্তহস্তে বর্ষণ করুণ! এই মূর্ত্তি অক্ষয় হইয়া, তাঁদের চিত্তে চিরবসন্ত সৃজন করিলে, আমাদের সুজলা শ্যামলা বঙ্গভূমি, দেবভূমির মত, পবিত্র হইয়া উঠিবে। নচেৎ বাজারের সস্তা এসেন্স-লেবেণ্ডারে, পাতলা লেসদার সেমিজ-পেটীকোটে, কিম্বা ঝুটা-পাথর-বসানো রোল-গোল্ডের ব্রূচ্-নেকলেসে, আমাদের বাংলার অন্তপুর হইতে, সংক্রামক হিষ্টিরিয়া রোগটাকে অন্যত্র রপ্তানী করিয়া দিবার, আর কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না!

স্বামীর সেই উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে, নীরদ কখন যে জানালার ধার হইতে, ঘরের ভিতরের দিকে ফিরিয়া আসিয়াছে, সে খবর সে নিজেই ভাল করিয়া জানে না। কিন্তু এবার দীপোজ্জ্বল ঘরের ভিতরে তাকাইতেই, এক নূতন দৃশ্য তার চোখে পড়িয়া গেল! মায়া-রঙ্গ-মঞ্চে যেন সহসা পট পরিবর্ত্তিত হইয়া গেছে! নীরদ দেখিতে পাইল, চারিদিকে শুধু তার স্বামীর চিহ্ন,—তাঁরি স্নেহের দানে ভরা! সকলেরি সঙ্গে, শুষ্ক ফুলের ক্ষীণ সুরভির মত, তার স্বামীর মধুর প্রেমের স্মৃতি জড়ানো! ছবি, শঙ্খ, ঝিনুক, এসেন্সের শিশি, আয়না, ফুলদান, জামা, বডিস্ কত কি! কে তার সংখ্যা করিবে!

আজ নিজের হৃদয়ের দৈন্য স্মরণ করিয়া, বার বার নীরদের চক্ষে জল আসিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ আবার সে চোখের জল সামলাইয়া, চকিত ভাবে, এক এক বার এদিক ওদিক তাকাইয়া দেখিতেছিল, স্বামী বুঝি দেখিতে পাইলেন, তিনি বুঝি সব টের পাইলেন! স্বামীর জন্য, ডাক্তার বলিয়া গিয়াছে,—তার স্বামীর শিথিল-বৃন্ত জীবনটুকুর জন্য, —নীরদবালাকে আজ তার বিপদের আশঙ্কা, দুঃখের বেদনা, হৃদয়ের অশান্তি, সকলি গোপন করিতে হইবে। আজ তার অশ্রুপূর্ণ চক্ষু অঞ্চলে ঢাকিয়া, জীবননাট্যের এক আশ্চর্য্য প্রহসন অভিনয় করিতে হইবে। বড় কঠিন সে অভিনয়!—নয়নের জল নয়নে চাপিয়া, শুষ্কমুখে হাসির নিষ্ঠুর অভিনয়! কিন্তু কঠিন কাজ মাত্রই দুঃসাধ্য নয়! স্বামীর জন্য স্ত্রীলোক না করিতে পারে, পৃথিবীতে এমন কঠিন কাজ কি থাকিতে পারে?

আবার ডাক্তার সাহেবের চিঠির কথাটা মনে পড়িয়া গেল! রোগীর মনে অশান্তি আসিতে দিতে হবে না! একবার হাওয়া বদ-

লাইয়া আসিতে পারিলে আরো ভাল হয়! নীরদ বালা ভাবিল, তার মানে কি এই নয়, যে সেই তাঁর স্বামীর অশান্তির কারণ, তার নিকট হইতে কিছু দিন সরাইয়া না রাখিলে আর তাঁর জীবনের আশা নাই? হারাণ বাবু, নিজে, ডাক্তার সাহেবকে নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। তিনি নিতান্তই নিরীহ ধরণের গৃহ-পালিত আশ্রিত জীব। ঘরের কথা অতি-রঞ্জিত করিয়া, বাহিরে গাহিয়া বেড়ান যে শ্রেণীর লোকের ব্যবসা, তিনি সে শ্রেণীর লোক নন। বিচক্ষণ ডাক্তারই রোগীর ক্লিষ্টমুখে তার অশান্তির গুপ্ত ইতিহাসটা সহজ শিশুশিক্ষার মত যেন চোখের পলকে, সবখানি পড়িয়া লইয়াছে।

নীরদবালা ভাবিল,—স্বামীর সন্নিহিত অমঙ্গলের জন্য, সমুদয় পৃথিবীর নিকট আজ সেই যেন একা অপরাধী! এতো পরশ্রীকাতর হিংসুকের মিথ্যা অপবাদ নয়! এই যে তার নিজের অন্তর, ভিতর হইতে যেন ডাকিয়া বলিতেছে,—তুমিই অপরাধী, তুমিই অপরাধী! বাস্তবিক, স্বামীকে সুখী করিবার জন্য সে তো কখনো চিন্তা করে নাই। বরং সে নিজেই এত দিন স্বামীর অসুখ অশান্তির সমুদয় অভিযোগ, নিষ্ঠুরের মত, হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছে!—তার ভাল বাসা এত বিশ্বাস-ঘাতিনী, এমন প্রাণ-ঘাতিনী,—এতই নিষ্ঠুর!

নীরদ আবারো ভাবিতে লাগিল,—ডাক্তার সাহেব ঠিক ধরিয়াছেন, আমার মত হাল্কা স্ত্রীলোকের উপর, রোগীর সেবা-শুশ্রূষার ভার দিলে, রোগীর মঙ্গলের কোন আশা করা যায় না। রুগ্ন স্বামীর উষ্ণ ললাট স্নেহের মঙ্গল পরশে একটুকের জন্যও স্নিগ্ধ করিয়া রাখিতে পারিব, তিনি আমার নিকট ততটুকু কোমলতার প্রত্যাশাও করেন না! তাই বায়ু-

পরিবর্ত্তনের অজুহাত দিয়া, এতগুলি অপ্রিয় সত্য প্রকারান্তরে রূপান্তরিত করিয়া বলা হইয়াছে মাত্র! ধিক্ এমন নারী জন্মে! এমন ব্যর্থ নারী জন্ম লইয়াও কি মানুষকে পৃথিবীতে আসিতে হয়! বিধাতা নারী জন্মই দিয়াছিলেন যদি, তবে আমায় নারীর হৃদয় হইতে বঞ্চিত করিলেন কেন?

নীরদবালার চোকে জল আসিল। চোখের জলে, অনেক পুরাণো ভুলে-যাওয়া দুঃখ, আবার নূতন হইয়া জাগিয়া উঠিল। বাস্তবিক, দুঃখের সহিত দুঃখের, এমনি একটা অভিন্ন প্রাণের সম্বন্ধ আছে, যে একটীতে টান পড়িলে, আর আর গুলিও সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া উঠে! তাই, আজ নিজের নারী জন্মকে ধিক্কার দিতে দিতে, নীরদের বেদনা-সাগর মথিত করিয়া, তার পাঁচ মাসের মরা-মেয়ের চাঁদমুখ খানা, স্মৃতি-পথে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অশ্রু-শিশির ভেদ করিয়া, হৃদয়াকাশে সে চাঁদের উদয় বড় সুন্দর! আশঙ্কার মেঘজালের উপর, মৃত মাতৃভাবের ক্ষীণ জ্যোৎস্না লাগিয়া, নীরদবালার হৃদয় ঊষার আলোকতটের মত, স্বচ্ছ ও সুন্দর হইয়া উঠিল। তখন যেন নীরদবালার হৃদয় হইতে এক সুপ্তোত্থিতা মহিমাময়ী নারী-প্রকৃতি, বহুদিন পরে, বিলাসের শিথিল-শয়ন হইতে জাগিয়া উঠিয়া, সতেজ-মধুর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল;—হে দাম্ভিক পুরুষ জাতি! তোমরা যে নারীকে সকল সময়েই অবলা মনে করিয়া, তাদের তুচ্ছ করিয়া থাক, সেটা তোমাদেরি বুঝিবার ভুল, আমাদের জাতিগত দুর্ব্বলতা বলিয়া মনে করিও না! স্বামীর মঙ্গলের জন্য, আমি লক্ষ লক্ষ বার, জন্ম মৃত্যুর ভিতর দিয়া যাতায়াত করিবার জন্য শুধু প্রস্তুত নহি,—ক্ষমতাও রাখি!

আবার চোখের কোণে জল আসিতেছিল; নীরদ খুব বেগের সহিত, আঁচলটা টানিয়া লইয়া, চোখের জল মুছিয়া, সোজা হইয়া দাঁড়াইল; কিন্তু আঁচলের হাওয়া লাগিয়া, নীরদবালার হৃদয়টা যেন আরো উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কারণ, আঁচলের সাড়া পাইয়া, স্ত্রীজাতির চোখের জল আত্মসম্বরণ করিতে পারিয়াছে, এ কথা কখনো শোনা যায় নাই!

তাই নীরদ কাঁদা থামাইতে গিয়া, আরো কাঁদিয়া অস্থির হইল। কাঁদা ছাড়া তার আর উপায়ও ছিল না,—কারণ সে সময়, স্বামীর রুগ্ন-শয্যা, রোগীর রক্তহীন মুখচ্ছবি, ডাক্তারের ক্ষিপ্র গতিবিধি, ঔষধের শিশি, কাচের গ্লাশের চাক্‌চিক্য, অশ্রু, বৈধব্য ও মৃত্যু ভিন্ন পৃথিবীর আর কিছুই যেন তার চোখে পড়িতেছিল না। একটা বিষণ্ণ কুজ্ঝটিকার ভিতরে, যেন এই সব দৃশ্যগুলি একত্র হইয়া, চক্রাকারে, অস্পষ্টভাবে, নীরদবালার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল,—সঙ্গে সঙ্গে গোটা পৃথিবীটাও যেন কুজ্ঝটিকায় অত্যন্ত ঝাপ্‌সা হইয়া, তার পায়ের নীচে টলিতে লাগিল!

নীরদবালা যন্ত্রনায় অস্থির হইয়া মাথায় খানিকটা অ-ডি-কলোন ঢালিয়া, বাতাস লাগাইবার জন্য, ঘরের দরজা খুলিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। তখন ষষ্ঠীর ক্ষীণ-চন্দ্র অস্ত যাইবার পূর্ব্বে, অত্যন্ত হলুদবর্ণ দেখাইতেছিল! কানন-ভূমি পাণ্ডুর, ফুলের বুকে ম্লান জ্যোৎস্না মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে! বাড়ীটার গাঢ় নীল ছায়া দীর্ঘতর হইয়া পড়িয়া, যেন বাগানের এক অংশের উপর নীল পর্দ্দা টানিয়া রাখিয়াছে। সে সময় নীরদবালার হৃদয়ের ভিতরে হৃৎপিণ্ডটার ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ শব্দ, ঘরের ভিতর বড় ক্লক্‌-ঘড়িটার টক্‌ টক্‌ শব্দ, আর বাহিরের নিস্তব্ধ জগৎ

হইতে সুদূর মৃত্যুলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ঝিঁ ঝিঁ পোকার রিম্ রিম্ শব্দ ব্যতীত, বিশ্ব-জগতের আর সমুদয় শব্দ যেন একটা ভীষণ প্রতীক্ষায় থামিয়া গিয়াছিল!

নিশীথের অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে, মৃত্যুর কালো ছায়া দেখিয়া, নীরদ-বালা আরো অস্থির হইয়া উঠিল! হৃদয়-স্থিত আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎ-পাত, শীতল বাতাসে, যেন আরো বাড়িয়া গেল। বাস্তবিক, সে মুহূর্ত্তে, নীরদ তার স্বামী অপেক্ষা সুন্দরতর, মহত্তর, পূর্ণতর মানুষ যেন আর কোথাও দেখিতে পাইতেছিল না। এতদিন সে যাকে কিছুমাত্র অসাধারণ বলিয়া মনে করে নাই, মৃত্যুর সম্ভাবনা আজ তাকে এতই বড় করিয়া দিয়াছিল!

সিঁড়ির উপর জুতার পরিচিত শব্দ! হারাণ বাবু আসিতেছেন মনে করিয়া, নীরদ বালা তাড়াতাড়ি চোখ মুখ মুছিয়া, সংযত হইয়া দাড়াইল। দেয়ালের উপর হইতে একটা টিকৃটিকি, ঠিক্ ঠিক্ বলিয়া শব্দ করিতেই, হারাণ বাবু স্বয়ং গৃহে প্রবেশ করিলেন। চোখের দৃষ্টি হাসিমাখা, মুখখানা একটু অপ্রতিভ। মোটের উপর, দেখিয়া নিতান্তই বাৎসল্য ভাবের উদ্রেক হয়! পাঠক-পাঠিকা মনে করিতে পারেন,উকীলের এরূপ চেহারা হওয়াটা নিতান্ত কাপুরুষোচিত। কিন্তু এ কথাটাও তাঁদের স্মরণ রাখা দরকার, যে বার্-লাইব্রেরী ও অন্তঃপুর ঠিক এক যায়গা নয়!

আর আর দিন, হারাণ বাবুকে ঘরে আসিতে দেখিলে, নীরদবালা হয়তঃ শুইয়া শুইয়া নবেলই পড়িতে থাকিত,—একবার চোখের কোণে তাকাইয়াও দেখিত না। কোন দিন হয়তঃ বসিয়া থাকিলে, হারাণ

বাবুর "চট্টোপাধ্যায়ের" ধ্বনি শুনিয়াই শুইয়া পড়িত। হারাণ বাবুকে দেখিয়া হৃদয় যে প্রফুল্ল হইত না তা নয়; কিন্তু, সেটা পঞ্চেন্দ্রিয়ের কোনও ইন্দ্রিয় দ্বারা কবুল করাটাকে নীরদ নিজের দুর্ব্বলতা বলিয়াই মনে করিত। কিন্তু, আজ সেই হারাণ বাবুর শুভাগমনটা কবুল করিতে, তার কোনরূপ আয়োজনের ত্রুটী ছিল না! হারাণ বাবু আসিতেই, নীরদ তাড়াতাড়ি তাঁর গা হইতে ফ্লানেলের সার্টটী খুলিয়া লইয়া, আলনার উপর তুলিয়া রাখিল। হারাণ বাবুর হাত-মুখ ধোয়া হইলে পর, নীরদ নিজে শুকনা তোয়ালাখানা হাতে করিয়া, ধীরে ধীরে হারাণ বাবুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

হারাণবাবু নীরদের নিকট এতটা স্বেচ্ছা-সেবা পূর্ব্বে যেন কখনো পান নাই, এবং এখনো পাইবার প্রত্যাশা করেন না, এই ভাবে বিস্মিত হইয়া বলিলেন ;—

"আহা, তুমি নিজে কেন ?—ঝিকে ডাকনা !"

নীরদ সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিল না। হারাণ বাবু নীরদের হাত হইতে তোয়ালা খানা উঠাইয়া লইলে পর, সে তাড়াতাড়ি কাচের গ্লাসে করিয়া, খানিকটা ঠাণ্ডা লেবুর সরবত আনিয়া হাজির করিল। হারাণ বাবু, নিতান্ত ভাল ছেলের মত, নিরাপত্তিতে সবখানি এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়া, একটু রহস্য করিয়া বলিলেন ;—

"শাস্ত্রে বলে, অতির গতি কোন কালেই বড় সুবিধে নয়! অতি দর্পে হতা লঙ্কা অতি মানে চ কৌরবাঃ!"

হারাণ বাবুর সাধ করিয়া ঝগড়া করার চেষ্টা আজ ব্যর্থ হইল। ইতি-পূর্ব্বে, নীরদবালা তাঁর ঝগড়ার সাধ মিটাইতে, কখনও ওজর

করে নাই। কিন্তু, সে দিকে আজ কোনওরূপ আশক্তি না দেখাইয়া, নীরদ নিঃশব্দে একখানা হাত-পাখা লইয়া, হারাণ বাবুকে বাতাস করিতে লাগল। হারাণ বাবু, তাতে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়া, বলিলেন ;—

"আরে করো কি তুমি! স্ত্রী-হস্তের হাওয়াটা বসন্তকালের জন্য মুলতুবি রাখনা ভাই,—তখন কাজে দেখ্‌বে!"

"নীরদবালা, গন্ধহীন কাঠ-গোলাপের মত, একটু কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া বলিল ;—

"না হয়, বসন্তের হাওয়াটা গ্রীষ্ম কালেই আগাম দেওয়া গেল!"

হারাণ বাবুও সহজে ছাড়িবার পাত্র নন। একে জেরার মুখ, তাতে আবার ভাটি-জল! তিনি পরিষ্কার, চাঁচা-গলায়, বলিয়া উঠিলেন ;—

"তা'হলে, দেখ্‌চি, বকশিশ্‌টাও আমাকে আগাম দিতে হচ্চে!"

নীরদবালা কি মনে করিয়া একটু সরিয়া যাইতেছিল। হারাণবাবু, তাড়াতাড়ি তার সম্মুখে আসিয়া, সার্টের পকেট হইতে ছোট্ট একটী গ্যাটাপার্চ্চার বাক্‌স বাহির করিয়া, তার সম্মুখের দিকের স্প্রীং টিপিলেন,—অমনি ভেলভেট-আঁটা ডালাটী চট্‌ করিয়া উপরের দিকে উঠিয়া গেল, আর বাক্সের ভিতরে, লাল রংএর ভেল্‌ভেটের পুরু গদীর উপর দুটি হীরার ইয়ারিং, উজ্জ্বল দীপালোকে, দুটী জমাট্‌ স্বচ্ছ অশ্রু বিন্দুর মত, ঝিক্‌মিক্‌ করিয়া উঠিল!

অনেকক্ষণ ধরিয়া ব্যথা সহ্য করিয়া, নীরদবালার হৃদয় এখন অনেকটা আঘাত-সহ হইয়াছিল বটে, কিন্তু এমন অবস্থায়

স্নেহের স্পর্শ পাইলে, -মন আবার বড় অধীর হইয়া উঠে! তাই হারাণ বাবুর স্নেহের উপহার, ইয়ারিং দুটি দেখিয়া, নীরদবালা, সে সময় কিছুতেই চোখের জল সামলাইতে পারিতেছিল না। তাড়াতাড়ি কোনমতে অন্ধকারের পানে মুখ ফিরাইয়া, সে যাত্রা চোখের জলটা গোপন করিল! তারপর, একটু কৃত্রিম কোপ-মিশ্রিত স্বরে, বলিয়া উঠিল ;—

"কাহিল শরীরে কেন অত ঝক্মারি সইতে যাওয়া ? তোমার যত সব অনাসৃষ্টি !"

কিন্তু আজ নীরদবালার মৃদু তিরস্কারের ভিতর দিয়া স্নেহ, স্নেহের ভিতর কোমল মর্ম্ম-বেদনাই, ছিন্ন-মেঘের ফাঁকে নক্ষত্রের মৃদু কিরণের মত, অতি মধুর ভাবে ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছিল ! হারাণবাবু একগাল হাসিয়া বলিলেন ;—

"মাপ কর নীরদ, প্যাটার্ণটা অমন খাসা, যে ইয়ারিং জোড়াটা হাতের কাছে পেয়ে, তোমার কাণে পরিয়ে দেবার লোভটা আমি কিছুতেই সামলাতে পারি নি !"

এই বলিয়া, হারাণবাবু নিজে, নীরদবালার আরক্ত-মূল কর্ণপ্রান্তে, হীরার ইয়ারিং দুটি পরাইয়া দিলেন। মনে হইতেছিল,—যেন তার চোখের কোণ হইতে দুই ফোঁটা চোখের জল, নীরদের কাণের উপর পড়িয়াই বুঝি এমন ছল্ছল্ করিয়া উঠিয়াছে !

"এবার নীরদবালার উচ্ছ্বসিত আবেগের উপর, মৃদু অভিমানের আভা আসিয়া লাগিল। সে বলিল ;—

তোমার নিজের শরীরের চাইতে কি ইয়ারিং ডুটোর মান বেশী হলো ?—মন্দ মানুষ নয়, যা হোক !"

হারাণ বাবু ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন ;—

"দোহাই ধর্ম্মের ! আমি তো আগাগোড়া আত্মরক্ষার আইন-সঙ্গত অধিকার মেনেই চল্‌চি ! ইয়ারিং পসন্দ করবার জন্যে আমায় দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াতে হয় নি। রাজবাড়ী থেকে ফিরবার সময়, হঠাৎ জুয়েলারী দোকানের সো-কেসে ইয়ারিং জোড়াটার উপর আমার চোখ পড়ে গেল !"

নীরদবালাকে পুনরায় কোন কথা বলিবার ফুরস্থত না দিয়া, হারাণ বাবু নিজেই নিজের ছাপাই গাহিতে স্বরু করিলেন ;—

"তা, রাজবাড়ী গিয়েছিলাম কেন, তা জান ?—ম্যানেজার ডেকে নিয়ে বল্লেন,—নগেনের চাক্‌রিটী হয়ে গেছে। তাকে আস্‌তে টেলি-গ্রাফ্ করে দিয়েচি !"

নীরদবালার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা রাখিবার স্থান হইতেছিল না ! দুই চোখ ভরিয়া আবার অশ্রুর বাণ আসিতেছিল। তাড়াতাড়ি সে মুখ ফিরাইয়া, আঁচল দিয়া, চোখের জলটা মুছিয়া লইবার যোগাড় করিতেছিল, এমন সময় হারাণ বাবু খপ্ করিয়া নীরদবালার হাত দুখানা ধরিয়া ফেলাতে, বেচারী এবার বমাল্ ধরা পড়িয়া গেল। হারাণ-বাবু সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"বাঃ, তুমি কাঁদ্‌চো যে ?"

নীরদবালা এবার চোখের জলের সঙ্গে না আঁটিতে পারিয়া, মনের আবেগটাকেই আঁচল-চাপা দিতে ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া, বলিল ;—

"কাঁদছি, কৈ, না তো!"

কিন্তু মিথ্যা কথার সাক্ষী তখনো নীরদবালার চক্ষে! হারাণ বাবু, তখনো তার হাত তুখানা ধরিয়া থাকায়, নীরদ চোখের জলটা সামলাইবার সুবিধা পায় নাই!

এর পরে ও নীরদবালার নিকট আব্রু রাখা অনুচিত বোধ করিয়া, হারাণ বাবু সোজাসুজি বলিয়া উঠিলেন ;—

"সত্যি নীরু! আমার কোন অসুখ বিসুখ হয় নি কিন্তু! তুমি সেই সব মনে করে কাঁদ্‌চো বুঝি?—ছিঃ!"

হারাণ বাবুর কথা শুনিয়া, ডাক্তার-সাহেবের চিঠির ভীষণ মর্ম্ম, আবার বিদ্যুতের মত, নীরদবালার মনে ঝিলিক্ দিয়া উঠিল! ডাক্তার-সাহেবের মতে, এখন সম্পূর্ণ বিশ্রাম চাই,—তার উপর এত হাঁটাহাঁটি! আশঙ্কায় নীরদবালার বুকটা ধক্ করিয়া উঠিল। সেটা তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি হারাণ বাবুর চক্ষু এড়াইতে পারিল না। তিনি হাত ধরিয়া, নীরদবালাকে নিজের দিকে আরো খানিকটা টানিয়া লইয়া, স্নিগ্ধ-মধুর কণ্ঠে বলিলেন ;—

"আজ তোমার হলো কি নীরু? চোখের জল ফেলে ফেলে, তুমি আমার আজকার দিনটাই শেষকালে মাটী কর্‌লে, দেখ্‌চি! তার চাইতে সকাল বেলার মত, না হয়, একটা সখের কোন্দল জুড়ে দাও না!—এর চাইতে যে তা ও ভালো!"

"তোমায় বল্‌তে সাহস হচ্চে না, কিন্তু ডাক্তার সাহেব, দেখচি, আমার ব্যারাম সম্বন্ধে,তোমার রায়-ই বহাল রেখেচেন! বল্‌চেন, আমার ব্যারাম পীড়া সব ফক্কিকার! তা আবার ডাক্তার সাহেব বল্‌বে

কি,—মনের অগোচর তো পাপ নাই,—নিজেও বুঝি তো!”

নীরদবালার হৃদয়ে, আবার আশঙ্কার বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল। হারাণ বাবুর কথা শুনিয়া নীরদ শিহরিয়া উঠিল। ভাবিল, হারাণ বাবুকে ব্যারামের কথাটা খুলিয়া না বলিয়া ভালই হইয়াছে। কিন্তু বিপদের কথা তো আর আমার মনের অগোচর নয়!

কবি বলিয়াছেন,—“স্নেহঃ পাপাশঙ্কী”। স্নেহের ভিতরে যদি এত আশঙ্কা না থাকিত, ভালবাসার উপর যদি এমন নিঃস্বার্থ নির্ম্মল অশ্রুর সুন্দর ছায়া না পড়িত,তবে বুঝি, আমাদের এই শোক-দুঃখ-ভরা দুদিনের পৃথিবী মানুষের চোখে অত সুন্দর ঠেকিত না!

হারাণ বাবুর কথা শুনিয়া, নীরদ চুপ করিয়া থাকিল। কিন্তু পাকা উকীলের পক্ষে বেশীক্ষণ চুপ করিয়া থাকার মত শাস্তি আর নাই। বিশেষতঃ, সে সময় নীরদবালার সুন্দর, বেদনাপূর্ণ, অসহায় মুখখানা দেখিয়া, হারাণ বাবু কিছু বেশী বিচলিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাই একটু হাসিবার ভাণ করিয়া, বলিলেন;—

“অবলা জাতির সঙ্গে চালাকি কর্‌তে যাওয়াই মহাপাপ,—বিশেষতঃ, যে সব মেয়েরা ঠাট্টা বোঝে না! এই দেখনা, পশুপতি ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে কন্‌সাল্ট করে, আমার জন্যে নতুন প্রেস্‌ক্রিপসন্ করে পাঠিয়েছে; তুমি শুনে যাও, আমি পড়ে যাচ্চি;”—

নীরদবালা উত্তেজনা ও বিস্ময়ে, একেবারে লাল হইয়া উঠিল। হারাণ বাবুর কথা শেষ না হইতেই, সে বাধা দিয়া বলিল;—

“বাঃ, পশুপতি বাবুর সঙ্গে তোমার আবার দেখা হলো কোথা?”

হারাণ বাবু, সহাস্যমুখে, এক টুক্‌রা কাগজের পানে তাকাইয়া, বলিলেন ;—

"সে কথা পরে হবে এখন ; আগে প্রেস্‌ক্রুপ্‌শন্‌টা শুনে নাও,— আমি বিশুদ্ধ বাংলায় তর্জ্জমা করে বল্‌চি ;"—

ডায়মণ্ড ইয়ারিং ২টী

নগেনের চাকরী ১টী মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনে।

ঔষধ দুটী, মৌখিক উপদেশ মত, প্রত্যেকটী, পাঁচ মিনিট অন্তর, রোগী যথা স্থানে প্রয়োগ করিবে। আহারের ব্যবস্থা,—

প্রচুর ঘৃতপক্ক পোলোয়া কোর্ম্মা,—বন্ধু সহযোগে।

শ্রীপশুপতি নাথ ঘোষ

১—৪—১৪

প্রেস্‌ক্রুপ্‌সনের ব্যবস্থা শুনিয়াই, নীরদ বালার শরীর হইতে যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়া গেল। কিন্তু, এত বড় সু-খবরটা প্রথমতঃ নীরদবালার বিশ্বাস করিতেই সাহস হইতেছিল না। তাই, সে একটু জেরার ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিল ;—

"তবে পশুপতি বাবু যে আমায় প্রেস্‌ক্রুপ্‌সন্‌ পড়ে শুনিয়ে গেলেন, সেটা" ?—

হারাণ বাবু স্বর্গীয় জয়দেব গোস্বামী কৃত,—নূতন পেনাল কোডের সরস শ্লোকার্দ্ধ হইতে, সাজার ধারাটা আওড়াইয়া, একেবারে কবুল জবাব ঝাড়িয়া বলিলেন ;—

"একেবারে আগাগোড়া জাল,—হলপ্‌ করে বল্‌তে পারি !"

নীরদবালা এতক্ষণ পরে, একটু প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারিয়া, একটু সুস্থ বোধ করিল ; বলিল ;—

"আমি জজ সাহেব হলে, এখনি তোমার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম দিতাম ! বাপ্‌রে বাপ, এর নাম ঠাট্টা !'

হারাণ বাবু খুব এক পশ্‌লা হাসিয়া বলিলেন ;—

"সেই জন্যই তো আইনে মেয়েদের জজ হতে মানা, নৈলে কত লঘু পাপে গুরুদণ্ড হয়ে যেতো ! আজ যে আমাদের সাত খুন মাপ, তা জানো তো ? কারণ, তারিখটা হচ্চে পয়লা এপ্রিল ! বিয়ে করে অবধি, বছরে এগারো মাস ঊনত্রিশ দিন তোমার কাছে আমি বিনে ওজরে ব্যাকুব হয়ে আছি, বছরে একদিন তোমায় 'এপ্রিল-ফুল' করতে চেষ্টা করেচি বই তো নয় !"

নীরদ একটু রাঙ্গা হইয়া উঠিয়া বলিল,—

"ফুল্, না হয় একলা তুমিই কর্‌তে ! কিন্তু এর ভিতর আবার পশুপতি বাবুকে এনে জড়িয়েছ কেন ?—ছিঃ !—কি লজ্জার কথা !"

হারাণ বাবু হাসিয়া বলিলেন,—

"পশুপতি বলে, বিয়ের পর মেয়ে ঠকাবার ক্ষমতা নাকি পুরুষের একেবারে লোপ পায় ; পশুপতি বে করেনি বলে, তাকেও এ ব্যাপারে সঙ্গে রেখেচি । দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ !"

এমন করিয়া, আজ দুই বন্ধুতে ষড়যন্ত্র করিয়া,তাকে"এপ্রিল ফুল্" করাতে, নীরদবালা মনে মনে কিছু চটিল বটে, কিন্তু তার চাইতে সে আরাম বোধ করিল ঢের বেশী । আজ তার বারে বারে, ঘুরিয়া ফিরিয়াই মনে হইতে লাগিল, যে, আজকার ব্যাপারটা নিতান্ত তামাসা নয়,

তামাসার ছলে ভগবান আজ তার সকল অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া, তাকে দিব্য শিক্ষা দিয়া দিয়াছেন ! কিন্তু তবু যে তিনি দয়া করিয়া, আজ মৃত্যুর মুখ হইতে, স্বামীকে সুস্থ শরীরে ফিরাইয়া দিয়াছেন, সেই কৃতজ্ঞতার ভারে, আজ নীরদবালার মাথা, পুষ্পিতা বনলতার শাখাটীর মত, ভগবানের চরণে বার বার নত হইয়া পড়িতে লাগিল। বাস্তবিকই, পয়লা এপ্রিলের আমোদের মধ্যে, নীরদবালা সত্য সত্যই এত বড় একটা খাঁটী আনন্দের আস্বাদ পাইয়া, ভারি আরাম বোধ করিল !

ঠিক সেই সময়ে, পরদার আড়াল হইতে, পশুপতি বাবু পরিচিত-কণ্ঠে হারাণ বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন ;—

"বলি, ও হারাণ, বৌদিকে একবার জিজ্ঞেস্ কর দেখি, পোলোয়া কোর্ম্মা চড়ান হয়েচে নাকি ; আমি তা হলে আর সব্বাইকে ডেকে নিয়ে আসি !"

পশুপতির কথা শুনিয়া, নীরদবালা লজ্জা ও অপ্রত্যাশিত আনন্দের মিশ্রণে, বার বার লাল হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন, হারাণ বাবু, নীরদবালার মুখের দিকে তাকাইয়া, প্রফুল্ল চিত্তে হার্ম্মোনিয়ামটাতে স্বর দিয়া গান ধরিলেন ;—

"শ্রীমুখপঙ্কজ হেরবো বলে হে,—
আমি এসেছি গো এ গোকুলে।"

হীরার মূল্য।

প্রায় আধ-ঘণ্টা কাল ধরিয়া, পাশের কামরাতে আলোচনা ও পরামর্শ করিয়া, ‘জুরী মহোদয়’গণ ‘শেসন’ জজ-সাহেবের আদালত গৃহে প্রবেশ করিলেন।

সে দিনকার দৃশ্য ও ঘটনাগুলি আজও আমার চোখের উপর ভাসিতেছে;—কারণ আমি যে আসামী,—নরহত্যা ও দস্যুতার অপরাধে বিচারার্পিত,—শৃঙ্খলিত বন্দী! বিচারকের জীবিকা, উকীল ব্যারেষ্টারের ব্যবসা, বাদীর কতকটা ক্ষতি এবং কতকটা প্রতিহিংসা, কিন্তু আসামীর নিকট সে বিচার জীবন-মৃত্যুর সমস্যা!

বিচারালয়ের অপ্রসন্ন অন্ধকার ভরিয়া, পুঞ্জীকৃত নথি-পত্র হইতে, একটা হুক্কারজনক গন্ধ উঠিতেছিল। প্রশস্ত বিচার গৃহের একধারে, মঞ্চের উপর, একখানি বড় টেবিল, তাহার সম্মুখে, একখানি গদি-আঁটা চেয়ারে কালো গাউনের উপর সাদা টাই বাঁধিয়া, প্রবীণ জজ সাহেব বসিয়াছেন। নীচে মেঝেতে, একখানি টেবিলের উপর কাগজ কলম, নথিপত্রের স্তূপ লইয়া, পেস্কার বাবু নিতান্ত গো-বেচারির মত উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া আছেন। হুজুরের হুকুম তামিল করাই তাঁর একমাত্র ‘পেশা,’—তবু বুদ্ধির দোষে, মাঝে মাঝে সাহেবের ধমক খাইতেছেন।

এ কামরার একপার্শ্বে সাক্ষীর মঞ্চ, অপরপার্শ্বে আসামীর মঞ্চ। কিছু দূরে, একখানি লম্বা টেবিল সম্মুখে লইয়া, ‘জুরী-মহোদয়’গণ, নিজ নিজ স্থান আলো করিয়া বসিয়াছেন। পেস্কারের

টেবিলের পর, গ্যালারীর মত ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া বেঞ্চের সারি চলিয়াছে,—সে গুলিতে কৌন্সিলী, উকীল, মোক্তার, টাউট ও পরিদর্শকগণ বসিয়াছেন। এককোণে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদিগের জন্য নির্দ্দিষ্টস্থানে, কয়েকটী "বিশেষ সংবাদদাতা" সংবাদ আহরণের জন্য, পক্ষীবিশেষের ন্যায় চঞ্চু উত্তোলন করিয়া, বসিয়া আছেন। বিচারগৃহ লোকে লোকারণ্য।

যাহার উপরে আজ সকলের সোৎসুক দৃষ্টি ন্যস্ত,—সে আমি। 'নরহত্যা' ও 'দস্যুতা'র জন্য, অপরাধীর মঞ্চে, নিতান্ত নিরুপায়ভাবে দাঁড়াইয়া! সে ভয়ঙ্কর স্থানে দাঁড়াইয়া, যে কৃতকর্ম্মের জন্য আমি বড় একটা লজ্জা অথবা অনুশোচনা বোধ করিতেছিলাম, তাহা নহে;— কারণ সে মঞ্চের ভাতি এখন আমার অনেকটা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এতগুলি লোক যে আমার পানে বাঘের মত কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া আছে, সেটা আমার নিকট বড়ই অসহ্য ঠেকিল!

জুরীগণ যখন আলোচনা শেষ করিয়া, বিচার গৃহে ফিরিলেন, তখন দিবাবসানের মুমূর্ষু আলোক-রেখাটী অন্ধকারে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে, হঠাৎ একসঙ্গে চতুর্দ্দিকে কয়েকটী বৈদ্যুতিক আলো দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আমার মনে হইল, যেন সেগুলি বর্ণহীন তেজঃপুঞ্জ মাত্র,—যেন ছবির ফানুস,—রূপ আছে, কিন্তু ছটা নাই।

চারিধারে পুলিস, চাপরাশী জনতার মধ্যে অতিকষ্টে শান্তিরক্ষা করিতেছে। আইন শাস্ত্রের নূতন-রসজ্ঞ 'জুনিয়ার' উকীল-মণ্ডলীর চসমা-মণ্ডিত নয়ন হইতে, বৈদ্যুতিক আলো প্রতিফলিত হইয়া, যেন

গৃহময় তরল কৌতূহল বিকীর্ণ করিতেছিল। , সকলের মুখেই ভয়ানক একটা উত্তেজনার চিহ্ন,—কি হইবে বলা যায় না। অদূর ভবিষ্যতে, অনিশ্চিত বিচারফল, যেন একখানি অতি সূক্ষ্ম পরদার আড়ালে, অতি সুনিশ্চিত ভাবে অবস্থিত! এই ক্ষণিকের বিলম্বটাও জনতার পক্ষে একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, মানুষ এমনি হৃদয় হীন। আর আমি? শুধু প্রাণপণ বলে আশা করিতেছিলাম, আরও কিছু বিলম্ব হোক! জুরী এত তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিল কেন? তবে কি আর কোন সন্দেহ নাই?

জজের গম্ভীর বদনমণ্ডলের মাঝে, আমি তো একটিও আশার রেখা খুঁজিয়া পাইলাম না। আমার মাথার ভিতরে রক্ত ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। গৃহের প্রজ্জ্বলিত দীপগুলি যেন একত্র হইয়া, বৃত্তাকারে আমার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। দোষী হোক, নির্দোষী হোক, বিচার গৃহের ভীষণতা আসামী ভিন্ন আর কে হৃদয়ঙ্গম করিবে? আমি দারুণ উৎকণ্ঠায়, জুরিগণের চিন্তাক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখমণ্ডলের মাঝে, আমার ভবিষ্যৎ বৃথা খুঁজিয়া মরিলাম!

জীবনের ক্ষীণসূত্র লইয়া আশা-নিরাশার একি প্রাণান্ত কর খেলা!

পরিণাম যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই যেন শৃঙ্খল, কারাগারের নির্জ্জন বন্দীশালা, প্রহরীর গুরুপদধ্বনি, সঙ্গীনের ধারাল চাকচিক্য, ফাঁসীরজ্জুর প্রাণঘাতী বিভীষিকা,—এক অতি ভয়ঙ্কর দীর্ঘ রজনীর কথা, বার বার আমার মনে করিয়া দিতে লাগিল। মৃত্যু অপেক্ষাও মৃত্যুর সে ভয়ঙ্কর প্রতীক্ষা বড় নিষ্ঠুর! জীবন-মরণের সন্ধি-ফলকের উপর দাঁড়াইয়া, আমি স্পষ্টই দেখিতেছিলাম,—

একদিকে, অন্ধকার রজনীর তিমির-তট আমার অদৃষ্টের পানে ঘনাইয়া আসিতেছে, অপর দিকে শ্যামল সংসার, মরীচিকার মত, হাসিতে হাসিতে, আমার মুগ্ধ নয়নের সম্মুখ দিয়া সরিয়া যাইতেছে। এ সচেতন মৃত্যু কি ফাঁসীর অজ্ঞান-মৃত্যু অপেক্ষা অনেক বেশী ভয়ঙ্কর নহে?— শক্ররও যেন এমন না হয়।

এ জীবনে,ভগবানের উপর, কোনকালেও আমার কিছুমাত্র নির্ভর ছিল না। তাই, আমার ব্যারেষ্টারের উপর, জগতের রক্ষাকর্ত্তার সর্ব্ব-শক্তি আরোপ করিয়া,তাঁহারি মুখের মাঝে আমি অভয় অন্বেষণ করিতে লাগিলাম ; কিন্তু হায়, সেখানে অভয়ের সান্ত্বনা কোথায়? প্রতিমুহূর্ত্তে, যেন ঝলকে ঝলকে, আমার বুকের রক্ত শুকাইয়া উঠিতেছিল! ওঃ,—কি শুষ্ক সে পিপাসা! মৃত্যু কি ইহা অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর?

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমার ব্যারেষ্টারের মুখে তো কোনও উদ্বে-গের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না! বিচার ব্যাপারটা যেন একটা নিতান্ত সহজ, উত্তেজনাহীন, দৈনন্দিন ঘটনা মাত্র, ইহার ভিতরে যেন বিশেষ কোনও একটা গুরুত্ব নাই, তাঁহার মুখে-চক্ষে এমনি একটা লঘুভাব! বিচার ফলের সহিত যেন তাঁহার কোনও সংস্রবই নাই,—যেন ফলা-কাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত কর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি খানি,—কলিতে নিষ্কাম ধর্ম্মের এক-মাত্র উপাসক!

যখন জুরীগণ আসিয়া যথা স্থানে উপবেশন করিলেন, তখন সমস্ত জনতা ব্যাকুল হইয়া সেই দিকে চাহিল। কিন্তু আমার ব্যারেষ্টার তখন একটা অকিঞ্চিৎকর পেন্সিল কাটা ব্যাপারে এত অধিক ব্যাপৃত ছিলেন যে, জুরীদের আগমনটা যেন তিনি লক্ষ্যই

করেন নাই! কিন্তু, আমি ঠিক লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলাম যে, তিনি সকলের অলক্ষিতে, চুরি করিয়া, একবার জুরিদের মুখপানে চাহিয়া লইয়া,—আবার অতি নিপুণতার সহিত পেন্সিলাগ্র সরু করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, আমার আর বুঝিতে বাঁকী রহিল না, যে এটা শাস্ত্রোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্মের লক্ষণ নয়, ব্যারেষ্টারী কায়দা মাত্র! এমন সময়ে জজসাহেব গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন ;—

"জুরি মহাশয়গণ! আপনারা আসামীর দোষ বা নির্দ্দোষ সম্বন্ধে সকলে কি একমত হইতে পারিয়াছেন?"

তখন কাছারীগৃহের গুণ্-গুণ্ ধ্বনি একেবারে থামিয়া গিয়াছে,—বুঝি বা একটী আলপিন্ মেজেতে পড়িলেও, তার শব্দ শোনা যায়!

জুরি-পতি ইস্কুলের শিক্ষক ; মাথায় জর্ম্মান বাবু-ক্যাপ্, মুখে অপরিপাটী শ্মশ্রূ ; চোখের উপর নিকেলের চশমা, তার একখানা ভাঙ্গা ডালা, সূতা দিয়া বাঁধিয়া, কোনরূপে কার্য্যক্ষম করা হইয়াছে। কালো কোটের নীচের কামিজের বোতাম-হীন ছিন্ন আস্তিনটী, অতি-কষ্টে আত্মগোপন করিতেছিল। তিনি সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া বলিলেন ;—

"হাঁ, আমরা সকলেই একমত।"

আমি তখনো দণ্ডায়মান ;—কিন্তু সে যেন বজ্রাহত পথিকের মত! সমস্ত জড়-জগত তখন আমার চক্ষের উপর ভয়ঙ্কর অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে!

জজ-সাহেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"আসামী দোষী কি নির্দ্দোষী?"

"সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে নির্দ্দোষী!"

জজ ও জুরি-পতিতে, এই সাংঘাতিক কথোপকথন সমাপ্ত হইতে, পুরা দুই মিনিট কালও লাগে নাই। কিন্তু আমার মনে হইল, আমি যেন এক যুগের নরক-যন্ত্রণা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি! কতক্ষণ পরে আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম, তাহা সঠিক বলিতে পারিনা,—কিন্তু যখন অসম্ভব সম্ভব হইল,—বিচার ফলের বিস্ময়কর মর্ম্ম আমার সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইল, তখন দেখি আমার পা-দুখানি অসম্ভব কাঁপিতেছে। অবলম্বনের জন্য, আমি 'টিকটিকি'র রেলিং ধরিয়া, কোনও মতে খাড়া থাকিলাম।

যখন উত্তেজনার প্রথম উচ্ছ্বাস থামিল, তখন বুঝিলাম,—স্বপ্ন নয় —কাহিনী নয়,—সত্য সত্যই আমি খালাস পাইয়াছি! আমি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চক্ষে, আমার রক্ষাকর্ত্তা, ব্যারেষ্টারের মুখপানে চাহিলাম! কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তখনও তিনি পূর্ব্ববৎ তদ্‌গত-ভাবে পেন্সিলই কাটিতেছিলেন! তিনি তাড়াতাড়ি আমার নিকটে আসিয়া দুইটা মিষ্টবাক্যও বলিলেন না, অথবা খালাসের মূল্যস্বরূপ অতিরিক্ত পারিতোষিকও চাহিলেন না! লোকটার রকম-সকম, ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া, আমি একবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছিলাম। আমাকে মোকদ্দমার দায় হইতে খালাস করিবার জন্য, লোকটা কি অক্লান্ত পরিশ্রমই না করিয়াছে! অথচ যখন সেই পরিশ্রমের পুরস্কার তাঁহার হস্তগত হইল, তখন তাঁহার মুখে একটী আত্ম-প্রসাদের রেখাও ফুটিল না! যেমন দিনের পর রাত্রি—রাত্রির পরে দিন হয়, আমার নিষ্কৃতিও যেন তেমনি একটা সুনিশ্চিত প্রাত্যহিক ঘটনা মাত্র! যেন প্রত্যাশার অধিক কিছুই ঘটে নাই, তাঁহার মুখে এমনি একটা সহজ, নিশ্চিন্ত ভাব।

যখন হাকিম আমার খালাসের হুকুম প্রচার করিলেন, কেবল তখন একবার দেখিলাম, তিনি তাঁহার সঙ্গীয় শিক্ষা-নবীস জুনীয়ার উকীলের কাণের কাছে, হাসিয়া হাসিয়া, ফিস্ ফিস্ করিয়া, কি যেন কহিলেন। কিছু ভাল করিয়া শুনিতে পাইলাম না, কিন্তু আমার মনে হইল, সে হাসির মধ্যে, জজ, ও জুরীর বিবেচনা ও বিচার-শক্তির উপর, এবং আমার অব্যাহতির হুকুমের উপর, একটা তীব্র শ্লেষ ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছিল। আমি নির্দোষী ছিলাম না, আমার ব্যারেষ্টারের 'রায়'ই ঠিক 'রায়'; কিন্তু তবু অপ্রিয় সত্যকে আমি প্রাণ ভরিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমার মনে হইল, লোকটা আমার জন্য যথেষ্ট করিয়াছে বটে, কিন্তু শেষকালে তার একি ব্যবহার! লোকটার উপর আমার তখন কৃতজ্ঞতা অপেক্ষা অশ্রদ্ধাই প্রবল হইয়া উঠিল। শ্রদ্ধার প্রয়োজনও নির্ভরের সঙ্গে সঙ্গে ততক্ষণ অন্তর্দ্ধ্যান হইয়াছে। সংসারের এই তো সনাতন প্রথা,—তাহাতে আমার এমনি কি বিশেষ দোষ ছিল?

যথা সময়ে আমার সঙ্গীয় টাকা-কড়ি, জামা কাপড় প্রভৃতি, সব ফিরিয়া পাইলাম। হত্যাপরাধে আমার যে পিস্তলটা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল, তাহাও পুনরায় আমাকে প্রত্যর্পণ করা হইল। বিচারের দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টার তীব্র উত্তেজনার পর, জনতার ভিঁড় ঠেলিয়া, তাড়াতাড়ি তাড়িতালোকোদ্ভাসিত সুবিস্তৃত রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলাম।

অন্ধকার রাত্রির শীতলতা, বহুকালের অপহৃত মাতৃ-বক্ষের ন্যায় মধুর! বহুদিনের অবরোধের পর, জ্বর-তপ্ত শিশুর মত, সেই স্নিগ্ধ

অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। ধীরে ধীরে, মুক্ত বায়ুর স্পর্শে, আমার স্বেদ-সঞ্চিত উত্তপ্ত ললাট, অনেকটা শীতল হইল। কর্ম্ম-মুখর সংসারের মাঝে, আবার নিজকে ফিরিয়া পাইয়া, নিজেই কতকটা বিস্মিত হইলাম। কারণ, বারংবার ভিতর হইতে, কে যেন বলিতেছিল, তুমিই অপরাধী,—মনে হইল বুঝিবা খালাস পাই নাই, শুধু রাজ-দ্বারে চলিয়াছি মাত্র! কিন্তু এ ভাবান্তর মনে বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় নাই; কারণ, তাহা হইলে অপরাধীর আর সংসার করা চলে না!

আমি যে দণ্ডবিধি আইনের একটী অদৃশ্য ছিদ্রপথে নিরঙ্কুশ বাহির হইয়া পড়িয়াছি, মানুষের বিচারালয়ে, ক্ষীণবুদ্ধি মানুষের ভ্রান্ত-বিচারে যে আমি মুক্তিলাভ করিয়াছি, সেকথা বুঝিতে আর বড় বিলম্ব হইল না।

রাজ-পথে চলিতে চলিতে, একটু শীত-শীত করিতে লাগিল! এই মোকদ্দমার আসামী হইয়া, প্রথম যখন হাজতে ঢুকিয়াছিলাম, তখন ভাদ্রমাস। আজ অগ্রহায়ণের শেষ-ভাগে অব্যাহতি লাভ করিয়াছি। একখানা সাদা চাদর ও একটি ছিটের জামা গায়ে দিয়া, হাজত বাসরে পদার্পণ করিয়াছিলাম। আজ অগ্রহায়ণের শীত তাহাদের দ্বারা নিবারণ হইবে কেন? কিন্তু আসল কথা বলিতে কি, বাহিরের শীতলতা অপেক্ষা, বেশী হিম লাগিতেছিল আরেক জায়গায়! ব্যারেষ্টারের শেষ ব্যবহারটা যেন আমার অন্তরের মধ্যে যথেষ্ট স্পিরিট্-ইথার ঢালিয়া দিয়া, হৃদ্‌পিণ্ডটাকে একবারে জমাট বরফ করিয়া দিয়াছে। এতক্ষণে সে ব্যারেষ্টারের নিকট নিজের জীবন-ঋণের শেষ কৃতজ্ঞতার রেখাটীও বিলুপ্ত হইল,—অনাবিল ঘৃণা ও বিরক্তি ভিন্ন, তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিবার মত, আমার আর কিছুই ছিল না!

খানিক দূরে আসিয়া, তাড়িতালোক উদ্ভাসিত রাজ-পথের আলোক আমার চক্ষে অসহ্য বোধ হইল। তাই ল্যাম্প-পোষ্ট বামে রাখিয়া, তাড়াতাড়ি সুড়ঙ্গের মত অন্ধকার, একটা অপ্রশস্ত গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। কিছু দূরে অগ্রসর হইয়া, "বিশুদ্ধ-ব্রাহ্মণের হোটেল" এই ধ্বজ-বজ্রাঙ্কিত একটী সাইন-বোর্ড দেখিতে পাইয়া, সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম। কারণ, অনেকক্ষণ হইল উদরাভ্যন্তরে ভগবান্ বৈশ্বানর আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন; তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা আমার ছিল না!

হোটেল-খানায় উপস্থিত হইয়াই দেখি, সেখানকার সমাগত লোকেরা আমার মোকদ্দমাটীর পুনর্বিচার করিতেছে! এ হাইকোর্টে বহু বিচারক, আমার দোষাদোষ সম্বন্ধে, বহু প্রকার 'রায়' প্রকাশ করিতেছেন। কেহ পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট বাজে খরচ করিয়া বলিতেছিল, "মানুষ বুদ্ধিমান হইলে বুঝি জুরি-লিষ্ট হইতে তাহার নাম কাটিয়া দেওয়া হয়!" কেহ গম্ভীরভাবে বলিতেছিল, "এ বোকামি নয় হে,—এর নাম অতি-বুদ্ধি, কিসের লক্ষণ, জান তো!" কেহ মাথা নাড়িয়া বলিল, "জজ বুঝেছিল, কিন্তু এ যে জুরির বিচার,—করে কি!" ইত্যাদি।

ঘরের এক কোণে, টিনের ডিবার মধ্যে, কেরাসিনের দীপটী, ঝুল ও ধোঁয়ার ভিতরে, কোনমতে জ্বলিতেছিল,—তাহাতে আলো অপেক্ষা অন্ধকারই ভাল দেখা যাইতেছিল! যখন আমি হোটেলে প্রবেশ করি, তখন দেখিলাম, একটি ঝি ঘরের বারান্দা ঝাঁট দিতেছে। আমাকে দেখিয়াই, সে আর একটি লোককে ধাক্কা দিয়া, কাণে কাণে কি যেন বলিল। তৎক্ষণাৎ একটা কাণাকাণি, ইঙ্গিতপূর্ণ চোখাচোখি, সংক্রামক

ব্যাধির মত, সারা ঘরময় বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ঘরের মেজেতে, একটি সপের উপর গিয়া সবে বসিয়াছি, অমনি আমার পশ্চাৎদিক্ হইতে আমার জামার উপর একটি অভদ্রোচিত স্পর্শ অনুভব করিয়া, ফিরিয়া দেখি, একটা মধ্য-বয়স্ক লোক—দাঁড়াইয়া। ইনিই হোটেলের বড় কর্ত্তা। তা তিনি হোটেলের বড় কর্ত্তাই হউন, আর বিকানিরের মহারাজই হউন, একজন আগন্তুকের সঙ্গে, তাঁর এ প্রকার অসামাজিক ব্যবহারটা, আমি আদৌ পসন্দ করি নাই, সেই জন্য মনের বিরক্তিটাকে কিছুমাত্র চাপা না দিয়া, একটু তিক্ত স্বরেই বলিলাম ;—

"সে কি রকম, ম'শায় ?"

সে লোকটা উদ্ধত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—

"পান্নালাল জহুরীর খুনের মামলার আসামী নাহে তুমি ?"

কিছু গরম ভাবেই আমি উত্তর করিলাম,—

"বেশতো, তাতে হয়েছে কি ?"

ততক্ষণে আমার চারিদিকে, মিশ্রির দানার মত, জটলা বেশ বাঁধিয়া উঠিয়াছিল,—যে'ই আমার ঐ স্বীকারউক্তি, অমনি লোকগুলি সব আমার নিকট হইতে একটু তফাৎ হইয়া দাঁড়াইল,—যেন আমি কুষ্ঠরোগী,—স্পর্শ করিলে ব্যারাম হওয়াটা অনিবার্য্য !

আমার কথা শুনিয়া, সেই হোটেলের সুলতানের দুই চক্ষু এঞ্জিনের আলোর মত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল ! তিনি আমায় রুক্ষ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—

"আমার হোটেলে হবে না, বাপু, তুমি তোমার পথ দেখ।"

আমি শুষ্কমুখে জবাব দিলাম,—

"মামলায় আমি বেকসুর খালাস পেয়েছি যে!"

বেয়াড়া হোটেল-ওয়ালা ঝির হাত হইতে ঝাঁটাটা কাড়িয়া লইয়া, বলিল ;—

"আরে রেখে দাও তোমার আদালতের সূক্ষ্ম-বিচার! নথি তলব করে, আমরা তোমার আপীল শুনতে বসি নি ; বেরোও বল্‌ছি,—নৈলে ভাল হবে না!"

উদরে ক্ষুধা, বাহিরে অপমান ; আমি অন্ধকারের জীব, আবার অন্ধকারে বাহির হইয়া পড়িলাম। হোটেলের বাহিরে আসিয়া দেখি, আমার অভ্যর্থনার জন্য, একদল ছেলের 'রেজিমেণ্ট' জড় হইয়াছে। আমি বাহির হইবামাত্র, তাহারা আমার পিছু লাগিল। কেহ বলে চোর, কেহ বলে বদমায়েস্, কেহ বলে ডাকাত, কেহ বলিল মানুষ-খেগো! কেহ কেহ বাক্‌যুদ্ধ অনাবশ্যক মনে করিয়া, ইট-পাটকেল ছুঁড়িতে লাগিল। আমি তাড়াতাড়ি বহুকষ্টে, অনেক অলি-গলি ঘুরিয়া, তাহাদের কবল হইতে সে যাত্রা রক্ষা পাইলাম।

চলিতে চলিতে, সহরের এক প্রান্ত-দেশে আসিয়া পৌছিয়াছি। তখন কুহেলী-জড়িত নিশীথের উপর ক্ষীণচন্দ্র, ক্ষয়রোগাক্রান্তা সুন্দরীর ন্যায়, শীর্ণ সুন্দর মুখে দেখা দিয়াছেন। আমার যাইবার কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না। যাহারা অন্ধকারের জীব,—তাহাদের সংসারবন্ধন থাকে না।

তাই অনির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে ছিলাম, আর ভাবিতেছিলাম, কেবল আমার সেই ব্যারেষ্টারের কথা। এ সংসারে আমার লুণ্ঠনের সাম্রাজ্য যে পুনঃসংস্থাপিত হইয়াছে,—অন্ধকার রজনীর ভিতরে আজ যে পুনরায়

মৃগনাভি

আমার স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইয়াছি, তাহার মূলে ত ব্যারেষ্টারের কুশাগ্রীয় আইনবুদ্ধি এবং অক্লান্ত মানসিক পরিশ্রম। তাহারই চেষ্টায় আজ আমার ভবিষ্যৎ কণ্টকমুক্ত। নচেৎ আজকার রাত্রিবাসের জন্য, অন্ধকার কারা-কক্ষে আমার স্থান হইয়াছিল,—তার পরের রজনী কোন্ গাঢ়তর অন্ধকারের মধ্যে নিদ্রিত ছিল, তাহা কে বলিতে পারে! কিন্তু, তবু জানি না কেন, তাহার প্রতি আমার একটা ঘৃণাই কৃতজ্ঞতাকে বে-দখল করিয়া অন্তরে বাহিরে জমিয়া উঠিতে লাগিল!

পথ চলিতে চলিতে, রাস্তার ধারে, একখানি হত-শ্রী উদ্যানের মাঝে, একখানি ছোট পাকাবাড়ী দেখিতে পাইলাম। গাছ পালার কোনও পারিপাট্য নাই। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জঙ্গলের মধ্যে, দুই একটা সুগন্ধি ফুলের গাছে,—দুই একটা অস্ফুট কুঁড়ি, পত্রবাহুল্যের মধ্যে যেন লজ্জায় অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া রহিয়াছে। ঘর খানির চারিদিক হইতে, খোলা জানালা দিয়া, আলো বাহিরের গাছপালাগুলিকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। ঘরের ভিতর হইতে, উতলা বাঁশীর স্বর, বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল;—"বাঁশরী বাজাতে চাই, বাঁশরী বাজিল কই!"

উদরাভ্যন্তরে তখন ক্ষুধার আগ্নেয়-গিরি জ্বলিতেছিল; সুতরাং তখন আমার বিবেচনা করিয়া কাজ করিবার বড় একটা অবসর ছিল না। উদ্যানস্থিত মেঁধি গাছের বেড়া একলম্ফে পার হইয়া, একবারে বাগানের ভিতরে আসিয়া পৌঁছিলাম। বরাবর দালানটীর সদর দরজার কাছে আসিয়া দেখি, দ্বার ভিতর হইতে বন্দ। বাহির হইতে বারংবার কড়া নাড়িতে লাগিলাম, এবং দরজায় আঘাত করিতে লাগিলাম, কিন্তু ঘরে লোক জনের সাড়া পাইলাম না। কেবল কে একজন

তাহার সমুদয় মন প্রাণ, উদাস বাঁশীর সুরে, ভাসাইয়া দিয়া, একটা ব্যথিত আর্ত্তস্বরে, যেন নির্জ্জনগৃহের চারিধার মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে।

সুরের মধ্যে বারংবার তাল-ভঙ্গ হইতেছিল। বাজনা শুনিয়া বেশ বুঝা যায়, যে বাঁশী বেচারী, নূতন শিক্ষার্থীর দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে না পারিয়া, এমন বেসুরা রাগিনীতে কাঁদিয়া মরিতেছে। শীতের দম্‌কা হাওয়া মাঝে মাঝে হু হু করিয়া বহিতেছিল। কিন্তু ধন্য শিক্ষার্থীর সহিষ্ণুতা! তার বাদ্যের আর বিরতি ছিল না। আমি আরো দুই তিন বার দ্বারে খুব কষিয়া আঘাত করিলাম, কিন্তু তবু কেহ আসিল না। কতক্ষণ খুব জোরে ধাক্কা-ধাক্কি করিতে করিতে, ভিতরের জীর্ণ অর্গলটা সহসা খুলিয়া গেল, আমিও মুহূর্ত্তকাল চিন্তা না করিয়া, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

যেখানে প্রবেশ করিলাম, সেটা একটা লম্বা দেয়াল-ঘেরা বারান্দার মত। বাঁশীর উন্মত্ত চীৎকার লক্ষ্য করিয়া, আমি সেখান হইতে বরাবর সেই কাম্‌রার দিকে অগ্রসর হইলাম। আমার পদ-শব্দে, তখন বাঁশীর গান থামিয়াছে। যে ঘরে বাঁশী বাজিতেছিল, সে ঘর হইতে, কে একজন যেন চেনা-সুরে কহিল,—"কে—ও?" তাহার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর স্বরূপ, তখন আমি সেই কাম্‌রার ভেজান দরজা ঠেলিয়া, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, সে নটবর বংশীধারী অপর কেহ নহে,—আমারি সেই ব্যারেষ্টার!

ইনি সেই ব্যারেষ্টার,—যাঁহার কৃপায়, এই অলক্ষণ হইল আমার গলা হইতে মৃত্যুর দড়ি খসিয়া গিয়াছে, এবং এতক্ষণ, রাস্তায় রাস্তায়, যাঁহার মুণ্ডপাত করিয়া আসিয়াছি! টেবিলের উপর একটী উজ্জ্বল কেরাসিনের ল্যাম্প্‌ জ্বলিতেছে। ব্যারেষ্টার তার পার্শ্বে বাঁশী হাতে

করিয়া বসিয়া। মুখে উদ্বেগের চিহ্ন,—চক্ষের উপর একটা সন্নিহিত আশঙ্কার ছায়া। ব্যারেষ্টার একা,—ঘরে আর কেহ নাই।

জানি না কেন, তাহার মুখ চোখ দেখিয়া আমার মনে হইল যে, আমার গোপন রহস্যের যতটুকু তাকে খুলিয়া বলিয়াছিলাম, সে যেন তার চাইতে ঢের বেশী খবর রাখে! আমার শরীরটা কাঁটা দিয়া উঠিল। যদি তাহাই হয়, আমার গোপন কথা যদি ঘুণাক্ষরেও সে জানিয়া থাকে, তবে এই দণ্ডে, পিস্তলের গুলিতে, তাহার মাথা উড়াইয়া দিতে কুণ্ঠিত হইব না। এই চিন্তা করিয়া পকেটের পিস্তলটা স্পর্শ করিয়া দেখিলাম, পিস্তল বেশ মজবুত,—তাতে গুলি ভরাই আছে। তাহাতে আমি মনে কতকটা সান্ত্বনা পাইলাম। কিন্তু আমাকে দেখিয়াই, তিনি একটু হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"কেও তুমি? এসো,—বসো এসে।"

আমি কুণ্ঠিত-ভাবে দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছিলাম;—আমার মনের মধ্যে তখন একটা ভয়ানক বিপ্লব চলিতেছিল। আমাকে নীরব দেখিয়া, তিনি আবার বলিলেন;—

"এসো না হে,—দরজাটা দাও দেখি, ভারি ঠাণ্ডা আসচে।"

এবার আমি নিঃশব্দে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া, ব্যারেষ্টারের সাম্‌নে একটা বেঞ্চের উপর গিয়া বসিয়া পড়িলাম। বলা বাহুল্য, ইচ্ছা করিয়াই আমি তাঁহাকে নমস্কার করিলাম না!

ব্যারেষ্টার আমার সঙ্গে আর কোনও কথা না বলিয়া, পুনরায় বাঁশীর সুরে তাঁর সারা হৃদয় উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিলেন। বাঁশী মধুর-স্বরে বাজিয়া উঠিল;—

"তোমার গোপন কথাটী সখি, রেখো না মনে,

তোমার গোপন কথাটী শুধু, আমায় শুধু, আমায় বোলো গোপনে!"

একি গান, না আমার গোপন রহস্যটার উপর কটাক্ষ-পাত করিবার ছলনা মাত্র?

ব্যারেষ্টার খর্ব্বাকৃতি মনুষ্যটী; মুখখানি পাকা আমড়াটীর মত, গোল-গাল, রসে পূর্ণ। হাল্-ফ্যাসন মত দাড়ি-গোঁফ কামানো। চঞ্চল, তীব্রোজ্জ্বল চক্ষু দুটীর উপরে জোড়া ভুরুর শোভা বেশ মানাইয়াছিল। তার সে সময়কার মুখ-চোখের চেহারা দেখিয়া, জানিনা কেন, আমার স্থির বিশ্বাস হইয়া গেল, সে আমার গুপ্ত রহস্যের সব সন্ধান পাইয়াছে। তবে তার মৃত্যু অনিবার্য্য! শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, স্থির করিলাম, আমার সমুদয় রহস্য জানে, এমন দুটী লোক এক সঙ্গে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না!

কিছুকাল পরে, বাঁশীটী টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া, তিনি স্মিত-মুখে আমাকে বলিলেন;—

"তাইতো,—এখন যে তুমি আস্‌বে, তা'তো আমি স্বপ্নেও জান্‌তুম না।"

তখন রাত্রি আন্দাজ সাড়ে দশটা।

টানেলের মধ্যে শব্দ করিলে, যেমন কতকটা অস্পষ্ট আওয়াজ হয়, তেমনি আমি গুজ্-গুজ্ করিয়া কতকটা, কি বকিলাম। তার অর্থ তিনি তো কিছু বুঝিলেনই না, আমি নিজেও ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই; কারণ, মনের অবস্থাটা তখন বড়ই বিশ্রী। তিনি কিছু-ক্ষণ পর আবার বলিলেন;—

"দেখ, আজ বাঁশীর সঙ্গে আমার মনের সুর কিছুতেই মিল্‌চে না,—খালি বেসুরা বাজ্‌চে। যতটুকু রহস্য আজ একে বলেচি, ততদূর যেতে সে একেবারে নারাজ।"

আমি রুক্ষ-কণ্ঠে বলিলাম ;—

"আমারো মনে হচ্চে, আজ অনেক অনুচিত রহস্য একে বলা হয়েচে।"

আমার কথা শুনিয়া, ব্যারেষ্টারের মুখ একেবারে সাদা হইয়া গেল! আমিও সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইয়া, আমার কর্ত্তব্য স্থির করিলাম।

চতুর ব্যারেষ্টার, চোখের নিমেষে নিজের মনের ভাবটা চাপিয়া গিয়া, অতি তীব্রোজ্জ্বল দৃষ্টিতে, যেন আমার কালো অন্তঃকরণের সমস্তটা দেখিয়া লইলেন! ওঃ! সে কি ভয়ানক বৈদ্যুতিক "ক্রশ-একজামিনেসন্‌"। তারপর কি মনে করিয়া, তাড়াতাড়ি উঠিয়া, শিশ্‌ দিতে দিতে, নিকটস্থ আলমারী হইতে দুইটী চুরুট বাহির করিয়া, একটী আমাকে দিয়া, অপরটী তিনি ধরাইয়া মুখে দিলেন।

হ্যাভানার সৌরভে ঘর আমোদিত হইল।

তারপর চেয়ারে বসিয়া, অন্য-মনস্কভাবে পূর্ব্বচিন্তার প্রতিধ্বনি করিয়া, বলিলেন ;—

"ততদূর যেতে সে একেবারে নারাজ! তাইতো,—তবে আর কেন!"

তখনই পুনরায় ফুর্ত্তির সহিত আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন ;—

"একটা পয়েণ্ট নিয়ে, বাঁশীতে আমাতে তর্ক হচ্চিল,—আজ বাঁশীর কাছে আমার যুক্তি-তর্ক সব হার মেনেচে! তা যাক্‌,—ভাল কথা,

এখন কি কর্‌বে বলে ঠিক কল্লে? জীবনে আবার একটা সুযোগ পেলে যখন, তখন সেটাকে যেন ব্যর্থ হতে দিয়ো না!"

আজ চারি পাঁচ মাস পরে, তাম্রকূট-সার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া, আমার বুদ্ধি বেশ সতেজ ও খোলাসা করিয়া দিয়াছে। পাঠক-পাঠিকা বোধ হয় জানেন, বিচারের অব্যবহিত পূর্ব্বে আমি যেখানে ছিলাম, সে রঙ্গালয়ে ধূমপান নিষেধ!

আমি স্থির হইয়া বলিলাম;—

"আপনি জানেন. সকলের আগে আমি কি কোর্‌ব বলে ঠাউরিচি?"

তিনি একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন;—

"না, তবে আগে যা কোর্‌বে, তাতেই তোমার ভবিষ্যতের গতি স্থির হবে।"

আমি খুব দৃঢ়তার সহিত, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম;—

"আমার সকলের আগের কাজ,—আপনাকে খুন করা!"

তিনি হাসিয়া উঠিলেন!

এমন সম্ভাষণেও যে মানুষ হাসিয়া উঠিতে পারে, সেটা আমার জানা ছিল না! তারপর, হাসির সঙ্গে খানিকটা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ মিশ্রিত করিয়া, তিনি আমাকে বলিলেন;—

"সে আমি অনেকক্ষণ বুঝ্‌তে পেরেচি। যখন তুমি ঘরে ঢুকেচো, তখন থেকেই। তবে আমার কথাটা হচ্চে এই যে, কাজ যেন এই ভাবেই সুরু কর্‌লে,—কিন্তু তারপর?"

আমি মুখ হইতে একগাল চুরুটের ধোঁয়া বাহির করিয়া দিয়া, গাঢ়স্বরে বলিলাম,—

"ওঃ, তারপরের কথা ভাব্‌বার ঢের সময় পাওয়া যাবে।"

আবার হাত দিয়া পকেটের পিস্তল স্পর্শ করিলাম। সে যেন মৃত্যু-বাণ হৃদয়ে লইয়া, বিষধর সর্পের মত, লোক-চক্ষুর অন্তরালে, ধীরে ধীরে ফণা মেলিতেছিল!

কাজটা আর্টের সহিত সারিবার জন্য, মনে মনে একটা ফন্দি আঁটিলাম। স্থির হইল, আগে ব্যারেষ্টারকে বেশ চটাইয়া লইলে, কাজ করিবার জন্য, যথেষ্ট উত্তেজনা ও অজুহাত পাওয়া যাইবে। নচেৎ, যাহার বুদ্ধির জোরে আজ আমি বাঁচিয়া আসিয়াছি, তাহাকেই গুলি করা,—সে বড় কঠিন!—আমার মত মহাপাপীর পক্ষেও কঠিন!

কিন্তু, এ ক্ষেত্রেও আমারই আগা-গোড়া বুঝিবার ভুল! এ পর্য্যন্ত অসদ্ব্যবহারেও যাহাকে আমি চটাইতে পারি নাই, তাহাকে আমার চটাইবার সকল চেষ্টাই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গেল। তিনি বলিলেন,—

"পরের কথা পরে ভেবে, তোমার বেশী সুবিধে হবে না। এখন থেকে আবার যদি জীবনটাকে তুমি এমনি করে, পাপের বোঝায় ভারি করে তোল, তবে আর শেষকালে অভ্যাস কিছুতেই বদ্‌লাতে পারবে না। আমাকে খুন করা, তোমার পক্ষে খুব একটা শক্ত কাজ নয়, তা জানি! কিন্তু আগ-পাছ, ভাল করে বিবেচনা না করে, হঠাৎ কাজ করে বস্‌লে, তোমার কোনো ফল হবে না,—হয়তঃ মনে তোমার একটা দাগাও থেকে যেতে পারে।"

স্নেহের কোমলতা-মাখা কণ্ঠস্বর! কিন্তু, তবু তাঁর কথাগুলির

প্রতি অক্ষরে অক্ষরে, মানুষের কৃতজ্ঞতার উপরে, কি তীব্র পরিহাসই ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছিল!—

তার পর দুজনেই খানিকক্ষণ একেবারে চুপ-চাপ,—কোনও কথা-বার্ত্তা নাই। আমি পকেটের মধ্যস্থিত ছোট পিস্তলটীর উপর অন্য-মনস্কভাবে অঙ্গুলি চালনা করিতেছিলাম। এমন সময় তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন;—

"তুমি যা ভাব্‌চো—সে বিষয়ে আমার কতটা জানা আছে, শুন্‌বে?"—

আমি একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলাম;—

"যদি খুব তাড়াতাড়ি বলে শেষ কত্তে পার তবে; —আমার বেশী ফুরসুত নেই!"

তিনি আমার উপর একটা তীক্ষ্ণ কটাক্ষ-পাত করিয়া বলিলেন;—

"বেশ্ কথা! দেখ্‌বে এখন, তুমি যতখানি মনে ভাব্‌চো, তার চাইতেও কতখানি বেশী আমার জানা আছে! প্রথম বাদীর পক্ষে, কি নালিশ ছিল, তা একটু তলিয়ে দেখা যাক্।"

আমি বলিলাম,—"বেশ।"

তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন;—

"ছেক্‌ড়া গাড়ীতে, পান্নালাল জহুরী মাঠের ভিতরের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল,—রাত্রি অনেক। সঙ্গে শুধু চাকর গণেশরাম। স্বভাবটা তার খুব সুবিধা-জনক ছিল না। জহুরীর সঙ্গে টাকা পয়সাও ছিল ঢের। আর ছিল সেই হীরাটী, দাম পঁচিশ হাজার টাকার কম হবে না!—কেমন?"

আমি সংক্ষেপে বলিলাম,—"হুঁ"।

তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন ;—

"বেটা নেহাৎ মূর্খ! সামান্য পয়সা বাঁচাতে গিয়ে, অত রাত্তিরে, সঙ্গে অত টাকাকড়ি হীরা-জহরৎ নিয়ে, অমন-ভাবে পথ চলা! ভোরবেলা দেখা গেল, কোচোয়ান বেটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে,—তোমরা তাকে ক্লোরোফরম্ করেছিলে।"

আমি একটু কাশিলাম।

"গাড়ীর ঘোড়া দুটোর সর্ব্বাঙ্গ ঘাম ও ফেণায় মাখা! তারা খালি মাঠের মাঝে ছুটাছুটী করে বেড়াচ্চে ;—রাস্তার উপর গাড়ীখানি উল্টে পড়ে আছে। আর দেখা গেল, গাড়ীর কাছেই পান্নালালের মৃত দেহ পড়ে আছে। বুকে আর পাঁজরাতে, দুটো পিস্তলের গুলি বিঁধেচে। বুকের গুলিটা তার হৃদ্‌পিণ্ডকে ভেদ করে লেগেছে! হীরা জহরৎ টাকাকড়ি সব লুট! গণেশরাম নিরুদ্দেশ! এই ত ঘটনা।"

"তোমার স্বভাবটাও বড় সুবিধেজনক নয়! ঘটনার দিন দুই পর, একটা কাণাকাণি উঠ্‌লো—তোমার নিকট নাকি হঠাৎ অনেকগুলো টাকা-পয়সা এসে পড়েছে। আবার তোমার সঙ্গে গণেশের এমন খাতির! পুলিশ খানা-তালাসি করে তোমার বাড়ী থেকে তোমার জামা কাপড় বের কল্লে, তাতে রক্তের দাগ। তোমার পিস্তলটাও খানা-তালাসি করে পাওয়া গেল, তার মুখে পোড়া বারুদের গন্ধ ছিল! এই তো আওয়াজের চিহ্ন! তদন্তে প্রকাশ,—সেদিন গভীর রাত্রে তোমাকে ঐ রাস্তায় অনেকবার আসা-যাওয়া কর্ত্তে দেখা গেছে। কেমন, ঠিক বল্‌চি তো?"

আমি মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিলাম, যে ঠিক বলা হইতেছে।

"তোমার সাপেক্ষে বল্‌বার এই ছিল যে, গণেশরাম নিরুদ্দেশ, খানা-তালাসিতে তোমার ঘরে চোরাই হীরাটী পাওয়া যায় নি,– হীরাটী যে কোথায়, তার কোনই উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। টাকা কড়ি যা পাওয়া গেছে, তাতো সেনাক্তের মালই নয়;—বিশেষ, যখন ওসব তোমার নিজের বলে দাবী কচ্চ। বাদীর পক্ষে সব চেয়ে মারাত্মক কথা,—যে গুলি পান্নালালের বুক ও পিঠ থেকে বের করা হয়েচে, সে দুটি গুলি তোমার পিস্তলেরই নয়। সে পিস্তলের নলের মুখ তোমার পিস্তলের চাইতে অনেক বড়।"

আমি বলিলাম, "বেশ্‌,—তারপর?"

তিনি অঙ্গুলি দিয়া কি যেন দেখাইয়া বলিলেন,—

"দেখ দেখি, ঘরের কোণে ও কি দেখা যাচ্চে?"—

আমি একটু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিলাম,—

"একটা সাবল আর একটা টুক্‌রি বৈ আর তো কিছুই দেখ্‌চি না।"

ব্যারেষ্টার জোরে টেবিলের উপর একটা চাপড় দিয়া বলিলেন;—

"বেশ্‌–সাবল আর টুক্‌রি বই আর কিছু নয়! আসল কথা, গণেশরাম পান্নালালকে খুন করে তার হীরেটী হস্তগত করলে—আর তুমি খুন করেচো গণেশরামকে! তারপর,—ব্যস্‌–সাবল আর টুক্‌রীর ব্যাপার,—আর কিছু নয়;—কেমন, ঠিক্ তো?"

আমি তখন ঘামিয়া একেবারে কাদা হইয়া উঠিয়াছি!

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই, তিনি ভারি স্ফূর্ত্তির সহিত তাড়াতাড়ি বাঁশীটা তুলিয়া লইয়া, গান ধরিলেন;—

"এমন দিনে তারে বলা যায়!"

আমি তাড়াতাড়ি তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনি কি তবে তার লাস্ খুঁড়ে তুলেছেন?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন ;—

"বল কি হে বাপু! মোকদ্দমা আস্কারা না হতেই?" খুন-খরাবতের কাজে তোমার বেশ হাত ছাপাই আছে জানি, কিন্তু আমাদের আইন-ব্যবসায়ীদের বিবেক ও 'এটিকেটের' কথা তুমি কিছুই জান না!"

আমি চুপ করিয়া থাকিলাম।

তিনি আবার বলিতে লাগিলেন,—

"এ ব্যাপারে আমার হয়ত অনেক বেশী জানা আছে, অথবা যথেষ্ট জানা নাই। কিন্তু তা'তে বড় একটা কিছু আসে যায় না। কিন্তু একথা ঠিক যে,—যদি বিবেচকের মত কাজ কর, তবে আমাকে খুন করবার ইচ্ছাটা তোমার পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত হয় নি। কিন্তু এ কথাটা তোমার মনে হয়েচে কি না জানি না যে, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমাকে খুন করলেই বেশী লাভ, না বাঁচিয়ে রাখলেই বেশী লাভ! জানো তো, আমাদের উকীল ব্যারেষ্টারের মুখ,—রূপো দিয়ে বাঁধিয়ে রাখলে আর কোনো গোল নাই!"

এই বলিয়া, তিনি আর এক পস্‌লা হাসিলেন,—সে হাসির কি ঝঙ্কার!

"সে লাভালাভের বিচার তোমার কাছে। আচ্ছা এই ধর না,—যদি এক ঘণ্টার মধ্যে সেই হীরেটা আমি তোমায় পাইয়ে দি, তা হলে,

তুমি অবশ্য বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, বেশী তাড়াতাড়ি করে, তুমি হিসাবে কতখানি ভুল কচ্ছিলে !”

আমি বলিয়া উঠিলাম,—

“ও সব চালাকিতে বেশী এগুবে না। অত সহজে ফাঁকিতে পড়্‌বার ছেলে আমি নই।”

তিনি হাসিয়া বলিলেন,—

“আহাঃ, তুমি উল্টো বুঝ্‌লে যে! আমি শপথ করে বল্‌চি, আমি তোমার সঙ্গে চালাকি কচ্চি না ;—তোমায় আমি বিলক্ষণ চিনি ; কখনো পালাবো না। যদি সে চেষ্টা করি, অম্‌নি গুলি করো,—সব চুকে যাবে। এখন আমি শুধু তোমার সঙ্গে একটা সর্ত্ত ঠিক করে নিয়ে, কাজে হাত দিতে যাচ্চি। যা, হবার তা হয়েচে, কিন্তু তোমায় যদি সে মালটা এখন পাইয়ে দি, তবে আমার খালাস ?—কেমন রাজি তো ?”

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া, পরে বলিলাম ;—

“আচ্ছা, তা-তো রাজি, কিন্তু যদি না দিতে পার ?”

তিনি বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া বলিলেন ;—

“ব্যস্ —গুলি !”

এই বলিয়া, তিনি দুই খণ্ডে ভাগ করিয়া, বাঁশটী পকেটে পুরিলেন। আমিও পিস্তলটী সাবধানমত পকেটে রাখিলাম। দুজনের সঙ্গেই দুইটী বাদ্যযন্ত্র,—কিন্তু দুয়ে কত তফাৎ !

তিনি আমায় বলিলেন ;—

“তুমি ঐ সাবল ও টুক্‌রীটা নিয়ে এসো !”

আমি নিঃশব্দে সাবল ও টুক্‌রী ঘাড়ে তুলিয়া লইলাম। তার পর দুই জনে একসঙ্গে নিঃশব্দে ঘরের বাহির হইয়া পড়িলাম।

বাহিরে ম্লান-জ্যোৎস্না, সুপ্তা পৃথিবীর মুখে হাসিটুকুর মত, তখনো লাগিয়া রহিয়াছে। নীলাভ সবুজ ঘাসের মাঝে, মেঠো রাস্তাখানি, একখানি সাদা রেশমী ফিতার মত, পড়িয়া আছে। আমরা নিঃশব্দে সেই পথে চলিয়াছি। আমার সঙ্গী মাঝে মাঝে শিশ্ দিয়া, নীরব প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার অন্তরের সুরটী মিলাইতেছিলেন,—আমি চুপ করিয়াই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে ছিলাম, কারণ, আমার হৃদয়ের সুর প্রকৃতির সঙ্গে কখনো মিলিবার নয়!

হাঁটিতে হাঁটিতে আমরা, পান্নালাল যে জায়গায় খুন হইয়াছিল, সেই খানে আসিয়া পৌঁছিলাম।

খুন করিবার সময়, যে স্থান আমার নিকট কিছুমাত্র ভয়ঙ্কর বলিয়া মনে হয় নাই,—আজ মৃদু জ্যোৎস্নালোকে, সেই স্থানের ভীষণতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া, আমি একেবারে শিহরিয়া উঠিলাম। আমার মনের উপর একটা আশঙ্কার ছায়া, একটা মৃত্যুর জড়তা, বারে বারে আমার হৃদয়ের রক্ত-স্রোত রোধ করিয়া দিতে লাগিল! আমি তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া, সে স্থানটা পার হইয়া যাইতেছিলাম। কিন্তু যে স্থানে গাড়ী উল্টিয়া গিয়াছিল, ঠিক সেই খানে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া, ব্যারেষ্টার আমার পানে চাহিলেন। সে দৃষ্টিতে আমি একেবারে হিম হইয়া গেলাম!

ক্ষণকাল পরে, তিনি আমাকে বলিলেন ;—

"এইখানে জহুরী পড়েছিল,—খানিকটা জায়গা জুড়ে রক্ত

পড়েছিল! এই জায়গা থেকে আন্দাজ ৩০ হাত দূরে, আর একটা জায়গায়ও খানিকটা রক্ত ছিল! জহুরী গুলি খেয়ে অমনি মাটিতে পড়েছিল, কারণ প্রথম গুলিটাই তার হৃদ্‌পিণ্ড ভেদ করেছিল! তবু জজ, জুরী সকলেই বিশ্বাস কর্‌লে,—ত্রিশ হাত দূরে যে রক্ত পড়েছিল, সেও জহুরীর শরীর থেকে! সব আস্ত গাধা!"

তার পর, তিনি রাস্তা ছাড়িয়া দিয়া, মাঠের মধ্যে নামিয়া কি যেন খুঁজিতে লাগিলেন। আমি ছায়ার ন্যায় তাঁহার পিছু পিছু ঘুরিতেছি। মাঝে মাঝে, ভাসমান মেঘের আড়ালে পড়িয়া, চন্দ্রালোক অত্যন্ত নিস্তেজ হইতেছিল, আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। দুই একটী ইঁদুর-প্রত্যাশী বৃহৎ পক্ষী মাটীতে বসিয়া তপস্যা করিতেছিল,— আমাদের সাড়া পাইয়া তাহারা বাতাসে ভারি পাখা দুলাইয়া উড়িয়া গেল।

ঘুরিতে ঘুরিতে আমরা একটী ছোট নদীর কূলে আসিয়া পৌছিলাম। গাঢ় কালো গাছ-পালার মাঝে, সোণার নদীটী যেন ছবির মত! কূলে একটা স্থানে একটা বড় গাছ পড়িয়াছিল। বন্যার জল পাহাড় হইতে গাছটী ভাসাইয়া আনিয়া, এইখানে রাখিয়া গিয়াছে। সেই গাছের গোড়াটা একটুকু সরাইয়া দিয়া, একটা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া, ব্যারেষ্টার আমাকে বলিলেন,—"খোঁড়"।

"আমি বলিলাম ;—

নীচে কি আছে দুজনার যদি ঠিক জানা থাকে, তবে আর খুঁড়্‌বার কি দরকার?"

তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন ;—

"দেখই না একবার খুঁড়ে!"

খুঁড়িবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তখন আমি যেন তাঁহার ইচ্ছা-পাশে বন্দী! তাই নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও, আমাকে সেই স্থান খুদিতে হইল। প্রাণের উপর দিয়া, বরফের মত একটা শৈত্য, দেখিতে দেখিতে, আমার মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত হিম করিয়া দিল। খুঁড়িয়া কি-পাওয়া যাইবে, তাহা তো আমার অজ্ঞাত ছিল না,—কিন্তু তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিবার আমার সে সময় কোনও শক্তি ছিল না। আর আমার নিকটেই, বড় একখানি শৈবালাচ্ছন্ন পাথরের উপর বসিয়া, কাবুলের বুল্‌বুল্‌টীর মত, অতি প্রফুল্ল-চিত্তে ব্যারেষ্টার আপন মনে শিশ্‌ দিয়া গান করিতেছিলেন!

চন্দ্রের ম্লান-জ্যোৎস্না, শ্যামল তৃণরাশির উপর, মূর্চ্ছিতা সুন্দরীর ন্যায়, লুটাইয়া পড়িয়াছিল। সে জ্যোৎস্নালোক,—আমার সাবল ও তাহার গর্হিত কর্ম্মটীকে, ক্ষণে ক্ষণে রজতময় করিয়া তুলিতেছিল। পার্শ্বে স্বপ্নের নদীর সোণার জল,—কালো তট চুম্বন করিয়া, কোন্‌ নিদ্রার দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে! যখন আমি কাজ শেষ করিয়া, সাবলের উপর দেহভার ন্যস্ত করিয়া দাঁড়াইলাম, তখন গণেশরামের শুভ্র কঙ্কাল, শ্যামল ঘাসের উপর, ম্লান জ্যোৎস্নালোকে, কি বিদ্রূপের হাসিই হাসিতেছিল!

এই সেই গণেশরাম! পাঁচমাস পূর্ব্বে হত্যা করিয়া যাহাকে আমিই এখানে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলাম! শেষ-রাত্রে এই হত্যাকাণ্ড শেষ হইয়াছিল। তাড়াতাড়ি কোনও রকমে তাহাকে সমাহিত করিয়া, আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া, রাত্রি প্রভাত হওয়ার পূর্ব্বেই আমি এখান হইতে পালাইয়াছিলাম; কারণ, চোরাই হীরাটী

গণেশের সঙ্গে পাওয়া গেল না, অথচ, সেই হীরাটার জন্যই বন্ধুর হৃদয়ও স্বহস্তে পিস্তল দিয়া বিদীর্ণ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করি নাই!

কঙ্কালটা উৎখাত গহ্বর হইতে তুলিলে পর, হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, গহ্বরের মধ্যে একটা স্থানে, চন্দ্রের সমুদয় রশ্মি-জাল কেন্দ্রীভূত করিয়া, কি একটা পদার্থ জ্বলিতেছে! বক্ষের মধ্যে একটা আনন্দ-উচ্ছ্বাস উথলিয়া উঠিল। নত হইয়া চাহিয়া দেখি,—গহ্বরের মধ্যে সেই হীরাটা, কেন্দ্রীভূত চন্দ্র-কিরণকে নীল সবুজ হরিদ্রা লাল ভায়োলেট রঙ্গে বিভক্ত করিয়া দিয়া, যেন সমাধি-গহ্বরে আলাদীনের আশ্চর্য্য-প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছে! আমার হৃদয়ও, সে সমাধি-গহ্বরের মতই, সবে রঙীন স্বপ্নে সাজিয়া উঠিতেছিল, এমন সময়, পেছন হইতে একটা দীর্ঘ ছায়া আসিয়া, হীরার ফলিত-জ্যোতি একবারে নিভাইয়া দিল; আমি চমকিত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি,—সেই ব্যারেষ্টার দাঁড়াইয়া! তাঁহার বিস্ফারিত চক্ষু দুইটা নক্ষত্রের মত জ্বলিতেছে!

তিনি আমার পানে বড় বড় করিয়া তাকাইয়া বলিলেন;—

"তুমি একটা আস্ত গাধা; তোমার তখনি বুঝা উচিত ছিল,—যে সে হীরাটা গিলে ফেলেছিল!"

কিছুক্ষণ পরে, যেন কোন সুদূর নক্ষত্রলোক হইতে, তিনি আমাকে বলিলেন;—

"এখন আমার সর্ত্ত পূরণ হয়েছে? তবে এখন বিদায় হই। ভগবান্ করুন, আর যেন এ জন্মে তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হয়! কিন্তু সত্যের খাতিরে, যাবার আগে, তোমার নিকট আজ আমায় একটা কথা স্বীকার কর্ত্তে হবে। আজ রাত্রে, তুমি আমাকে একটা

মহাপাতক হতে রক্ষা করেছ ; সে জন্য আমি তোমার নিকট আজীবন ঋণী ! এই সাবল আর টুক্‌রি নিয়ে, আজ রাত্রে এ কাজে আমিই আস্‌বো বলে স্থির করেছিলাম। কেবল বাঁশীর সঙ্গে আমার মনের সুরটার মিল্‌ হচ্চিল না !

বাদীর মোকদ্দমা শুনে, এবং তোমার নিকট থেকে এ ঘটনার যতটুকু বুঝ্‌তে পেরেছিলাম, তা থেকে, কার্য্য কারণ ও সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা করে, আমি ঠিক ধর্‌তে পেরেছিলাম, গণেশরাম কোথায় আর সে হীরাটীই বা কোথায় আছে। এই হীরাই, আমার লোভের উপর লাল-নীল-পীত-সবুজ রঙের বিচিত্র আলোক-পাত করে, পাপের রঙীন পথে, আজ আমায় নরকের পানে টেনে নিচ্ছিলো। এই বিষয় নিয়েই যখন আমি আমার বাঁশীর সঙ্গে 'সোয়াল' কচ্ছিলাম, তখন তুমি এসে হঠাৎ আমার সমুখে দাঁড়ালে !"—

আমি তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলাম ;—

"যদি আপনি এর লাভের অংশ চান্‌, তবে অবশ্য—"

এবার ব্যারেষ্টার, একটু বিরক্তির সহিত, আমাকে বলিলেন,—

"এ সম্বন্ধে আর যদি তুমি আমাকে একটী কথাও বল, তবে আমি বল্‌বো, তুমি আমাকে ইচ্ছে করে অপমান কচ্ছ। এ পর্য্যন্ত তুমি আমার জন্য যা করেচো, এ জীবনে সে ঋণ কখনো ভুল্‌ব না। আগা-গোড়া তুমি আমার সঙ্গে যে ব্যবহারটা করেচো, তাতে তুমিও আমার বাঁশীর 'সোয়াল'ই সমর্থন করেচো। দু'ঘণ্টা আগে, আমি লোভের স্রোতে তৃণের মতো ভেসে যাচ্ছিলাম,—তোমার আর আমার বাঁশীর অনুগ্রহে আমি এ যাত্রা রক্ষা পেয়েচি। এখন আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌তে

পারি যে, আমি ঘটনা ও অবস্থার পর্য্যালোচক আইন-ব্যবসায়ী মাত্র,—অপরাধী নহি!"

এই বলিয়াই আমার সঙ্গে আর একটি কথাও না বলিয়া, তিনি বরাবর চলিয়া গেলেন,—আমি সেখানে স্তম্ভিত হইয়া একাকী দাঁড়াইয়া থাকিলাম! মাঠ পার হইয়া, তিনি রাস্তার উপর উঠিলেন,—মৃদু চন্দ্রালোকে, তাঁহার মূর্ত্তিটী, কালো দিগন্ত-রেখার উপর একটী সাদা দাগের মত, ক্রমশঃ ছোট হইয়া আসিতে লাগিল; যতদূর দৃষ্টি চলিল, আমি অবাক্ হইয়া সেই আশ্চর্য্য মনুষ্যটাকে দেখিতে লাগিলাম। তারপর, অন্ধকারের মধ্যে সে জীবন্ত ছবি কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু, মূর্ত্তি যখন অদৃশ্য হইয়া গেছে. তখনো বহুদূর হইতে তাঁহার বাঁশীর সুর অত্যন্ত করুণভাবে আমার মর্ম্মে মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া, আমার হৃদয়-পদ্মের মুকুলিত দলগুলি, একটী একটী করিয়া, ফুটাইয়া তুলিতে লাগিল। বাঁশী প্রাণ মাতানো মিঠা সুরে বলিতেছিল;—

"তুমি নির্ম্মল কর, মঙ্গল করে, মলিন মর্ম্ম মুছায়ে,
তব পুণ্য কিরণ, দিয়ে যাক মোর, মোহকালিমা ঘুচায়ে।

... ...

আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া, বসে আঁধারে মরি গো কাঁদিয়া,—
আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু, দাও হে
দেখায়ে বুঝায়ে!"

সে বাঁশীর সুরে এমন একটা আনন্দ ও প্রফুল্লতা ছিল, যাহা আমার পঁচিশ হাজার টাকা মূল্যের চোরাই হীরা পাওয়ার মধ্যে ছিল না! নিশীথের সুপ্ত নদী-তটে, জ্যোৎস্না-পাণ্ডুর বন ভূমিতে, সে সময়ে

আমি একা! সম্মুখে গণেশরামের মৃত কঙ্কাল! আমার মনে হইতেছিল, যেন আমি চোরাই হীরা হাতে করিয়া, বিশ্বরাজের মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইয়া আছি! হীরার লোভ আমার তখনো যায় নাই দেখিয়া, মৃত কঙ্কাল যেন আমার পানে দৃষ্টিহীন চোখে তাকাইয়া, শব্দহীন নিষ্ঠুর ভাষায়, সমুদয় বিশ্বলোক মুখরিত করিয়া হাসিতেছিল!

চন্দ্র তখনো অস্ত যায় নাই,—কিন্তু হীরার জ্যোতি তখন আমার চোখে সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ হইয়া গেছে! মনে হইল, যুগে যুগে যক্ষের হৃদয়-শোণিত ও দস্যুর অতৃপ্ত লালসায় রঞ্জিত হইয়া, যে হীরা আজ জগতে এত দুর্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে, বাস্তবিক, তার মূল্য, ঐ কঙ্কালের একখানা দগ্ধ-অস্থি অপেক্ষা কোন গুণে অধিক!

বাঁশী তখনো দিগন্তের অদৃশ্য কোণ হইতে অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে বাজিতেছিল! আমার মনে হইতেছিল, এ চরাচর বিশ্ব-জগৎ সেই বাঁশীর সুরে বাঁধা; সে বাঁশীর সুরে তারা ডুবিতে লাগিল, ফুল ফুটিতে লাগিল,—স্বর্গের দেবতা নন্দন ছাড়িয়া আমার হৃদয় রাজ্যে প্রবেশ করিলেন! ম্লান চন্দ্রালোকে, আমার চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল! হায়, ভগবান, জীবনে তুমি সেই প্রথম, আর অশ্রু-বিন্দুও সেই প্রথম! নয়ন-জলের সঙ্গে, বিশ্বের দেবতাকে সর্ব্ব-প্রথম হৃদয়ে পাইয়া, আমার সমুদয় হৃদয়-কুঞ্জ নন্দনের প্রেমের সৌরভে আমোদিত হইল!

আমি আর বিলম্ব না করিয়া, গণেশরামের কঙ্কাল সেই সমাধি-গহ্বরে শায়িত করিয়া, সেই পঁচিশ হাজার টাকা মূল্যের হীরা তৃণবৎ সে গহ্বরে নিক্ষেপ করিলাম। তারপর, যখন সমাধি-গহ্বর মাটি দিয়া

বন্দ করিয়া, নদীর ধারে ঘর্ম্মাক্ত-মস্তকে আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন পূর্ব্বদিক্-প্রান্তে প্রদোষের শুভ্র আলোর রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে!

দান-পত্র।

প্রফুল্ল বাবু শেষে অপ্রস্তুত-ভাবে, শুষ্ক-হাসি হাসিয়া, বলিলেন,—"বেলা, শেষকালে যে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা অমনতর নিষ্ঠুর হয়ে দাঁড়াবে, তা'তো আগে ভাবি নি!"

বেলা খানিকক্ষণ এমনি নিরুপায়ভাবে, বাহিরের সবুজ পাতার কচি ঝালর-দেওয়া দেবদারু গাছটার পানে চাহিয়া থাকিল,—যেন সে চোখ দেখিয়াই ডালে-বসা দয়েল পাখীটা সহসা শিশ্ দেওয়া বন্দ করিয়া দিল!

কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া, বেলা, প্রাণহীন প্রতিধ্বনির মত, উত্তর করিল,—

"আগে যা ভাব্তে পারা যায় না, 'অমনতর অনেক ঘটনাই এ জগতে হামেষা ঘটে আস্চে, কাজেই এতে আশ্চর্য্য হবার যে বেশী কিছু আছে, তা তো আমার মনে হয় না!"

জানালার সাসির ভিতর দিয়া, বৈকালের সোণালি রোদ, বেলার মুক্ত হিল্লোলিত কেশ-গুচ্ছের উপর, একটী স্বচ্ছ আলোর মুকুট পরাইয়া দিয়া, নিঃশব্দে হাসিতেছিল!

বেলার কথার ছন্দে, বেদনার চিরন্তন সুরটাই যেন মর্ম্মরিত হইয়া

উঠিতেছিল। সে যে চাঁদের হাট বসাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল, সে যে শুধুই স্বপ্ন, আর কিছুই নয়,—প্রফুল্ল যেন আজ সেই নিরাশার কথাটাই তাকে বলিতে আসিয়াছে! যে জ্যোৎস্না তাকে এতদিন এমন করিয়া হাসাইয়াছে,সেই কি আজ তাকে কাঁদাইতে আসিয়াছে! বোঁটার ফুলটার মত, বেলার জীবনের পাঁপড়িগুলি, প্রফুল্লের চারিদিকে সুন্দর ভাবে জড়াইয়া গিয়াছিল। বেলার সেই ফুলের-পরশ-মাখা, কোমল প্রাণের সম্পর্কটী ছিন্ন করিয়া দিবার জন্যই কি প্রফুল্লের হৃদয়-বৃন্তে আজ এত শিথিলতার আয়োজন! বেলার হৃদয়টা যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছিল,—হে সুন্দর! তুমি না হয়, ছলনা রূপেই আমার হৃদয়ে দেখা দিয়ো, তোমার ভুবন-ভুলানো রূপ দেখিয়া আমি তোমার নিষ্ঠুর আঘাতও কোনমতে সহ্য করিব! কিন্তু হে সত্য, তুমি তোমার অপ্রিয় নগ্ন-মূর্ত্তিতে আমাকে দেখা দিয়ো না! অসুন্দরকে আমি কেমন করিয়া প্রাণের ভিতর গ্রহণ করিব?

চাঁদনি রাতে, আমাদের এই কর্ম্ম-মুখর বাস্তব জগৎটা যেরূপ অলীক, স্বপ্নের মত ঠেকে, বেলার চোখের সামনে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, উভয়ই তেমনি অত্যন্ত ঝাপসা হইয়া গেল! নিলীমার হৃদয়-ছিন্ন তারাটীর মত, নিয়তি আজ তাকে কোথায় নিঃশেষ করিয়া দিতে চলিয়াছে,—কে জানে! বেলার হৃদয়ে যে ঝড় বহিতেছিল, তার একটা হিল্লোল আসিয়া প্রফুল্লের হৃদয়কেও কোমল আলোড়নে ব্যথিত করিয়া তুলিল। বেলার নয়ন প্রান্তেও অশ্রু, বেদনার কোমল অর্ঘ্য-ভার লইয়া ভরিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে মাটীর পানে তাকাইয়া বলিল,—

"সত্যি কথা বল্‌তে অত লজ্জা কর্‌লে চলবে কেন, প্রফুল্ল বাবু! সে তো কখনো চাপা থাক্‌বার জিনিষ নয়! তুমি খুলে না বল্লেও, আমি সব কথা বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি! তবে কি তুমি আমায় এখ্‌খুনি তোমার বাড়ী থেকে চলে যেতে বল্‌চো?"

বেলার হৃদয়-ভেদী শর প্রফুল্লকে বিদ্ধ করিল। তিনি আঘাতের বেদনা কোনও মতে ঢাকা দিয়া, উৎকণ্ঠিত ব্যস্ততার সহিত, বলিয়া উঠিলেন;—

"চলে যেতে বল্‌চি?—বল কি বেলা! তুমি যদ্দিন খুসী থাক না,—এও তো এক রকম তোমারি বাড়ী!"

বেলা চকিত-ভাবে বলিয়া উঠিল,—

"না,—না প্রফুল্ল বাবু, আর আমার থাকা হচ্চে না! আর আমি কষ্টকে ভয় করি না! কষ্ট সইবার জন্যই তো ভগবান আমায় নারী জন্ম দিয়েচেন!"

প্রফুল্ল বাবুর পাণ্ডুর মুখে হাসির প্রয়াস ব্যর্থ হইল। তবু তিনি বেলাকে প্রবোধ দিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন,—

"ও সব হচ্চে না, বেলা। তোমায় কোথাও যেতে দিচ্চি না আমি! আমি তোমায়—(এই খানে প্রফুল্ল বাবুর হঠাৎ কাশি পাইয়া সারা মুখ লাল হইয়া উঠিল, পরে অনেকটা খাদে নামিয়া, ভাঙ্গা-গলায় বলিলেন)—ঠিক নিজের বোনের মত ভালবাস্‌বো! এই যে তোমায় একরকম গায়ের জোরে বেদখল করে, আমায় মামার সংসারে ঢুক্‌তে হয়েচে, তাই আমার ভাল লাগে নি। তুমি যদি মামার দেওয়া দান-পত্র, কি তাঁর লেখা একটা কিছু দেখাতে পার্‌তে, তবে এ কাজে আমি

কখনো হাত দিতাম না! এখনো তোমায় খানিকটা অংশ লিখে দিতে রাজি ছিলাম, কিন্তু—”

চাকার রবার-টায়ার হইতে ফুস্ করিয়া বাতাসটুকু বাহির হইয়া গেলে, বাইসিকল্ যেমন হঠাৎ থামিয়া পড়ে, তেমনি হঠাৎ একটা প্রবল ‘কিন্তু’র ধাক্কা খাইয়া, প্রফুল্লবাবু কথার মাঝ খানে একবারে চুপ করিয়া গেলেন! তা এই ‘কিন্তু’র গোলযোগটা সংক্ষেপতঃ এই যে, তাঁর ভাবী পত্নী, শ্রীমতী হেনা, বেলাকে অংশ দেওয়ার প্রস্তাবটাকে, একেবারে “সামারিলি ডিস্‌মিশ্” করিয়া দিয়াছে! বেলা অশ্রু-রুদ্ধ গাঢ়-স্বরে বলিল,—

“আপনাদের বিঘ্ন হয়ে, এ বাড়ী আমার কিছুতেই থাকা হচ্চে না। আমি খুব শীগ্‌গীর চলে যাচ্চি, শুধু জিনিষ-পত্তরগুলো গুছিয়ে নিতে যা একটু দেরী। না হয় ইস্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে খাব। এক পেটের জন্য আবার ভাবনা! দিন এক রকমে কেটেই যাবে!”

কথাটা শেষ করিতে না করিতে, বেলা কাঁদিয়া ফেলিল। বেলার সে সময়কার অশ্রু-শিশির-মণ্ডিত আরক্ত মুখখানি, নীহারের চুম্‌কি বসনো, দুটী ভ্রমর-লীন রক্ত-কমলের মত, দেখাইতেছিল!

চোখের জলের পরশ লাগিয়া, প্রফুল্ল বাবুর মনটা আরো নরম হইয়া গেল। তিনি বলিলেন,—

“পাগলামো করো না, লক্ষ্মীটী; এ সংসার তো তোমার আমার দুজনারই!”

প্রফুল্ল বাবুর কণ্ঠস্বরের ভিতর দিয়া যে স্নেহটা ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছিল, তাহাতে তিনি এক রকম ধরা পড়িয়া গেলেন!

মুখ না ফুটিতে মনের কথা ধরিয়া ফেলা ব্যাপারে, মেয়েদের

অশিক্ষিত-পটুত্ব অতি অসাধারণ! এ নূতন আবিষ্কারের আনন্দে বেলার ভিজা মুখখানি আরো বেশী লাল হইয়া উঠিল ;—সে যেন ভিজা স্বর্ণ-চাঁপায় স্নিগ্ধ রক্ত-চন্দনের আভা, অথবা বৃষ্টির পরে ভিজা তরু-লতার উপর অস্তাচলশায়ী সূর্য্যের শেষ রক্তিম চুম্বন!

[২]

কালীপ্রসাদ বাবু কলিকাতায় ওকালতী করিয়া বড় মানুষ হইয়াছিলেন। তিনি কি পরিমাণ নগদ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, বাজারে সে সম্বন্ধে অনেক রূপ রূপ-কথার চলন ছিল।

কালীপ্রসাদ বাবু নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া, তাঁর সমুদয় বিষয় আশয় তাঁর ভাগিনেয় প্রফুল্লকেই দিয়া যাইবেন, এইরূপ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। এত বড় এষ্টেটের যে মালিক হইবে, তার মানুষ হওয়াটাও দরকার বিবেচনা করিয়া, কালীপ্রসাদ বাবু কলিকাতায় সাহেব মাষ্টার রাখিয়া, প্রফুল্লকে পড়াশুনার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বস্তুতঃ, মানুষকে মানুষ করিবার জন্য মানুষে যা করিতে পারে, কালী-প্রসাদ বাবু তার কিছুই বাকি রাখেন নাই!

প্রফুল্ল যখন কলিকাতায়, তখন কালীপ্রসাদ বাবুর বিপত্নীক বন্ধু রামকমলের সহসা মৃত্যু হয়। তিনি একটী শিশু-কন্যা রাখিয়া যান,—পৃথিবীতে আপন বলিতে তার আর কেউ ছিল না। বন্ধু-শোকের ভিতরেও, নিঃসন্তান কালীপ্রসাদের হৃদয় অপত্য-স্নেহে ভরিয়া উঠিল। তিনি রামকমলের শিশু-কন্যাকে বুকে করিয়া, নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন,—সেই শিশু-কন্যাই বেলা!

প্রফুল্ল যখন কলিকাতায়, তখন বৃদ্ধ কালীপ্রসাদ, এই বেলার

উপরই তাঁর হৃদয়ের সমুদয় রুদ্ধ-স্নেহ উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া, তাঁর বালুকাপূর্ণ প্রাণ সরস করিয়া তুলিলেন।

বেলাকে তিনি বাড়ীতে মেম রাখিয়া, অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিয়াছেন। বেলা দেখিতে দেখিতে, পল্লব-পুষ্ট পুষ্প-প্রচুর বসন্তের ফুল-গাছটীর মত, সুন্দর হইয়া উঠিল! কালীপ্রসাদ বাবু এখন বেলাকে প্রফুল্লের হাতে সমর্পণ করিয়া যাইতে পারিলেই, তাঁর জীবনের একটা প্রধান কর্ত্তব্য পালন করা হইল বলিয়া মনে করিতেন।

এইখানে প্রজাপতি-ঠাকুর গোল বাধাইয়া দিলেন। প্রফুল্ল তখন হেনার প্রেমে মুগ্ধ,—হেনার গন্ধেই ভরপুর! তাই কালীপ্রসাদ বাবু যখন বেলার সঙ্গে প্রফুল্লের শুভ-বিবাহের দিন ঠিক করিয়া প্রফুল্লকে জানাইলেন, তখন সে প্রজাপতির সকল প্রকার নির্ব্বন্ধ অগ্রাহ্য করিয়া, কালীপ্রসাদ বাবুকে স্পষ্টাস্পষ্টি জানাইয়া দিল, হেনাকে সে ভালবাসিয়াছে,—হেনাকেই বিবাহ করিবে। হেনাকে ভালবাসিয়া, বেলাকে বিবাহ করা, তার মত শিক্ষিত লোকের পক্ষে অত্যন্ত হাস্য-জনক!

এই ব্যাপার লইয়াই প্রফুল্লের সঙ্গে কালীপ্রসাদ বাবুর চির-বিচ্ছেদ ঘটে। কালীপ্রসাদ বাবু বলিলেন,—"কেন, রূপে গুণে শিক্ষায় দিক্ষায় বেলা কম কিসে? আমি তো তাকে প্রফুল্লের যোগ্য করেই গড়ে তুলেচি!" প্রফুল্লের তরফ হইতে বলা হইল, "মনের মানুষ হয় যে জনা, নয়নে তার যায় গো চেনা!" বেলার চোখে মনের মানুষের সে নিশানা কৈ? এরূপ বাজে-মার্কা মানুষ নিয়ে ঘর করা প্রফুল্লের পক্ষে অসম্ভব! বিশেষ, এসব ব্যাপারে বাপ-মারও antocracy খাটে না,—অন্যের

তো কথাই নাই! কালীপ্রসাদ বাবু বলিয়া পাঠাইলেন,—"তবে আর আমার বিষয়ে তোমার কোন দাবী-দাওয়া থাকিল না!" প্রেম-মুগ্ধ প্রফুল্ল বলিল,—"তথাস্তু!"

কালীপ্রসাদ বাবু সাশ্রু-নয়নে বেলার কাছে আসিয়া বলিলেন,—"মা, আমার যা বিষয়-আশয় আছে, সব তোমায় লিখে দিয়ে গেলাম। দান-পত্র লেখা হয়েচে, সময় মত রেজেষ্টরী করে দিয়ে যাবো!" বেলা কাঁদিয়া বলিল,—"আমি বিষয় চাই না বাবা, তুমি প্রফুল্লবাবুকে বঞ্চিত করো না!"

বুড়া ভাবিলেন, ছুঁড়ীটা শেষকালে আবার একি পাগলামো জুড়িয়া দিল! বুড়ারা স্ফুটোন্মুখ তরুণ হৃদয়ের সে রহস্যের কথা কি বুঝিবে!

এদিকে, কালীপ্রসাদ বাবুর সঙ্গে যে তার বিরোধ ঘটিয়াছে, সে কথাটা প্রফুল্ল তার প্রেম-জগতে প্রকাশ করিল না। সে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের জগতে দুঃস্বপ্নের স্থান নাই! প্রফুল্লের সঙ্গে হেনার বিবাহ যখন একরকম ঠিকঠাক্, এমন সময় ভগ্ন-হৃদয় কালীপ্রসাদ, দ্বন্দ্ব ও দুঃখের জটিলতার ঊর্দ্ধে, এক চির-শান্তি-বিরাজিত গভীর নিদ্রার অতল-গর্ভ রাজ্যে, প্রবেশ করিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর, আইন ব্যবসায়ী-দের বুদ্ধির সহায়তা লাভ করিয়া, কালীপ্রসাদের ত্যজ্য সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার-সূত্রে দখল লইবার জন্য, প্রফুল্ল রণবেশে কালীপ্রসাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিল!

প্রফুল্ল যখন বেলার পক্ষ হইতে একটা বিদ্রোহ-সূচক প্রবল বাধার আশঙ্কা করিতে ছিলেন, তখন বেলা হাসি মুখে, প্রফুল্লেরে পথ ছাড়িয়া

দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। সহসা প্রফুল্লের চোখে, বেলার আত্ম-বিসর্জ্জ-নের মহিমা, অস্তগামী সূর্য্যের বিচিত্র রশ্মি-ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। প্রফুল্লের হৃদয় স্বভাবতই বেলার দিকে শ্রদ্ধার সহিত নত হইয়া পড়িল। কিন্তু তখনই আবার তাঁর মনে পড়িয়া গেল, যেন তিনি হেনার উপর অবিচার করিতেছেন। তারি মূল ধন ভাঙ্গিয়া, যেন তিনি আজ চুরি করিয়া, আর কাহাকেও ঘুষ দিতে আসিয়াছেন! তাই হঠাৎ শক্ত হইয়া উঠিয়া প্রফুল্ল বলিলেন,—

"তুমি যদি হেনার সঙ্গে এ বাড়ীতে থাক, হেনা তা' হলে কত খুসী হবে!"

প্রফুল্লের কথা শুনিয়া, বেলার মুখখানা প্রভাতের চাঁদের মত অত্যন্ত নিষ্প্রভ হইয়া গেল! সে চুপ করিয়া থাকিল।

প্রফুল্ল তখন সোজাসুজি কথাটা বলিয়া ফেলিলেন,—

"দেখ বেলা, হেনার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক্‌ঠাক্ হয়ে গেছে! বিয়ের পর, তুমি যদ্দিন খুসী এ বাড়ীতে থাক্‌তে পারো। তবে এ সম্বন্ধে হেনার কি মত, তাই বুঝে আমায় সব ব্যবস্থা কত্তে হচ্চে!"

বেলা মাথা নীচু করিয়া, মাটীর পানে তাকাইয়া বলিল,—
"নিশ্চয়! তুমি ঠিক বলেচ—আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি!"

[৩]

হেনার সহিত প্রফুল্লের বিবাহ হওয়ার পর, বেলাকে প্রফুল্লদের বাড়ীতে রাখা যাইতে পারে কিনা, প্রফুল্ল সে সম্বন্ধে হেনার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। হেনা সংক্ষেপে 'রায়' দিয়া বলিল;—"কেন, অনাথ-আশ্রমে তার একটা বন্দোবস্ত করে দিলে হয় না?" প্রফুল্ল বাবু

নিতান্ত ভীরু ও লাজুক প্রকৃতির লোক, কেলেঙ্কারির ভয়ে ততদূর যাইতে রাজি হইলেন না !

বেলাকে প্রফুল্লের বাড়ীতে থাকিতে যায়গা দেওয়া যাইতে পারে কিনা, সেইটা স্থির করিবার পূর্ব্বে, হেনা, প্রফুল্ল বাবুর একান্ত অনুরোধে, বেলাকে একবার দেখিতে আসিয়াছে। কিন্তু সে কেবল মন-রাখা গোছের দেখা ! 'রায়' যখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তখন স্থানীয় তদন্তের আর বড় একটা আবশ্যক ছিল না !

আলুলায়িত-কুন্তলা বনদেবীর মত, যখন বেলা সৌন্দর্য্য বৃষ্টি করিতে করিতে, হেনার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন পরণের অত্যন্ত জমকালো পোষাকের ভিতরেও হেনা সহসা ম্লান হইয়া গেল। তার মন অত্যন্ত শক্ত হইয়া উঠিল ; সে চোখের পলকে স্থির করিল,* কখনো তার ও প্রফুল্লের মাঝখানে এমন সুন্দর প্রতিদ্বন্দ্বীকে স্থান দিয়া, প্রফুল্লের হৃদয়ে নিজের প্রভুত্বের গাঁথুনি, সে এমন কাঁচা করিয়া উঠাইতে দিতে পারে না ! তবু সভ্যতার অনুরোধে ও ভদ্রতার খাতিরে, হেনা কথাটা যথাসাধ্য মেলোয়েম করিয়াই বলিল,—

"তোমার খুব ভাগ্যি যা হোক, বেলা ! মিসেস্ রায় একটী শিক্ষয়িত্রী চাচ্ছেন—তাঁর মেয়েদের পড়াতে। তাঁদের বাড়ীতেই থাক্‌তে পাবে। তার উপরে মাইনে মাসিক ২০৲ টাকা !"

হেনার কথার মানেটা বুঝিতে বেলার বেশী দেরী হইল না। লাজে, অপমানে, ধিক্কারে, বেলার মুখখানা রাঙ্গা ডালিয়া ফুলটীর মত একেবারে লাল টক্‌টকে হইয়া উঠিল। তবু মনের ভাবটা চাপা দিয়া, কতকটা ন্যাকার মত, জিজ্ঞাসা করিল,—

"কার কথা বল্‌চ ভাই হেনা ?"

হেনা এবার কণ্ঠে আরো খানিকটা তিক্ততা মিশাইয়া বলিল ;—

"আর কার কথা হবে বেলা ! এ বাড়ীতে যে তোমার আর বেশীক্ষণ থাকা ভাল দেখায় না ! তোমার পক্ষেও দৃষ্টি-কটু, প্রফুল্লবাবুর পক্ষেও লজ্জার কথা !"

হেনা এমনি ঝঙ্কার দিয়া কথাটা বলিল, যেন বিবাহের পূর্ব্বেই, হেনা প্রফুল্লের সমুদয় বিষয়-আশয়ের উপর, তার নিজের "সর্ব্ব-সত্ব-রক্ষিত" ছাপটী মারিয়া রাখিয়াছে ! রাগে যেন বেলার মাথার ভিতর বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতে লাগিল। কিন্তু বেলা অত্যন্ত রাগের সময়ও হাসিতে পারিত। তাই হেনার কথার ঝাঁজ অম্লান বদনে সহ্য করিয়া, একটু হাসিয়াই বেলা উত্তর করিল,—

"না ভাই, আমার আর এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার দরকার হবে না। কালীপ্রসাদ বাবু তাঁর সব বিষয়-আশয় আমায় দান করে গেছেন। সে উইলখানা পাওয়া গেছে।"

হেনার মুখখানা বরফের মত সাদা হইয়া গেল। সে কথাটার উপর খুব ঝোঁক দিয়া বলিল ;—

"মিছে কথা !"

বেলা রাজহংসীর মত, লীলাভরে গ্রীবা বাঁকাইয়া, হাসি-মুখে উত্তর করিল,—

"মিছে কথা ? এই দেখ না সে দান-পত্র !"

এই বলিয়া, বেলা কাপড়ের আঁচল হইতে বাহির করিয়া, সেই দান-পত্রখানা হেনার হাতের উপর ফেলিয়া দিল। কিন্তু আজ হেনাকে

এমন করিয়া জব্দ করিয়া, বেলা বিজয়ী সেনাপতির মত, এতটা আত্ম-গৌরব বোধ করিল কেন, সেটা সে নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না!

হেনা রাগ করিয়া চলিয়া গেলে, বেলার মনে হইল, সে এমন হঠাৎ আত্ম-বিস্মৃত হইয়া কাজটা ভাল করে নাই। হেনা তার ক্ষত হৃদয়ে এমন করিয়া খোঁচা না দিলে, সে হেনাকে কখনো এমন নিষ্ঠুর ভাবে জব্দ করিয়া দিত না। সে অনুতপ্ত-চিত্তে ভাবিতে লাগিল, হেনা যদি এখন বাঁকিয়া বসে, আর প্রফুল্লকে বিবাহ করিতে না চায়, তবে যে তার প্রফুল্লই অসুখী হইবে! বেলাকে লইয়া তো প্রফুল্ল কখনো সুখী হইবে না! বেলা খানিকক্ষণ আকাশে থরে-থরে-সাজানো সন্ধ্যার রঙীণ মেঘ-মালার পানে চাহিয়া থাকিয়া, একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"আর কেন, তবে আর কেন!"

দীর্ঘ নিশ্বাসের বেদনা মাখা ঐ কথা দুটী বলিয়া, বেলা ধীরে ধীরে উঠিল। একবার খোলা জানালার কাছে গিয়া, আঁচল দিয়া, ছল্ ছল্ চোখ দুটী ভাল করিয়া মুছিয়া লইল। তার পর তার যথা-সর্ব্বস্ব, যাহার জন্য সে হেনার কাছে এইমাত্র এত আস্ফালন করিতেছিল, সেই দান-পত্রখানা, জ্বলন্ত উনুনে নিক্ষেপ করিল! প্রথম একটু কাগজ-পোড়া গন্ধ, তার পর খানিকটা ধোঁয়া, তার পর, গোটা দান-পত্রখানা একবার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া, মুহূর্ত্তের মধ্যে ছাই হইয়া গেল!

দলিল খানা পুড়িয়া ফেলিয়া, বেলা প্রফুল্ল বাবুকে চিঠি লিখিতে বসিল। বেলার বিনা অনুমতিতেই তার চিঠিখানা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম;—

"প্রফুল্ল বাবু,

আমি যে আপনার ভাবী স্ত্রীকে বলেচি দান-পত্র পাওয়া গিয়েচে, সেটা আগাগোড়া মিথ্যা কথা! আমার পক্ষে তাঁকে এরূপ বানানো মিছে কথা বলা ভয়ানক অনুচিত হয়েছে। আশা করি, আপনারা দুজনেই আমাকে মাপ্ কর্‌বেন।

আমি ভেবে চিন্তে স্থির করেচি, এক সপ্তাহের ভিতর আমি আপনাদের সংসার ছেড়ে চলে যাব। আপনাদের কাছে শুধু সাতটা দিনের সময় ভিক্ষা চাই। এর মধ্যে আমার জিনিষ-পত্তর গুছিয়ে নিতে পার্‌বো। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আপনাদের ভবিষ্যৎ সুখময় ও নিষ্কণ্টক হোক!"

লেখা শেষ হইলে, চিঠিখানা পড়িবার সময়, বেলা একেবারে শিহরিয়া উঠিল। সে চিঠির মর্ম্ম কি ভয়ানক! সে কি লিখিতে কি লিখিয়াছে! মুক্ত আকাশ-তল ভিন্ন, এ পৃথিবীতে এখন আর তার যাইবার স্থান রহিল কোথায়? বেলার চোখে জল আসিল। তবু সে জোর করিয়া, চোখের জল মুছিয়া লইয়া ভাবিল,—আমি যাকে ভাল-বাসি, তাকে সুখী করিবার জন্য, আমি তো করিবার কিছু বাকী রাখি নাই;—সেই তো আমার সুখ!

[৪]

"বেলা—"

বেলা পিছন ফিরিয়া দেখিল,—প্রফুল্ল! প্রফুল্লকে দেখিয়া বেলা লাজে কুণ্ঠায়, লজ্জাবতী লতাটীর মত, অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। ভাবিল, কি লজ্জার কথা! তবে কি প্রফুল্ল বাবু আজ চুরি করিয়া,

তার অন্তরের গোপন কথাটী শুনিয়া ফেলিয়াছেন? ভাবিতে ভাবিতে বেলার মুখখানা লজ্জায়, লাল গোলাপ ফুলটীর মত, লাল হইয়া উঠিল! দুঃখের ছায়ার উপর লাজের লাল আভা পড়িয়া, বেলার মুখখানি তখন সূর্য্যাস্তের আলো-মাখা সদ্য-বৃষ্টি-ধৌত বনানীর মত, অত্যন্ত সুন্দর দেখাইতেছিল!

বেলার চোখে চোখ পড়িতেই, প্রফুল্ল বাবু শুষ্ক মুখে একটু হাসির রেখা টানিয়া বলিলেন,—

"তোমার দান-পত্রখানা, আমায় একবারটী দেখাতে পার, বেলা?"

বেলা বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে, রুদ্ধ-কণ্ঠে জবাব করিল,—

"দান পত্তর কৈ না—আমি তো পাই নি!"

বেলা যে ইচ্ছা করিয়াই মিথ্যা কথা বলিল, সে কথা পাঠক-পাঠিকাদিগকে বলিয়া দেওয়া অনাবশ্যক। কিন্তু মিথ্যা কথা বলায় বেলা ততদূর পারদর্শী হইয়া উঠে নাই। তাই মিছে কথাটা মুখে আনিতে কেমন একটা কুণ্ঠা বোধ হইতে ছিল।

প্রফুল্ল, বেলার কথা শুনিয়া, একটু অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তবে যে তুমি হেনাকে বল্লে, তুমি দান-পত্তর পেয়েছ?"

বেলা একেবারে সাদা হইয়া উঠিয়া, কম্পিত-স্বরে উত্তর করিল,—

"মিছে কথা বলেচি!"

প্রফুল্ল আরো বিস্মিত হইয়া, কতকটা জেরার সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তবে তুমি হেনাকে দান-পত্তর দেখালে কি করে?"

বেলা আর স্থির ভাবে প্রফুল্লের জেরার গোলা-বৃষ্টি সহ্য করিতে পারিতেছিল না।

সে অধীর ভাবে, ছল্ ছল্ চোখে বলিয়া উঠিল,—

"মিছে কথা, প্রফুল্ল বাবু—মিছে কথা! আমি কোন দান-পত্তর পাইনি! হেনাকে আমি জাল উইল দেখিয়েচি বৈ তো নয়! আমার কাছে কোন দান-পত্তর নেই—হেনাকে ওরূপ কথা বলা আমার ভারি অন্যায় হয়েচে। বল্‌বার কোন কারণও ছিলনা! তুমি তোমার বিষয়-আসয় বুঝ্-সুঝ্ করে নাও,—ওতে আমার কোন অধিকার নাই!"

বেলার কথাগুলির ভিতর দিয়া যে ভাবে তার চিত্ত-চাঞ্চল্য ও হৃদয়ের আবেগ ফুটিয়া উঠিল, তাহাতেই তার সাফাইটা পুরাপুরি বাতিল হইয়া গেল! বেলা হঠাৎ সাফাই করিতে গিয়াই, আজ এমন নাকাল ভাবে ধরা পড়িয়া গেল! প্রফুল্ল বাবু, আজ তার হৃদয়-দুর্গের অতি দুর্গম স্থানটী, অতি অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। নচেৎ, মেয়েরা নিজেদের মনোমত সাফাই গড়িতে, খাঁটী কারিকরদের চাইতে কোন অংশে খাটো নয়!

প্রফুল্ল বেলার সাফাই শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তিনি যেন একেবারে স্বচ্ছ-হাসির ফোয়ারা! কারণ, বেলার সাফাইটার মধ্যেই আজ প্রফুল্লের অপ্রত্যাশিত রণ-জয়ের নিবিড় আনন্দ নিহিত ছিল। এখন প্রফুল্লের হাসির ঝঙ্কারে, সে আনন্দ, রৌদ্র-কিরণে উৎক্ষিপ্ত হীরক-মুষ্টির মত, তাঁর চারিদিকে স্বচ্ছ ঔজ্জ্বল্যের তরঙ্গ তুলিয়া, ঠিক্‌রাইয়া পড়িল! প্রফুল্ল বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"জান বেলা, তোমার নিকট থেকে সে দান-পত্তরটা দেখে গিয়ে, হেনা আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেচে ?"

বেলা নীরবে তার নীলাভ চোখ দুটী স্নেহ ও বেদনায়, ঔৎসুক্যে ও বিস্ময়ে পূর্ণ করিয়া, প্রফুল্লের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। প্রফুল্ল তার হাতে একখানা চিঠি দিলেন। বেলা ছিন্ন সবুজ খামের ভিতর হইতে চিঠি খানা বাহির করিয়া পড়িয়া দেখিল, তাহাতে এইরূপ লেখা আছে,—

"প্রফুল্লবাবু, তুমি আর কালীপ্রসাদ বাবুর উত্তরাধীকারী নও,—বিষয় সব বেলার। বেলাকেই তিনি সব দান করে গেছেন। সে দান-পত্র আজ আমি স্বচক্ষে বেলার কাছে দেখে এসেচি! আর এতদিন তুমি আমায় বলে আস্‌চিলে, তুমিই কালীপ্রসাদ বাবুর উত্তরাধিকারী, বেলা কেউ নয়! ভালবাসার মাঝেও এতবড় চালাকি, এতটা ডেপ্লোমেসির স্থান আছে? ঠিক জেনো, যে পথের ভিখারী, হেনাকে বিবাহ করার আশা,—তার পক্ষে দুঃস্বপ্ন মাত্র! চোখ মুছে ফেল, স্বপ্ন ভেঙ্গে যাক!"

হেনার চিঠি পড়িয়া বেলার মনে হইল, হেনা আজ যেন সমুদয় নারী-জাতিকে পুরুষের সম্মুখে ছোট করিয়া দিল। দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ করিয়া ভালবাসা স্ত্রীজাতির কখনো শোভা পায় না। নারীর ভালবাসা যে ত্যাগের অচল-শিখরে দাঁড়াইয়াই মুগ্ধ জগতের নিকট চিরকাল প্রীতি ও শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি পাইয়া আসিয়াছে! হেনা যেন আজ নারীজাতির সেই ত্যাগের মহিমা খর্ব্ব করিয়া দিল! বেলা যখন এইরূপ ভাবিতেছিল, তখন প্রফুল্ল ম্লান-হাসি হাসিয়া বলিলেন ;—

"হেনা, দেখতে পাচ্ছি, ভালবাস্‌তো মামার বিষয় সম্পত্তিকে, আমাকে নয়!"

বেলা একটু হাসিয়া, একটু কাশিয়া, কিছু ভীত-স্বরে, কিছু ব্যঙ্গের সহিত উত্তর দিল,—

"তুমি হেনাকে বলো, সে দান পত্তরের বালাই এখন চুকে গেছে! একথা শুন্‌লে, হয়তঃ হেনা আবার তোমাকে বে করতে রাজিও হতে পারে!"

বেলার কথা ক'টীর ভিতরে, অনেক তারে অনেক ভাবের মিহি-সুর কাঁপিতে থাকিলেও, তৃষিতা চাতকিনীর বেদনাপ্লুত নিরাশার রাগিণীটাই যেন বেশ সুস্পষ্ট হইয়া বাজিয়া উঠিতেছিল। প্রফুল্লের হৃদয়াকাশ, তখন প্রেমের জলদ-জালে মোহন নীলকান্তরূপ ধারণ করিয়া, তৃষিতা চাতকিনীর উৎক্ষিপ্ত চঞ্চুপুটের দিকে, আপনি নত হইয়া পড়িল! তিনি আবেগপূর্ণ মধুর-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—

"না না বেলা, আর আমায় ভুল বুঝো না, আমাকেও আর ভুল বুঝ্‌তে দিয়ো না! একটা মস্ত ভুল প্রায় করে বসেছিলাম আর কি! এক জীবন ধরে অশ্রুপাত করলেও হয়তঃ সে ভুল আর শোধ্‌রাত না! যিনি দুনিয়ার হাসি-অশ্রুর সৃজন কর্ত্তা,—আজ তিনি বড় দয়া করে, আমায় সময় থাক্‌তে, কাচ ও কাঞ্চনের ভেদ বুঝিয়ে দিয়েছেন! বেল-ফুলই আমার কণ্ঠের হার,—হেনার ঝাঁজালো গন্ধ আমার সইবে কেন? যাক্, সে সব পরের কথা,—এখন আমায় ঠিক করে বল দেখি, লক্ষ্মীটি! দান-পত্রখানা কোথায় রেখেচো?"

বেলা প্রচুর শিশির-পাতে হেলানো, নব-মল্লিকাটীর মত, মাটির

পানে তাকাইয়া, আরক্ত মুখ নীচু করিয়া, নিজকে নিজে তার ইহ-কালের পরকালের, চিরকালের হৃদয়-দেবতার নিকট সম্পূর্ণভাবে ধরা দিয়া, বীণা-নিন্দিত মধুর কণ্ঠে, উত্তর করিল,—

"সে দান-পত্তর যে হেনার ও তোমায় মিলনের পথ বন্দ করে দাঁড়িয়ে ছিল,—তাই আমি তাকে পুড়িয়ে ফেলেচি!"

প্রফুল্ল প্রতিধ্বনির মত বলিয়া উঠিলেন,—

"পুড়িয়ে ফেলেচ ?"

বেলা কথা কহিল না।

প্রফুল্ল অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন! বিস্ময় ও স্বপ্নে চোখ দুটী মদির করিয়া লইয়া, প্রফুল্ল চাহিয়া দেখিলেন,—সম্মুখে তরুলতা-ঘেরা জ্যোৎস্না-বিহ্বল এক বিচিত্র জগৎ,—সে জগতময় স্বপ্নের স্বর্ণরেণু ছড়াইয়া দিয়া, সুন্দর নিশীথের নীলিমায় তারার দীপালি জ্বালাইয়া দিয়া, এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের দেবতা নারীবেশে তাঁর অন্তর বাহির পূর্ণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে! চাহিয়া চাহিয়া মনে হইল, বেলা তো মানুষ নয়, যেন বিসর্জ্জনের প্রতিমাখানি! নিঃস্বার্থ ভালবাসার লাবণ্য-মাখা, ত্যাগের মহিমায় সুন্দর, বেলার চাঁদ-পান। মুখ খানার পানে তাকাইয়া থাকিয়া, প্রফুল্ল কি করিতেছিলেন, কি বলিতে আসিয়াছিলেন, কোথায় আসিয়াছেন, কেন আসিয়াছিলেন,—সে সব কথা ভুলিয়া গেলেন। হৃদয়, যখন কুলে কুলে ভরিয়া উঠে, তখন মানুষের মুখে আর কথা ফুটে না! তাই সে সময় প্রফুল্লের মুখে কথা ছিল না। কেবল নীরবে তাঁর হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার অমৃত-পাত্র ভরিয়া উঠিতেছিল!

সে সুন্দর অমৃতক্ষণে, আকাশ হইতে ভূতলে পুষ্প-বৃষ্টি হইল না বটে, কিন্তু নীল আকাশ ভরিয়া তারকার স্বর্ণ-বৃষ্টি হইয়া গেল! শুক্লা-নবমীর ক্ষণোজ্জ্বল চন্দ্র-লেখা, বঙ্কিম প্রেমের ছন্দে নীলাকাশে হেলিয়া পড়িয়া, সে মুগ্ধ প্রেমিক যুগলকে উঁকি মারিয়া দেখিয়া দেখিয়া, মুখ টিপিয়া হাসিতেছিল! সে হাসির মায়া-জালে; আমাদের আলো-ছায়া মাখা পৃথিবী যেন ছবি,—আর নক্ষত্র-মালিনী নিশি যেন স্বপ্ন হইয়া গিয়াছিল!

বাহিরের সবুজ দেবদারু গাছটা আজ সোণালি চাঁদনির পোযাক পরিয়া, নন্দনের স্বর্ণ পারিজাত বৃক্ষের মত, মৃদু দক্ষিণ বাতাসে মর্ম্মরিয়া শিহরিয়া উঠিতেছিল! আর তার জ্যোৎস্নান্বিত নিবিড় পত্রান্তর হইতে, একটী নিদ্রাহীন সুকণ্ঠ পাপিয়া, কোন পুরাকালের এক পারস্য রাজকুমারীর প্রেম-কাহিনী-সম্বলিত একটী সুখ-দুঃখ-মাখা গজল্ গাহিয়া, যেন সেই প্রেম-মুগ্ধ নব-দম্পতীকে নক্ষত্র-খচিত ছায়াপথে, এক জ্যোৎস্না-মেদুর বিচিত্র জগতের বিহ্বল আনন্দের, মাঝে বরণ করিয়া লইতেছিল!

ষড়যন্ত্র।

নিখিলরঞ্জন বাবু নিজের চোখের জ্যোতি গুরু-দক্ষিণা স্বরূপ দান করিয়া, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন। কলেজের রসায়নাগারের রঙ্গ-বেরঙ্গের শিশি ও নলের মধ্যে যত দিন তাঁহার সংসারখানি সীমাবদ্ধ ছিল, ততদিন বিলাত যাইয়া আই, সি, এস, হইয়া আসিবেন, এই ভাবের নেশাতেই তিনি বিভোর ছিলেন। তজ্জন্য বহু পূর্ব্ব হইতেই, খাঁটী বাঙ্গালী সিভিলিয়ান-দিগের আদব কায়দার সঙ্গে মিল রাখিয়া, নিখিল নিজের জীবনের সুর বাঁধিয়া লইয়াছিলেন, কারণ যদি পিছে লব্ধ সিভিলিয়ানত্ব আপন পূর্ব্ব-গঠিত চরিত্রের সঙ্গে খাপ না খায়! সময়ে অসময়ে একটা সচেতন কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা, মুখে চোখে একটা তেজস্কর ব্যস্ততার ভাব, বেশভূষার নিখুঁত পারিপাট্য, টনটনে এটিকেট জ্ঞান দেখিয়া সকলে মনে করিত, তাঁহার ভাবী সিভিলিয়ানত্ব অতি অকালেই অপরিণত ডিম্ব প্রসব করিয়া ফেলিয়াছে!

কিন্তু যখন বিদ্যুৎ-শোভিত ক্ষুদ্র লেবরেটরী গৃহ, তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দলিলখানা হাতে দিয়া, এক ধাক্কায় সংসারের মাঝখানে ফেলিয়া দিল, তখন নিখিলবাবু চমকিত হইয়া দেখিলেন যে, তফাৎ হইতে দুনিয়াটা যেরূপ বিল্‌কুল্‌ সবুজ দেখায়, কাছে আসিলে দেখা যায়, সে ঠিক তেমনটি নয়! মোট কথা, বিলাত তো যাওয়া হইলই না, প্রভিন্সিয়াল সিভিল-সার্ব্বিসে নমিনেসন পাইতেই যে প্রকার ঘুর্‌পাক্‌ খাইতে হইয়াছিল, তাহার ফলেই, মাথার চুলের ভিতরে, পদ্মার চড়ার ন্যায়, একখানি ইন্দ্র-লুপ্ত দেখা দিয়াছে!

সে যাহা হউক, আমরা যখনকার কথা বলিতেছি, তাহার কিছু পূর্ব্বেই, নিখিলবাবু "সাব-প্রো-টেম" ভাবে, মোক্তার-সঙ্কুল ডেপুটীর জীবনে পদার্পণ করিয়াছেন। এই সমুদয় দৈব-দুর্ব্বিপাকের মধ্যে পড়িয়া, তিনি জীবনের উচ্চ আদর্শ টা খানিকটা কাটিয়া ছাঁটিয়া খাটো করিয়া লইয়াছেন বটে; কিন্তু তবুও সাবেক চাল-চলন যথা-সম্ভব বহাল রাখিয়াছেন। যেহেতু, লোকে কথায় বলে মরা হাতী লাখ্ টাকা!

নিখিল বাবুর কি বিবাহ হইয়াছে?—ইহার উত্তরে হাঁ, না, দুই কথা বলাই চলে। তা আসল কথাটা এই;—কুলীনের ছেলে এবং গরীবের ছেলে বলিতে যে একটি অভিন্ন মৌলিক পদার্থ সূচিত হয়, নিখিলরঞ্জন তাহাই! এমন অবস্থায়, নিখিলের পিতা, নিখিলের জন্য একটী বধূ আনিবার উপলক্ষ্য করিয়া, যদি রাতারাতি বড় মানুষ হওয়ার অতি সহজ মুষ্টি-যোগটি প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তবে সমাজ-সংস্কারক যাহাই বলুন না কেন, মনোবিজ্ঞানবিৎ তাঁহার এ অপরাধটিকে খুব গুরুতর বলিয়া কখনই মনে করেন না।

বরের পিতার মনের ভাব যখন এইরূপ সঙ্গীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন জমি, বাড়ী, গৃহিনীর গহনা পত্র এবং মায় ইনসিওর পলিসি শুদ্ধ বন্ধক দিয়া হইলেও, মেয়েটিকে কুলীন পাত্রে সমর্পণ করিবার অভিলাষী কন্যার পিতার কোনও অভাব এদেশে আজও দুর্ভাগ্যবশতঃ দেখা যায় না। নিখিলকে বিবাহের বাজারে নীলামে তুলিতেই, চারি দিক হইতে খরিদ্দারেরা জড় হইয়া, বরের দাম বাড়াইতে লাগিলেন। শেষকালে যখন অমূল্যচরণ যৌতুক ও গহনা বাদে নগদ সাড়ে চারি হাজার হাঁকিলেন, তখন যাহাদের পুঁটি মাছের প্রাণ, তাহারা রণে

ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। সুতরাং অমূল্যচরণের নীলাম-ডাকই মঞ্জুর হইয়া গেল।

যথা সময়ে, বীণার সঙ্গে নিখিলের শাস্ত্র-মত শুভ-বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু বীণার পিতা অমূল্যচরণকে অচিরে তমঃসুকের শর-শয্যায় শয়ন করিতে হইল। সে সময় নিখিল সবে বৃত্তি পাইয়া কলেজে ঢুকিয়াছেন—জীবন-পথ ইন্দ্রচাপের বর্ণ-মাধুর্য্যে রঞ্জিত। কিন্তু এই খানেই গোলযোগ ঘটিল। নিখিলের বিদ্রোহী চিত্ত নীলামে ক্রীত ন্যায্য সম্পত্তি হইয়াও, তাহার বালিকা খরিদদারটির অধিকারের সত্ত্ব একেবারে অস্বীকার করিয়া বসিল।

কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, নিখিল বীণাকে জবরদস্তি করিয়া, তাকে তার আইন-সঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলেন, অথচ মনে মনে ভাবিলেন, বীণাই তাঁকে জন্মের মত ঠকাইল! তাঁর নিজের ভগ্ন-হৃদয়ের জন্য তাই দোষী সাব্যস্ত করিলেন—বীণাকেই। পুরুষদের সব রকম বেয়াইনি কারবারে একচেটে অধিকার যে আর বেশী দিন টেকেঁ না,—তার হাতে হাতে প্রমাণ,—নব্য-বাংলার জেনানা-মহালে তরুণ সাফ্রিগিষ্ট্ ভাবের প্রভাব!

নিখিল ভগ্ন-হৃদয় লইয়া চিন্তা করিলেন, জীবনের এক পারে জন্ম, অপর পারে মৃত্যু,—এ দুয়ের মধ্যস্থলে বিবাহের প্রেমময় মণিপীঠ! পূর্ব্বরাগ কিংবা প্রণয় যে বিবাহের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিল না, সে বিবাহ আবার বিবাহ? এ ক্ষেত্রে আবান্তরের যোগাড় হইয়াছে যথেষ্ঠ, অথচ আসল জিনিষটার কোন বন্দোবস্ত নাই!

বীণা দশম বর্ষের বালিকা, সামান্য একটু বাংলা শিখিয়াছে মাত্র।

নিখিল যে স্কটের কাব্য পড়েন, ডাক্তার মুখার্জ্জির কঠিন কনিক্‌সেক্‌সন্‌ মুখস্থ করেন, বীণা তাহার কি বুঝিবে? সকলে বলে, বয়স-কালে বীণা রূপসী হইবে, কিন্তু তাহাতেও নিখিলের বিমুখ চিত্ত আগ্রহ-সহকারে সায় দিল না; কারণ, তিনি তো শুধু চর্ম্মের স্বচ্ছতার উপাসক নহেন, তিনি যে অন্তরের ঐশ্বর্য্যের বণিক! কাজে কাজেই, এ ক্ষেত্রে বর্ত্তমান উত্তেজনাহীন, ভবিষ্যৎ ততোধিক অবসাদপূর্ণ,—এবং বিবাহটা একটা প্রকাণ্ড ভুল! বাসি-বিবাহের পরের দিন, নিখিল গোপনে তাহার সিরাজগঞ্জস্থিত শৈশব-বন্ধুর নিকট যে পত্র লিখিল, তাহার এক অংশ উদ্ধৃত করিতেছি;—"পরশুরাত, এমনতর একটা ঘটনা ঘটেচে, যা হতে আমার জন্য একটা জীবনব্যাপী প্রহসনের সূত্রপাত হল। সকলে বলে, এরি নাম নাকি বিবাহ! ভালবাসার ঘরে আমার ভাগে বিশ্বকর্ম্মা যদি শূন্য রেখে দিয়ে থাকেন, তবে তাঁর বিধি উল্টিয়ে দেব, এমন আস্পর্দ্ধা আমি রাখি না। তবে আমার সান্ত্বনা এইটুকু যে, এত বড় একটা ভুল নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়ে গেল,—তাতে আমার নিজের কোন দোষ বা দায়িত্ব নাই!"

সিরাজগঞ্জের বন্ধু যখন আট পৃষ্ঠাব্যাপী পত্রখানা পড়িয়া শেষ করিলেন, তখন দেখিলেন যে, ডাক কাগজে চোখের জলের দাগ লাগিয়া, স্থানে স্থানে হাতের লেখা অত্যন্ত ঝাপ্‌সা হইয়া গেছে!

রূপের কষ্টিপাথরে খাঁটী সোণা বলিয়া মনে হইল না, অথচ প্রেমের নিরিখেও ভয়ানক হাল্‌কা হইয়া গেল—এমন গ্রাম্য বীণা লইয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সুশিক্ষিত নিখিল জীবন-কুঞ্জে কোন রাগিণী ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিবেন? যে নারী তাঁহার উচ্চ আকাঙ্ক্ষার, উন্নত

চিন্তার অর্দ্ধ-ভাগিনী হইবার ক্ষমতা রাখে না, তাকে তিনি কখনো সহ-ধর্ম্মিনী বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না !

সুতরাং কোনও মতেই আর ঘরে মন বসিল না।

এ দিকেও বিবাহের রাত্রিতে রসুন-চৌকির বাজনাটা বীণার কাণে মন্দ ঠেকিল না ; কিন্তু বিবাহের পরদিন হইতে, নিরেট গন্ধময় শ্বশুর-বাড়ীটা, কোন মতেই তাহার ভাল লাগিল না। অষ্ট-মঙ্গল বিবাহের পর, বীণা কাঁদিয়া-কাটিয়া যখন বাপের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল, সে মনে করিল তাহার যেন পুন-র্জন্ম হইল। নিখিলের মত উদ্ভ্রান্ত পাখীর চিত্ত ধরিবার জন্য যে কুহক-জালের প্রয়োজন, সে তাহা কোথায় পাইবে ? সে ইহার কি-ই বা বুঝে ! সুতরাং বাপের বাড়ীতে আসিয়া, পানা-পুকুরে সাতার কাটিয়া, কুলতলায় নিঃঝুম দুপ্রহরে নির্ব্বিঘ্নে পুতুল বিবাহ দিয়া, তাহার নিজের সম্বন্ধে প্রজাপতির গোলযোগ এক প্রকার বিস্মৃত হইল।

প্রেম-জগতে গুরুতর ধাক্কা খাইয়া, নিখিল বাবুও কলিকাতার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দপ্তরখানায়, সম্পূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। বিদ্যা-চর্চ্চার তীব্র উৎসাহ উত্তেজনার মধ্যে, নাইট্রিক এসিডের বাষ্পের মধ্যে বীণার খবর কে রাখে ! অবশেষে রসায়ন-শাস্ত্রে এম, এ, পাশ করিয়া, নিখিল যখন কলিকাতার সেনেট-ভবন হইতে, চসমা চোখে দিয়া, সংসারে বাহির হইয়া আসিলেন, তখন তাঁহার জীবনের আদর্শ ও অভিলাষ এত উপরে উঠিয়া গিয়াছে যে. সেখান হইতে বীণার মতন একটা তুচ্ছ গ্রাম্য সামগ্রী ভাল করিয়া তাঁহার নজরেই পৌছে না।

অবশ্য, পাঠাবস্থায় কলিকাতায় নব-শিক্ষিতাদিগের মধ্যে, দুই

একটি ক্ষীণ-ভঙ্গুর পাণ্ডুর-ছবি কুমারী, তাঁহার আকাঙ্ক্ষার উপর রঙ্গীণ ছায়াপাত করিয়া যাতায়াত করিয়াছে বটে, কিন্তু একটা উপলক্ষ্য বর্ত্তমান থাকিতে আর একটা বিবাহ করা তো ভাল দেখাইবে না! অথচ, এমন একটা নিরেট "ব্রাহ্মণী" গোছের স্ত্রী লইয়া সংসার করা, নিখিলের মত শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব। এস্থলে স্ত্রী নামক পদার্থটা একেবারে বাদ দিয়া, সংসার করাই মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়, নিখিল অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, পরিশেষে এই উপসংহারে উপনীত হইয়াছেন। কেন, বিলাতে তো আজ-কাল অনেকেই বিবাহ করেন না; অর্থ-নীতির হিসাবেও এই ব্যবস্থাই তো অতি-উত্তম!

নিখিল বাবু এম, এ, পাশ হওয়ার পূর্ব্বে, আর বীণাকে শ্বশুর-বাড়ী যাইতে হয় নাই। তাহার কারণ, এ বিষয়ে নিখিল তাহার পিতা-মাতাকে কখনও উৎসাহ দেন নাই। ছেলের পাঠাবস্থায়, এ উপসর্গটা একটু দূরে রাখা মন্দ নয়, নিখিলের পিতারও এই মত। বীণাও পিতার আদরের মেয়ে; সুতরাং আশু কোনও দিকেই বীণার শান্তি-ভঙ্গের সম্ভাবনা ছিল না।

এই ভাবে ছয়টি দীর্ঘ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইতি মধ্যে বীণার পিতা অমূল্যচরণ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। কালের বিস্মৃতি-মাখা মায়া-যষ্টির পরশে বীণাদের শোকাচ্ছন্ন হৃদয় হইতে সে দুঃখের মেঘও ধীরে ধীরে কাটিয়া গিয়াছে। এখন বীণা পোনেরোতে পা দিতেই, সৌন্দর্য্যের জগৎ যেন তার চারিদিকে ঝলমল্ টলমল্ করিয়া উঠিল। কেবল তাহার অন্তরের নিভৃত কোণে একটী তার বাজিল না;—শুধু একটা স্থান শূন্য বোধ হইল। বীণার

মনে হইল, যেন সেই খানে বিশ্বের শূন্যতা আসন পাতিয়া বসিয়াছে; তার নারী হৃদয়ের অন্তরতম গোপন মর্ম্ম কোষটীর চারিধারে, এখন শুধু কোমল বেদনা সঞ্চিত হইয়া আছে, আর কিছুই নাই! যাঁহারা যৌবনের নদী পাড়ি দিয়া আসিয়াছেন; তাঁহারা বুঝিবেন, বীণার ব্যথা কোথায়!

নিখিলকে দুই চারি বার শ্বশুরবাড়ীতে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান হইল, কিন্তু এ সব আবেদন-নিবেদন তিনি এক তরফা ডিস্‌মিস্ করিয়াছেন। যখন নিখিল ডেপুটি হইলেন, তখন বীণাকে তাঁহার কর্ম্ম-স্থলে পাঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠান হইল, কিন্তু সেটাও টিঁকিল না। বীণার জন্য, নিখিল অন্তঃপুরের একটি অনাদৃত প্রকোষ্ঠও ছাড়িয়া দিতে রাজি হইলেন না। বীণা না জানে লিখিতে পড়িতে, না জানে 'লেস' বুনিতে বা সেলাই করিতে; যেমন হার্ম্মো-নিয়মে বিদ্যা, কণ্ঠ সঙ্গীতেও ততোধিক। সে তাঁহার চিন্তার সহিতও কোন সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিবে না। পদ-সেবার জন্য মাসিক চারি টাকা বেতনের রামলাল মাহাতো এবং রন্ধন-শালার জন্য সাড়ে ছয় মুদ্রা বেতনের ঠাকুরই তো যথেষ্ঠ। স্ত্রীনামক ব্যয়-বহুল একটা সৌখীন উৎপাৎ সৃষ্টি করিবার আবশ্যক কি? অচিরে আশাতিরিক্তরূপে পুন্নামক নরকের বিভীষিকা দূর করিবে? অষ্টম-গ্রেডের ডেপুটীর পক্ষে, তাহাতে সৌভাগ্যের অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের ভাগটাই নিঃসন্দেহ জেয়াদা। নিখিল সম্বন্ধী বিনয়কে শেষ পত্রে তাঁর আল্টিমেটাম্ জানাইলেন,—"এখানে "ফেমিলি" নিয়ে থাকার কোন বন্দোবস্ত হ'তে পারে না। খরচেও পোষাবে না। এর পর এ সম্বন্ধে আর কোন অপ্রিয় সত্য নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার

দরকার দেখি না। আর এত তাগিদের উপর তাগিদই বা কেন ভাই, এ তো আর লাটের তারিখের সদর খাজানা নয় যে, সূর্য্যাস্ত পার হইয়া গেলেই জমিদারী নীলামে উঠিবে?"

যথা সময়ে কথাটা বীণার কানে পঁহুছিল। সে এখন পুতুল খেলার বয়স পার হইয়া আসিয়াছে। এতদিন হৃদয়ের যে স্থানটা শুধু ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকিয়াছে, এখন সে স্থানটা একেবারে কালি হইয়া গেল।

বেলা দুপ্রহর। শীতল-লক্ষার পশ্চিম পারের গাছ-পালাগুলি হইতে, কুয়াশার ধূসর রেখাটি একেবারে মিলাইয়া যায় নাই। তাহার উপরে পৌষের মিঠা রোদ আসিয়া পড়িয়াছে। ষ্টিমারে ফ্লেটে, মাস্তলাকীর্ণ নৌকায় স্লুপে, শীতল-লক্ষার বক্ষ খচিত। মাস্তলের চূড়ায়, চলন্ত নৌকার পালে, ঈষৎ চঞ্চল জল-স্রোতের উপরে, রৌদ্রের স্বচ্ছ আভা স্বর্ণ-কুহকের মত ঝিকিমিকি করিতেছে।

অদূরে, শীতল-লক্ষা তাহার শীতল জলধারা ধলেশ্বরীর বিস্তৃত বক্ষে সমর্পণ করিয়া যেন ধীরে ধীরে আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইতেছে। সেই নদী-সঙ্গমের পরপারে, সেই মিলিত বারিরাশির সুদূর তটরেখায়, মেঘহীন নীলাকাশ পল্লীর নীল প্রান্তের সহিত আসিয়া মিশিয়াছে। রৌদ্র-চঞ্চল বায়ুর ভিতর দিয়া, পল্লী-লক্ষ্মীর শ্যামল সম্পদ যেন নীল কজ্জল-স্নিগ্ধ হইয়া দেখা দিয়াছে!—যেন জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকরের একখানি ভাবময় লেন্‌ড্‌স্কেপ্‌ ছবি,—চঞ্চল রৌদ্রে কাচের মত ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে! ছবির পিছনে চিত্রকর নিজে লুকাইয়া রহিয়াছেন! কিন্তু লোক যার যার কার্য্যে ব্যস্ত,—সে চতুর শিল্পীর কে-ই বা খবর রাখে!

নারায়ণগঞ্জ ষ্টেসন একেবারে লোকে লোকারণ্য। কাল বড়-দিনের ছুটী উপলক্ষে আপিস-আদালত সমুদয় বন্দ হইয়াছে, আর পুরা বারো ঘণ্টা পার হইতে না হইতেই, সমুদয় পূর্ব্ব-বঙ্গের কর্ম্ম চেষ্টা ভিড় করিয়া, কলিকাতার পথে, নারায়ণগঞ্জ আসিয়া হাজির! এই নারায়ণগঞ্জ সহরটি বড়ই অপূর্ব্ব স্থান; এখানে আসিলে উমেদারের পাটের আপিসে কর্ম্ম-প্রাপ্তি হয়, বন্ধু-হীন অভ্যাগতের বন্ধু-লাভ হয়, অপুত্রকের পুত্র হয়! লক্ষার জলের নাকি এমন গুণ যে, যে যা কামনা করে, তাহাই সিদ্ধ হয়!

বেলা সাড়ে বারোটার সময়, যখন যাত্রীর প্রবাহ লইয়া ঢাকার ট্রেণ প্ল্যাটফর্ম্মের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সরকারী বেসরকারী সাহেব মেমে, জজ মুনসিফ ডেপুটীতে, প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে জাহাজের "জেটী" পর্য্যন্ত, একেবারে বোঝাই! পোষাকের চাক্‌চিক্যে, রকমারি আলো-য়ানের রং-এর বাহারে, সমুদয় ষ্টেসনটা বাইয়োস্কোপের একটা চলন্ত ছবির মত বোধ হইতেছে।

কিন্তু, বড়দিনের আনন্দের মধ্যেও অসুবিধার অভাব নাই! যাঁহাদের সঙ্গে প্রচুর লগেজ আছে, তাঁহাদের পক্ষে ভিড় ঠেলিয়া এবং টিকিট-কালেক্টার এবং জাহাজের কেরাণী-প্রভুদের সায়ত্ত-শাসনের গণ্ডী পার হইয়া, ষ্টীমারে প্রবেশ করিতে আজ যথেষ্ট পরিমাণে পুরুষকারের খরচা প্রয়োজন। যাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভারি লগেজ, অর্থাৎ পরিবার সঙ্গে, তাঁহারা দৈবের বরাবরে আমমোক্তার-নামা দিয়া বসিয়া আছেন,—নচেৎ আজ শুধু পুরুষকারের সাহায্যে গোয়ালন্দ ষ্টিমারে উঠিবার কোনও উপায় দেখা যায় না!

মৃগনাভি

ষ্টীমার, ছাড়িবার পূর্ব্বে, বার বার অনুনাসিক ধ্বনি করিয়া, যখন বাষ্প-কম্পিত হইয়া উঠিল, তখন ফার্ষ্ট্ ক্লাশের পৃথক সিঁড়ি দিয়া, একটি সাহেবের মত পোষাকপরিহিত বাঙ্গালী, সরু ছড়ি ঘুরাইয়া, লঘু পদক্ষেপে, প্রথম শ্রেণীর কামরাগুলির দিকে হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন। দিব্যি ফুট্‌ফুটে পাতলা চেহারা, নাসিকাটি চেহারার তুলনায় প্রবল। সেই তুঙ্গ স্থানের উপর একখানি সোনার "পিন্‌স-নেজ্" চসমা,—তার এক কোণ হইতে, জ্যামিতির রেখার ন্যায় সরু, একটা চেইন কোটের বটম্-হোলটার দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। ইনি শ্রীযুক্ত নিখিল-রঞ্জন রায়। সম্প্রতি জামালপুরের প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা-প্রাপ্ত ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইলেও, জীবনপথে ত্রিশ বৎসরের তরুণ যাত্রী মাত্র !

প্রথম শ্রেণীর সজ্জিত কামরাগুলির পাশ দিয়া, সম্মুখের ডেকের দিকে যাইবার একটি অপ্রশস্ত রাস্তা, লোহার জালে ইহার কিনারা সুরক্ষিত। ডেকের উপরে ইজি চেয়ারে পা মেলিয়া দিয়া, খবরের কাগজের চুট্‌কীর উপর ঘুমন্ত চক্ষু ন্যস্ত করিয়া, অবশিষ্ট দিনটা জাহাজে কাটাইয়া দিবেন, এই আশায় কেবিনগুলির পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তা দিয়া যাইবার সময়, লেডিজ কেবিনের পানে তাকাইয়া, নিখিল বাবুকে তাঁহার সচকিত দৃষ্টি তাড়াতাড়ি সামলাইয়া লইতে হইল। কারণ তাহাতে সে সময় দুইটি নব্য ধরণের বঙ্গ-মহিলা আরোহী ছিলেন।

তাঁহারা দুটি কামরাতে প্রবেশ করিয়া, নদীর দিকের দরজার ঝিলিমিলিগুলি খুলিয়া রাখিয়া ছিলেন। নিখিল বাবু সে চকিত দৃষ্টি-পাতের মধ্যে কি কি খবর সংগ্রহ করিয়া আনিলেন, তাহা ঠিক জানা যায় না। নিখিল বাবুর লাভালাভ যাহাই হইয়া থাকুক,

তিনি জাহাজের সম্মুখের ডেকের দিকে কিন্তু আর বেশী অগ্রসর না হইয়া, লেডিজ কেবিনের সংলগ্ন কেবিনটীতে গিয়া তাড়াতাড়ি দখল লইয়া বসিলেন।

* নিখিল বাবু এইটুকু দেখিয়া আসিয়াছিলেন যে, মহিলা দুইটীর মধ্যে একজন তরুণী, অপরটী মধ্য-বয়স্কা। দুজনারই বেশ-ভূষা খুব জাঁকালো নয়, তবে বেশ নিখুঁত পরিপাটী, এবং আধুনিক রুচি-সঙ্গত। দুজনারই পিঠের উপরে ভাঁজকরা শাল, তবে তরুণীর শালটীর বর্ডারে ফুল-পাতার সরঞ্জাম কিছু বেশী। দুজনারই থ্রি-কোয়াটার আস্তিনের কাল কাশ্মীরী জাকেট, কাঁধের নিকট স্ফীত। ইহার উপর সাড়ীর আঁচলখানি সোনার ব্রুচে সুরক্ষিত। কেবল তরুণীর আস্তিনের কাছে কাছে খানিকটা ভেলবেটের বেগুনী আঁচ, ধারে একটু মিহি জরির কাজের চাক্‌চিক্যও ছিল; এবং যেথানে সেখানে ফ্রিল্‌ ও লেসের চপলতাটাও যে একেবারে চোখে না পড়ে, তা নয়!

ততক্ষণ চাকার আঘাতে জলরাশি চূর্ণ, মথিত করিয়া দিয়া, মথিত ফেণ-মঞ্জুরিত জলকণার উপর রামধনুর রং ফলাইয়া, জাহাজ ছুটিয়া চলিয়াছে। দুই ধারে, বহু দূরে, শ্যামল রেখাঙ্কিত তট-রেখা পশ্চাৎভাগে সরিয়া যাইতেছে। শীতার্ক, ক্ষণস্থায়ী মধ্যাহ্নের রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ ধূম-কলঙ্কিত করিয়া ষ্টীমার বিপরীত দিকে চলিয়াছে। এমন অস্থানে, অসময়ে, ভরা শীতের মাঝে, ভগবান মীন-ধ্বজ যে নিখিলের উপর পুষ্প-শর ত্যাগ করিয়া কাপুরুষের মত অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহা কে জানিত? কারণ, নিজের মনের উপর তাঁহার যথেষ্ট কর্ত্তৃত্ব আছে,

এ বিশ্বাস নিখিল বাবুর পূর্ণমাত্রায় ছিল, অনেকেরই থাকে। ষ্টীমারের ঢেউ লাগিলে, তীর-লগ্ন ডিঙ্গিগুলির মধ্যে যেমন একটা ভয়ানক লাফালাফি পড়িয়া যায়, তরুণীর মুখখানি তেমনই তাঁহার হৃদয়-তটের কাছে একটা মধুর আনন্দের তরঙ্গ-চাঞ্চল্য বহন করিয়া আনিল। 'মুক্ত সৌন্দর্য্যের উপর সলজ্জ মাধুরীটি তরুণীতে এমনই স্বাভাবিক, এমনই রমণীয় বোধ হইল যে, আজ নিখিলের সমস্ত অন্তঃকরণটা এক বিচিত্র প্রশংসার অর্ঘ্যভারে টন্‌টন্ করিয়া উঠিল।

এই মধুর অবস্থা-বিপাকের মধ্যে, নিখিলরঞ্জনের নিকট স্বপ্ন সত্য হইয়া আসিতেছিল, এবং সত্য স্বপ্নের মত হইয়া যাইতেছিল, এমন সময়, পাশের কাম্‌রা হইতে, মধ্যবয়স্কা মহিলাটি ত্রস্তভাবে নিখিলের কাম্‌রায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিজের কাম্‌রায় একটী মহিলাকে সশরীরে ঢুকিতে দেখিয়া, জাল-দেওয়া বেট হইতে টেনিস্ বল যেমন লাফাইয়া উঠে, সেইরূপ সম্ভ্রম ও উত্তেজনার আতিশয্যে, নিখিল স্প্রিংএর বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িলেন। উঠিবার সময়, ওয়াসিং-ষ্টেণ্ডের সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া, তিনি চলন্ত ষ্টিমারের মধ্যে মাতালের মত প্রায় পড়িয়া গিয়াছিলেন আর কি? সৌভাগ্যবশতঃ অতি অল্পের জন্য, একটা গুরুতর "ক্যাটাষ্ট্রফি" হয় নাই। মহিলাটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া, শুষ্কমুখে নিখিলকে বলিলেন,—

"অচেনা হয়েও হঠাৎ আপনাকে বিরক্ত কত্তে হল, সেজন্য আমাদের মাপ কর্‌বেন,—আমরা দুটী মেয়েছেলে বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেচি। এতক্ষণ নানা সন্দেহ করে আসিনি। এখন দেখ্‌চি আপনি বাঙ্গালী, তাই ভরসা করে—"

মহিলার সম্ভাষণের মধ্যে যে একটা প্রচ্ছন্ন গালি ছিল, সেটা কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া, নিখিল বাবু একটা অজ্ঞাত উৎসাহের উত্তেজনায়, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন ;—

"বলেন কি ! আমাকে দিয়ে যদি আপনাদের কোন উপকার হয়, সেতো আমার পরম সৌভাগ্য।"

মহিলার অধরের কোণে, একটু হাসির রেখা চমকিয়া গেল ; কিন্তু তাহা লক্ষ্য করিবার মত মানসিক অবস্থা তখন ডেপুটী-বাবুটীর ছিল না। স্ত্রীলোকটী বলিলেন,—

"আমাদের লগেজগুলো সব ষ্টীমারে ঠিকঠাক্ মতো উঠ্‌লো কিনা, সেটা একটু খোঁজ করে দিতে হচ্চে !"

নিখিলরঞ্জনের ইঙ্গিতে, তাঁহার আর্দ্দালী তাঁহার নিকট গলায় বক্‌লস্ বাঁধা বিলাতী কুকুরটীর মত ছুটিয়া আসিল। মহিলাটী বলিলেন,—

"লগেজগুলো আমি ওকে নিয়ে একবার দেখে আস্‌চি, আপনি দয়া করে ততক্ষণ একটু পাশের কাম্‌রার দিকে নজর রাখ্‌বেন। আমার সঙ্গিনী একা রইলেন, পরে এসে সব বল্‌চি আপনাকে।"

এই বলিয়া, নিখিলের অনুমতির প্রতীক্ষা না করিয়াই, মহিলাটী আর্দ্দালীকে লইয়া, সিঁড়ি দিয়া বরাবর নীচে নামিয়া গেলেন। এমন একটা অপ্রত্যাশিত কর্ত্তব্য পালনের মধুর সম্ভাবনার লাগ পাইয়া, নিখিল দুই এক বার কাসিয়া, একেবারে লেডিজ্ কেবিনের দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সে সময় একটা ছোক্‌রা যাত্রী, জাহাজের ডেক্ হইতে, গলা ছাড়িয়া গাহিতেছিল,—"তোদের যিনি রাজার দ্বারী, রাখাল রাজা মোদের বংশীধারী।"

এমন অবস্থার পাকে পড়িলে যা হইবার, তাহাই হইল। বার দুই দৃষ্টি-বিনিময় হওয়ার পর, নিখিলের কণ্ঠ অত্যন্ত শুষ্ক বোধ হইল, এবং বক্ষের ঘন স্পন্দের মধ্যে, হৃদয় নামক জিনিসটার আর কোনও উদ্দেশ পাওয়া গেল না! তাঁহার বার বার মনে হইতে লাগিল, যেন আজ তাঁহার "রাজার দ্বারীর" সাজ-পোষাক, এক মধুর ঝড়ের বাতাসে কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। লেডিজ্ কেবিনের নিকট, আজ যে চিত্ত লইয়া নিখিল দাঁড়াইয়াছেন, তাহা প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা-প্রাপ্ত ডেপুটীর নয়, সে চিত্ত গুপ্ত-বৃন্দাবনের মিনতি-করুণ এক রাখাল-কাঙ্গালের!—যেন তার সমুদয় হর্ষ-বেদনা, অঞ্জলি-নিবেদন বাঁশীর সুরে বাঁধিয়া লইয়া, তার চূড়ার শিখি-পুচ্ছ কার দুটী কোমল চরণ-পল্লবের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে! নিখিলের সেই নাকাল অবস্থার গোপন লজ্জার কথাটুকু, ঐ ছোকরার গানের সুর, যেন সকলকে, বিশেষতঃ তরুণীকে বলিয়া দিতেছিল; তাহা না হইলে, ঐ পুরাতন গানের একটা তাল-মান-হীন চীৎকার শুনিয়া, নিখিলবাবুর অতটা কুণ্ঠিত হইবার কোনই কারণ ছিল না!

নিখিলের চিত্তের যে শাখাটা, এত দিন আপনার শুষ্ক কামনা লইয়া, আকাশে বাতাসে সান্ত্বনা খুঁজিয়া মরিতেছিল, সে আজ অকস্মাৎ নুপুর-শিঞ্জিত দুটী সুন্দর চরণের মধুর পদাঘাত খাইয়া, একেবারে ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠিল,—তাহাতে আর একটী অঙ্কুরেরও স্থানে রহিল না!

নিখিলের নিকট সেই মধুর দৃষ্টির শুভ মুহূর্ত্তটির মূল্য লক্ষ হীরা! কারণ, তাহার ভিতরে আজ সহসা কত নির্জ্জন সন্ধ্যার ঘন সৌরভ, কত

জ্যোৎস্না-রজনীর রজত ছবি, কত স্বর্ণ-মৃগ, কত পুষ্পক-বিমান স্বপ্ন-জগতের সীমানা পার হইয়া, নিখিলের চক্ষে ধ্রুব হইয়া উঠিল, ভাষায় তাহা ঠিক করিয়া বলা শক্ত। মহাদেব মদন ভস্ম করিয়াছিলেন, সে কথা বিশ্বাস করা সহজ; কিন্তু সে যে এত'কাল পরে, এই ঘোর কলিতে, এমন মারাত্মক ভাবে বাঁচিয়া উঠিতে পারে, নিখিলের অধীত কেমিষ্ট্রীতে তো সে কথা কোথাও লেখাই ছিল না,—ডেপুটীর পেনাল্ বা প্রসিডিওর কোডেও না!

যাহা হউক, যখন মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোকটী আবার উপরে আসিয়া পঁহুছিলেন, তখন নিখিল অতি কষ্টে আপনাকে সামলাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন; কিন্তু, তবুও যেন এক নব-বিস্ময়ের তরুণ আনন্দ তাঁহার চক্ষে লাগিয়া রহিল। কারণ, নিখিলের হৃদয় তখন লালে-লাল, সমগ্র জাহাজটা তখন তাঁহার কাছে চৈত্রের অশোক-বনের মত ঠেকিতেছিল!

মধ্যবয়স্কা কেবিনে ফিরিয়া আসিলে, নিখিল কতকটা বাহ্য-জগতে ফিরিয়া আসিলেন। মহিলা নিখিলকে সৌজন্য ও সাহায্যের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া, পরে বলিলেন;—

"সে কি, আপনি দেখ্‌চি, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন, ভিতরে এসে বসুন না!

সে অভিলসিত প্রস্তাব নিখিল বিনাবাক্যব্যয়ে গ্রহণ করিলেন, কারণ, ভিতরের দিকে কে যেন রেশমী লাগাম দিয়া তাঁহাকে টানিতে-ছিল, আর তাঁহার কর্ত্তব্য-জ্ঞানও তাঁহাকে বুঝাইল যে, ভিতরে যাওয়ার আমন্ত্রণ একটি মহিলার অভিপ্রায়; পালন করিতে ইতস্ততঃ করিলে,

শিষ্টাচারের দণ্ডবিধিতে তাঁর জন্য এমন কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা হইতে পারে, যাহা জয়দেব তাঁর সুললিত পদাবলীতে লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই!

মহিলা দুইটি এক দিকের বেঞ্চে ও নিখিল সম্মুখের স্প্রিং দেওয়া বেঞ্চে বসিলে পর, মধ্যবয়স্কা বলিলেন,—

"আমরা দুটী ভারি বিপদে পড়ে আপনার শরণাগত হয়েচি। আমরা ঢাকা থেকে আস্‌চি; যে আত্মীয়টী আমাদের নিয়ে আস্‌চিলেন, তিনি দোলাইগঞ্জ ষ্টেসনে কমলালেবু কিন্‌তে গিয়ে ট্রেণ মিশ্‌ করেছেন। আমাদের সঙ্গে থ্রু টিকিট ছিল, তাই রক্ষে। নারায়ণগঞ্জে তো একরকমে ষ্টীমারে চাপা গেছে. কিন্তু, গোয়ালন্দের কথা ভেবে একেবারে অস্থির হয়ে পড়েচি।"

কর্ত্তব্য পালনের আর একটা স্বর্ণ-সুযোগ এত হাতের কাছে পাইয়া, নিখিলের উৎসাহ খুবই বাড়িয়া গেল। তিনি খুব স্ফুর্ত্তির সহিত বলিলেন,—

"তার আর ভাবনা কি! আমিও কোল্‌কাতাই যাচ্চি। আমি আপনাদের বাড়ী পৌঁচে দিয়ে যাব এখন, সেজন্য ব্যস্ত হবেন না। গোয়ালন্দ গিয়ে আপনাদের সেই আত্মীয়টিকে একখানা টেলিগ্রাম করে দিলেই তিনি নিশ্চিন্ত হবেন এখন।"

আবার নিখিলের চোখ তরুণীর চোখে পড়াতে, পুনরায় একটা ছোট খাটো রকমের "কলিসন" হইয়া গেল! কিন্তু, এবার নিখিলের একটু খট্‌কা লগিল। এরূপ বিপদে পড়িয়া, যতটা ঘাবড়াইয়া যাওয়া উচিত ছিল, তরুণীর চোখে মুখে তেমন কিছু ব্যক্ত হইল না; বরঞ্চ,

তাহাতে যেন লাজের রঙীণ আভা-জড়ানো একটু কৌতুকের চাপা হাসিই ফুটিয়া উঠিতেছিল।

এমন সময় মধ্যবয়স্কা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন,—

"বাস্তবিক, আপনার মত সহৃদয় ভদ্রলোক না পেলে, আজ আমাদের যে কি দুর্গতি হতো, তা ঈশ্বর জানেন। আমরা আপনার অনুগ্রহ কখনও ভুল্‌তে পার্‌বো না; আপন না হ'লে পরে কখনো এমন করে না।"

এই বলিয়া মধ্যবয়স্কা হাসিলেন, তরুণীও একটু হাসিয়া উঠিলেন, যেন দুইটী সেতারে একটি হাসির মিড় এক সঙ্গে বাজিয়া উঠিল। কিন্তু, সে হাসিতে যে একটা গূঢ় অর্থপূর্ণ বৈদ্যুতিক আলাপ হইয়া গেল, নিখিল তাহার তাৎপর্য্য বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া, চুপ করিয়া অপ্রতিভের মত বসিয়া থাকিলেন।

কিছুক্ষণ পর, মধ্যবয়স্কা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া পুনরায় বলিলেন,—

"আপ্‌নাদের বাড়ী কোলকাতার কোন যায়গায়, বলুন দেখি?"

নিখিল বলিলেন,—"১৮ নম্বর অখিলমিস্ত্রির লেন।"

তরুণী হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"বেড়ে হয়েচে, আমাদের বাড়ীও তো ঐ লেনে, ২৪ নম্বর বাড়ী; বোধ করি খুবই কাছাকাছি হবে?"

"ঠিক বলেচেন আপনি, ঐ কলতলা ছাড়িয়েই মোড়টার মাথায়!"

খানিক পরে নিখিল একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আপনারা বুঝি কোল্‌কাতারই বাসেন্দা?"

এবার মধ্যবয়স্কার পালা; তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন,—

"তাই তো, এতক্ষণ পরিচয়টা দিতেই ভুলে গেছি—মাপ কর্‌বেন। মশাই, আমার সঙ্গিনীটি হচ্চেন একজন ডেপুটীর স্ত্রী, আমি এঁর গভার্ণেস্। এঁর বাপের বাড়ী ঢাকায়। স্বামী কোল্‌কাতার লোক,—কোল্‌কাতায় বাড়ী আছে।"

এ খবরে নিখিলের উৎসাহটা ইলেকট্রিক্ বাতির মত একেবারে দপ্ করিয়া নিবিয়া গেল। তিনি শুষ্ক মুখে একটু কাষ্ঠ-হাসির ভাণ করিয়া বলিলেন,—

"তাঁর নামটা ?"

মধ্যবয়স্কা একটু হাসিয়া মিনতির ভাবে বলিলেন,—

"এই টুকু, মশাই, আমাদের মাপ কত্তে হবে ; কোনো বিশেষ কারণে সেটি এখন বল্‌তে আমাদের মানা আছে !"

খানিক ক্ষণ নিঃঝুমের পালা চলিল। নিখিল কেবল নিজের মনের মধ্যে বারংবার অবাক হইতে ছিলেন, কিন্তু ব্যাপারখানা যে কি, তা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন না। প্রগল্‌ভা মধ্যবয়স্কাই আবারো নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন.—

"আমরা একটা বেয়াদবি কত্তে যাচ্চি, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আপনার—"

নিখিল বিনয়ের সহিত বলিলেন,—

"আমার নাম শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়, আমি জামালপুরের ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট্।"

"বড় সুখী হলেম, নামটা কিন্তু খুবই চেনা চেনা ঠেক্‌চে,—কেমন, না ?"

এই বলিয়া মধ্যবয়স্কা তরুণীর পানে চাঁহিয়া একটু হাসিলেন।

তরুণী যেন অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন ;—"হুঁ।"

নিখিল আরো অবাক্ হইয়া গেলেন। মহিলা দুটীকে যে তিনি কখনও দেখেন নাই, সে কথা তিনি সাক্ষীর কাঠ-গড়ায় হলফ্ করিয়া বলিতে পারেন। ইতি মধ্যেই, তাঁহার উপর পুনরায় জেরা-বৃষ্টি আরম্ভ হইল :—

"আপনি কি সস্ত্রীক ?"

এই মনস্তত্ত্বের গোলযোগের মাঝে, নিখিল বাবুর হৃদয় নামক পদর্থটা সুখে দুঃখে, বিস্ময়ে বেদনায়, স্বপ্নে সত্যে, জড়িত হইয়া এমন একটা আশ্চর্য্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, ভাল রসায়নাগারে ইহাকে বিশ্লেষণ করিলে, ইহা হইতে প্রচুর পরিমাণে নব-পুষ্পলের ঘ্রাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, এ কথা নিঃসন্দেহরূপে পাঠক প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন।—কারণ, সে সময় তরুণীর খোপার নব-পুষ্পলের মৃদু মধুর গন্ধে, জাহাজের কামরা খানা শুদ্ধ খোসবাই হইয়া গিয়াছিল!

মধ্যবয়স্কার জেরার উত্তর দিতে গিয়া, নিখিল একটু চিন্তার মধ্যে পড়িলেন ; অথচ, চিন্তা করিয়া জবাব দিবার অবসর কোথায় ? তাই বার কয়েক কাসিয়া, কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া সংক্ষেপে বলিলেন,— "না।" কিন্তু ভিতর হইতে বিবেকের পোকাটা তাঁর হৃৎপিণ্ড একবার কামড়াইয়া দিল। মধ্যবয়স্কা ও তরুণী একটা বাজে কথার ছুতা করিয়া হাসাহাসির একটু বাড়াবাড়ি করিলেন। নিখিলরঞ্জন যেন তাহাতে কয়েক ইঞ্চি ছোট হইয়া গেলেন!

এবার তরুণী কথা কহিলেন। কোমল আনন্দ-কম্পিত কণ্ঠস্বর!—

"আমাদের কিন্তু খুব ছেলেবেলায় বিয়ে হয়েচে।"

সংবাদটা যেন নিখিলের কাণ মলিয়া দিয়া গেল। 'বিয়ে হয়েচে'! তরুণী নিখিলের এত কাছে থাকিয়াও, রজনীর অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে মৃদু স্বর্ণালোকজড়িত কম্পিত তারাটির মত, সহসা সুদূর হইয়া গেল। কিন্তু দূরত্বের ভিতর দিয়া মাধুর্য্য যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নিখিলের সমস্ত হৃদয়টা ভিতর হইতে ধন্য ধন্য রবে মুখরিত হইয়া উঠিল। ধন্য সেই ডেপুটী, যাঁহার স্ত্রী নিখিলের সহিত অসঙ্কোচে কথা কহিতে অভদ্রোচিত কুণ্ঠায় লজ্জাবতী লতাটির মত একেবারে মুস্‌ড়িয়া গেল না! আলাপের রসটুকু আরও একটু নিঙ্‌ড়াইয়া উপভোগ করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন,—

"আমার মনে হয়, বাল্য বিবাহটা নিতান্ত ঋক্‌বেদের আমলের প্রথা, এতে কবিত্ব একেবারে নেই এবং দাম্পত্য প্রেমের আদর্শও খানিকটা খাটো হয়ে যায়।"

তরুণী একটু জোরে হাসিয়া উঠিলেন,—যেন হার্ম্মোনিয়মের মধ্য-সপ্তকের শেষের দিকের ঘাটগুলির উপর দিয়া একখানি ত্বরিত 'স্লার্' বাজিয়া গেল! তার পর, কথাটা হাসি দিয়া মধুর করিয়া বলিলেন,—

"সে হচ্চে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ, তার উপর তো আর মানুষের হাত নাই।"

তর্কের মুখে এমন করিয়া ডগা ভাঙ্গিয়া দিলে বাক্-যুদ্ধ ভাল করিয়া জমে না; কাজেকাজেই নিখিলকে থামিতে হইল। দুই একটা বাজে কথা বার্ত্তার পর, মহিলারা বিছানার দিকে সকরুণ

দৃষ্টিপাত করাতে, নিখিল শিষ্টাচারের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, তৎক্ষণাৎ লেডিজ কেবিন পরিত্যাগ করিলেন।

তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, তিনি সম্মুখের ডেকে একখানি ইজি চেয়ারে গা ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়িলেন। মনের মধ্যে পদ্মার ভাঙ্গন-পাড়ের মতই একটা বিচিত্র ভাঙ্গা-গড়া চলিতে লাগিল।

নিখিলের অবশিষ্ট দিনটা, নানারঙ্গের চিন্তার ভিতর দিয়া, অতি তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। ধীরে ধীরে পদ্মার স্বচ্ছ তরঙ্গহীন জলরাশি রঞ্জিত করিয়া রক্তিম-সূর্য্য পশ্চিমে দিগন্তের বন-রেখার দিকে হেলিয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে, মেঘ-মালাকে বিচিত্র প্রভামণ্ডিত করিয়া দিয়া, সূর্য্য বনান্তরালে ডুবিয়া গেলেন। এক খণ্ড পল্লবাকৃতি মেঘের কুচির মাঝে রঙ্গীন ভায়লেটের আভা অপূর্ব্ব প্রেমপরিণামের ইঙ্গিতের মত কিছুক্ষণ উজ্জল হইয়া থাকিয়া, আবার ধীরে ধীরে মলিন হইয়া গেল। অস্ত-কিরণের সমারোহ নিখিলকে এমন এক সকরুণ পুলক-রসে অভিষিক্ত করিয়া দিল যে, তিনি সুখ দুঃখের মাঝে আর ভেদ-রেখা দেখিতে পাইলেন না!

শীত প্রত্যূষে, রোদের রেখা তরল সোণার মত, সবে কুয়াশা ঘেরা ঝাপ্‌সা গাছপালার উপর ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় শিয়ালদহ ষ্টেশনের দালানের ভিতরে, উচ্চ প্লাটফরমের পাশে, গোয়ালন্দ মেল-ট্রেণ আসিয়া দাঁড়াইল। এঞ্জিনের সোঁ সোঁ শব্দ, কুলীদিগের চীৎকার, ঠেলা গাড়ীর চক্রধ্বনি এবং প্যাসেঞ্জারদের কোলাহলে ষ্টেশন গৃহ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। অথচ, রাজধানী কলিকাতার ষ্টেশন-স্থিত কর্ম্ম-কোলাহলের কোনো খবর রাখে না এমন একটি দয়েল,

ষ্টেশনের বাহিরে কম্পাউণ্ডের কোণস্থিত একটি গাছের শুষ্ক শাখায় বসিয়া, আপন মনে শিশ্ দিতেছিল।

ট্রেণ একেবারে নিশ্চল হইবার পূর্ব্বেই, নিখিল বাবু তাঁহার কাম্‌রা হইতে নামিয়া, কর্ত্তব্য পালনের সুযোগ অন্বেষণ করিতে করিতে, মহিলাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীর সম্মুখে হাজির হইলেন। মধ্যবয়স্কা নিজেই প্ল্যাটফরমে নামিয়া পড়িলেন। নিখিল গাড়ীর পাদানির উপর দাঁড়াইয়া, ভিতরে তরুণীর অভিমুখে নিজের হাত বাড়াইয়া দিতেই, শিষ্টাচারের পদ্ধতি অনুসারে, তরুণী অবলীলাক্রমে নিখিলের হাতে তাঁহার ক্ষীণ দেহভার সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত করিয়া, গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন। নিখিল খুসী হইলেন, কিছু আশ্চর্য্যও হইলেন, কারণ তাঁর এ ক্ষেত্রের প্রাপ্তিটা কিছু আশাতিরিক্ত বলিয়াই বোধ হইল—বিবেকও কাজটা সন্তোষের সহিত যেন অনুমোদন করিল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ ব্যাপারে তরুণীর মুখে, চোখে কোথাও একটুও শঙ্কা বা কুণ্ঠার ভাব দেখা গেল না, বরং তাহার নিদ্রা-জড়িত চোখের কোণে একটু লঘু হাস্যই ফুটিয়া উঠিল।

নিখিল বাবু ভাবিলেন, দেশে স্ত্রী-শিক্ষাটা এত দ্রুত গতিতে চলিয়াছে, যে পুরুষেরা এখনও সেটাকে সহজ ভাবে মানিয়া লইতে শিখে নাই বলিয়াই তাহারা এখনো সময় সময় বিবেকের তাড়না সহ্য করে। সে যাত্রা নিখিলের পক্ষে বিবেকের তাড়নাটা একটু শক্ত গোছেরি হইয়া ছিল, বোধ করি!

আর্দ্দালী দুইটি ঠিকা গাড়ী ভাড়া করিয়াছিল। একটিতে নিখিল তাহার নিজের লোকজন ও মালামাল চাপাইয়া দিলেন, তাহারা চলিয়া

গেল। অপরটিতে তিনি মহিলা দুটীকে তুলিয়া দিয়া নিজে কোচ-বাক্সের দিকে যাইতেছিলেন; এমন সময় মধ্যবয়স্কা স্নেহ-মধুর কণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন;—

"সে কি, নিখিল বাবু, ভিতরে আসুন না; আর তো আপনাকে আমরা পর ভাব্‌তে পার্‌বো না!"

অপ্রতিভ ভাবে নিখিল গাড়ীর ভিতরে আসিয়া বসিলেন। কর্পোরেশনের মার্কামারা রথ ঘড় ঘড় শব্দে সহরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

তখনও ভাল করিয়া কলিকাতা মহানগরীর নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই। হ্যারিসন রোডের দুই ধারের বড় বড় বাড়ীগুলার কার্ণিসের উপর একটু রোদ আসিয়া পড়িয়াছে। রাজ-পথখানি তখনও শীতল রৌদ্র-হীন,—প্রভাতের কোমলতা-মাখানো। ফুটপাথে, রাস্তায়, দোকানে এখনও কর্ম্মের প্রবাহ কোলাহল করিয়া জাগিয়া উঠে নাই। রাস্তায় সবে লোক বাহির হইতেছে; প্রাতর্ভ্রমণকারীরা চট্‌পট বাড়ীর দিকে যাইতেছেন; চার দোকানগুলির কপাট এই খোলা হইয়াছে মাত্র। মাঝে মাঝে দু-একটা বৈদ্যুতিক ট্রাম ঘণ্টাধ্বনি করিয়া সবে সহরের শান্তি ভঙ্গ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

নিখিলদের গাড়ী গলির মুখে প্রবেশ করিতেই মহিলারা বলিয়া উঠিলেন,—এই যে আমাদের অখিল-মিস্ত্রির লেন! তারপর, তাঁহারা উৎসাহ সহকারে গাড়ীর দুই দিকের জানালা দিয়া রাস্তার দুই পার্শ্বের বাড়ীগুলির নম্বর দেখিতে দেখিতে চলিলেন। এই অবসরে নিখিল দু'চার বার চুরি করিয়া তরুণীকে বেমালুম দেখিয়া লইতেছিলেন, কিন্তু চুরি করিবার সাধ প্রত্যেক চুরির সঙ্গে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু,

এদিকে মধ্যবয়স্কাতে ও তরুণীতে মাঝে মাঝে যে তারহীন টেলিগ্রাফি চলিতেছিল, নিখিল তাহার কোনও খবর রাখেন নাই। গাড়ী যখন ১৮ নম্বর বাড়ীর সম্মুখীন **হইল**, তখন "দিদি. মাথাটা ভারি কেমন কেমন কচ্চে," এই বলিয়া তরুণী হঠাৎ বয়স্কার কাঁধে আপন মাথাটি হেলাইয়া দিলেন,—সে যেন বাতাসে হেলান পুষ্প-প্রচুর করবীর শাখাটি!

মধ্যবস্কা "গাড়ী সবুর সবুর" বলিয়া হাঁকিয়া উঠিলেন।

নিখিল একটু ত্রস্ত ভাবে বলিলেন,—

"আপনাদের বাড়ী ও আর বেশী দূর হবে না। আগে আপনাদের পৌঁচে দিয়ে আসি, তারপর আমি যাব এখন।"

মধ্যবয়স্কা অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত উত্তর করিলেন,—

"আপনার বাড়ী বলেই তো সাহস করে' গাড়ী থামাতে বল্‌চি? দেখ্‌চেন না, বীণা বল্‌চে মাথা কেমন কচ্চে,—হিষ্টিরিয়ার পূর্ব্ব লক্ষণ! এমন ভাবে আর তো গাড়ীতে বসে থাকা নিরাপদ নয়।"

বীণা নামটা শুনিয়া নিখিলের মাথাটা একবার ঝিম ঝিম্ করিয়া উঠিল। পর মুহূর্ত্তেই একটা ছোট-রকম দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন। নিখিল শৈশবে যাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহার নামও বীণা! কিন্তু কার সঙ্গে কার তুলনা!

হিষ্টিরিয়ার সংবাদ শুনিয়া, নিখিল ভারি ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন;—

"সেকি, ওঁর হিষ্টিরিয়া আছে? তা, হলে শীগ্‌গির আমাদের বাড়ীতে নিয়ে চলুন, এ সময় আর দেরী করা ঠিক্ নয়।"

যাহা হউক, হিষ্টিরিয়া যত শীঘ্র আসিয়া পড়িবে বলিয়া ভয় হইতে ছিল, সে কিন্তু তত শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইল না! মধ্যবয়স্কা বীণাকে হাতে ধরিয়া নিরাপদে নিখিলের গৃহে প্রবেশ করিলেন। নিখিল আগে আগে সিঁড়ি দিয়া পথ দেখাইয়া চলিলেন। সে সময়ে নিখিলের আত্মীয় স্বজন কেহ বাড়ীতে ছিলেন না; সকলে দেওঘর গিয়াছিলেন, আজও ফিরেন নাই। কলিকাতা হইয়া নিখিলেরও সেখানেই যাওয়ার কথা। এ খবরটা জানা না থাকিলে, প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা-প্রাপ্ত ডেপুটী-বাহাদুরের ঐ ভাবে দুটি অজ্ঞাতকুলশীলা মহিলার সঙ্গে এক গাড়ীতে আসিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিতে সাহসে কুলাইত কি না, গভীর সন্দেহের বিষয়।

বীণাকে নিখিলের খাটখানিতে শোয়ান হইল। যেন গভীর অবসাদে, তার চোখ দুটি পদ্মের কুঁড়ির মত মুদিয়া রহিয়াছে। তবু নিখিলের মনে হইল, সে অবসাদক ঘুমন্ত অবস্থায়ও বীণার চোখে, মুখে, ঠোঁটে একখানি লঘু হাস্য লাগিয়াই রহিয়াছে। হাসি কখনো বুঝি সুন্দর মানুষকে ছাড়িয়া যাইতে চায় না!

কিছুকাল পরে মধ্যবয়স্কা বলিলেন,—

"নিখিল বাবু, আপনি যদি দয়া করে এঁর কাছে একটু দাঁড়ান, তবে আমি ঝাঁ করে এঁর ভাইকে বাড়ী থেকে নিয়ে আস্‌তে পারি। তারপর এঁকে বাড়ীতে নেবার বন্দোবস্ত করা যাবে। আমাদের বাড়ী তো কাছেই, ফির্‌তে আমার দেরী হবে না। এঁর মুখে, চোখে ততক্ষণ খানিকটা ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টা দিলেই চল্‌বে, এখন।"

নিখিল তখন কর্ত্তব্য পালনের সুমধুর নেশায় মাতাল। তিনি অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত বলিয়া উঠিলেন,—

"যান আপনি, শীগ্‌গির যান্—আমি থাক্‌তে কোনও ভাবনার কারণ নাই।"

মধ্যবয়স্কা তৎক্ষণাৎ খট্‌খট্‌ করিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। কিন্তু ঘরের বাহির হইয়া যাইবার সময় তাহার মুখে একটু হাসির রেখা চমকিয়া গেল!

তখন বীণা যেন খাটখানার উপরে আপন সৌন্দর্য্য-রাশির মাঝে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, আর খাটের পাশে বিস্ময়-মণ্ডিত নেত্রে বিহ্বল-চিত্তে দাঁড়াইয়াছিলেন নিখিল,—ঘরে আর কেহ নাই! নিখিলের সে রূপ দেখিয়া মনে হইল, তাঁর খাটের উপরে,—তার হৃদয়ের উপরে, একই ছবি, যুগল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কে সে! তাঁহার তো কেহই নয়! একটি অনধিকারী নারী-দস্যু মাত্র,—যে তাঁহার সমুদয় হৃদয় বলে ছিনিয়া লইয়া গিয়া, তাঁহাকে কিছুই প্রতিদান করে নাই! একখানি অম্লান ফুলের মালা,—এখনও প্রভাতের শিশির-মণ্ডিত,—হাতের এত কাছে, তবু হাতে তুলিয়া, হৃদয়ে গ্রহণ করিবার নিখিলের কোনও অধিকার নাই!

সে সময় বারান্দায় ঝুলানো, একটা খাঁচার ভিতর হইতে, একটা কেনেরী পাখী ভারি মিঠা বুলি দিতেছিল। রৌদ্র কিরণ, দরজার উপরে রঙ্গ-বেরঙ্গের শাশির ভিতর দিয়া রঞ্জিত হইয়া, খাটে, বালিসের ঝালরে, ঘরের পরদায় পড়িয়া ঘরখানিকে রঙ্গমঞ্চের মত স্বপ্নময় করিয়া তুলিয়াছিল।

বীণা তখনো নিখিলের খাটখানার উপরে, ছিন্ন বনলতাটীর মতো, পড়িয়াছিল। তার শিথিল কবরীমূল হইতে সাড়ীর প্রান্ত খসিয়া গিয়াছে;

কাচের স্প্রে দিয়া নিখিল তাহার মুখে গোলাপ জল দিতেছিলেন। গন্ধভরা গোলাপজলের কণাগুলি, ভ্রূলতার মাঝে, চোখের সান্দ্র-পল্লবে, আরক্ত গণ্ডস্থলে জড় হইয়া বীণার মুখখানিকে প্রভাতের শিশির-মণ্ডিত রক্ত-পদ্মটীর মত শোভন করিয়া তুলিয়াছিল। সেই জলের কণাগুলি একত্র জড় হইয়া, থাকিয়া থাকিয়া, তার অরুণিত কপোল হইতে মৃণাল-শুভ্র কণ্ঠের দিকে ঝরিয়া পড়িতেছিল,—সেগুলি নিজের হাতে, অতি সন্তর্পণে, শুভ্র রুমাল দিয়া মুছাইয়া দিবার সময়, নিখিলের হাতখানা বড় কাঁপিয়া উঠিতেছিল!

ততক্ষণে নিখিলের কর্ত্তব্যজ্ঞান, বিবেক বুদ্ধি, ভবিষ্যৎ চিন্তা,—সকল কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। নয়নের সম্মুখে এক স্বপ্ন-জড়িত মধুর বর্ত্তমান,—অন্তরের বাসনায় সুরভিত! নিখিলের সমুদয় উপবাসী হৃদয় হইতে একটি চুম্বনের আকাঙ্ক্ষা তাহার অধর-মূল হইতে ফাটিয়া পড়িতে চাহিতেছে! ধরা পড়িবার আশঙ্কা নাই, বাধা দিবার কেহ নাই,—কিন্তু তবু যেন কে নিখিলের হৃদয়ের ভিতরে সেই চুম্বনের আকাঙ্ক্ষাটিকে প্রাণপণে কষিয়া রাশ্ টানিয়া ধরিয়াছিল!

এমন সময়, সেই মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোকটী, আর দুটী যুবক ভদ্রলোক সঙ্গে করিয়া, নিখিলের স্বপ্নের রঙ্গভূমিতে দেখা দিলেন। নিখিলের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, কারণ যুবক দু'টী তাহার অপরিচিত নহে। প্রবোধ নিখিলের ভায়রা ভাই,—অপরটী তার সম্বন্ধী বিনয়, মুন্সীগঞ্জের উকীল।

প্রেমের রঙ্গমঞ্চে ভায়রা ভাইয়ের সহিত একাধারে সম্বন্ধী ও উকীলকে উপস্থিত দেখিয়া, ভারি একটা রসভঙ্গ হইল ভাবিয়া, নিখিল

মনে মনে অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন। তবু যথা সম্ভব গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া, কিছু মুরুব্বিয়ানা ভাবে, বলিলেন,—

"একি প্রবোধ বাবু যে! হঠাৎ কোত্থেকে?"

প্রবোধ বাবু একটু মুচ্‌কে হাসিয়া বলিলেন,—

"তুমি মনে করতে পারো যে, আমি বুঝি এই মাত্র জেপেলিন থেকে পড়্‌চি! কিন্তু তা নয় নিখিল, আমি আগাগোড়া তোমাদের ষ্টীমারের রোমান্স্‌ দেখ্‌তে দেখ্‌তে এসেচি, রোমান্স, দেখচি, বেশ জমে উঠেছে!"

নিখিল কোন রকমে মনের অপ্রতিভ অবস্থাটা ঢাকা দিয়া, উত্তেজিত হইয়া বলিল,—

"Behave yourself. দেখ্‌চ না এরাঁ সব ভদ্রমহিলা?"

বিনয় বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। মধ্যবয়স্কা হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বীণাও ততক্ষণে গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পড়িল। খাট হইতে নামিয়া আসিয়া, মাথায় সাড়ীর আঁচল খানা টানিয়া দিবার সময়, সে মুখের হাসি কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিতে ছিল না! চারিদিকে হাসির জল-তরঙ্গ বাজিয়া উঠিল! সে সময় চারি দিক দিয়া হাসির ঢেউ লাগিয়া খাঁচার ভিতর হইতে কেনেরী পাখীটাও খুব স্ফুর্ত্তির সহিত মিঠা বুলি দিতে লাগিল!

নিখিল বাবু হাসির চোটে ভয়ঙ্কর অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া বিনয়ের মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন,—

"ব্যাপার খানা কি হে বিনয়, আমি তো ভালো করে কিছুই ঠাউরে উঠ্‌তে পাচ্চি না!"

প্রবোধ বাবু হাসিয়া বলিলেন,—

"ব্যাপার আর তেমন কিছু নয়, তবে তুমি রোমান্সটাতে আগাগোড়া পুরাণা নভেল নকল করে চল নি, বেশ একটু Novelty দেখিয়েচ,—সেটা হচ্চে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে কোর্টসিপ্ করা!"

নিখিল হঠাৎ লাল হইয়া উঠিয়া বলিলেন;—

"নিজের স্ত্রীর সঙ্গে কোর্টসিপ্! বল কি প্রবোধ, সে হবে কেমন করে?"

প্রবোধ বাবু যেন কিছু মাত্র বিস্মিত না হইয়া, বলিলেন;—

"এই ধর না,—ষ্টীমার থেকে সুরু করে এ পর্য্যন্ত বীণার সঙ্গে পূর্ব্বরাগটা জমালে যেমন করে—"

নিখিল সহসা অপ্রত্যাশিত লাভের সম্ভাবনায় অত্যন্ত পুলকিত হইয়া, বিনয় বাবুর পানে চাহিয়া বলিলেন;—

"হলফ্ করে বল, বিনয়, ইনিই তোমার বোন্ বীণা?"

বিনয় একটু জটিল উকীলী হাসি হাসিয়া, ঘাড় নাড়িয়া, বুদ্ধিমানের মত বলিল;—

"নিঃসন্দেহ! আমার ভগ্নিও বটেন, তোমার স্ত্রীও বটেন!"

প্রবোধ না ছোড়। সে বলিল;—

"কোনও প্রকার সীমানার তর্ক নেই! তবে তোমার বুদ্ধির দোষে তোমার পক্ষে কিছুকাল তমাদি-সূত্রে বারিত ছিলেন বটে!"

* * * * *

এখন নিখিল ফরিদপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্। সহরে মস্ত পাকা বাড়ী ভাঁড়া করিয়া সেখানে সপরিবারে থাকেন। মা ষষ্ঠীর বরে, বীণা

নিখিলকে দুইটী পুত্র ও একটী কন্যারত্ন উপহার দিয়া, স্বামীর উপর নিজের দখলটী বেশ পাকা করিয়া লইয়াছে। নিখিল সন্ধ্যার পর আপিস হইতে ফিরিয়া আসিলে পর, এখনো মাঝে মাঝে বীণা সেই পুরাণা কথাটা তুলিয়া নিখিলের সঙ্গে তর্ক জুড়িয়া দেয়। সে বলে,— "বিবাহের পরেও ভালবাসা হ'তে পারে, এবং বিবাহের পরেও চেষ্টা করলে মেয়েরা লেখা পড়া থেকে আরম্ভ করে, ইস্তক বাবুয়ানা পর্য্যন্ত, সব শিখ্‌তে পারে। কিন্তু এত বড় মোটা কথাটা যার মাথায় ঢোকে না, সেই আবার মানুষ ধরে ধরে জেলে পাঠায়! এক ফোঁটা আক্কেল থাকা পর্য্যন্ত বুঝি আর মানুষ ডেপুটী হয় না! আমি তোমার বুদ্ধির কাহিনীটা শীগ্‌গীরই মাসিক কাগজে লিখে দিচ্চি, দাঁড়াও—" ইত্যাদি।

সম্পাদকের দৌত্য।

না টক, না মিষ্টি গোছের ছোট গল্পের চাট্‌নি বিলি করিবার সুবন্দোবস্ত না থাকিলে, বাংলার স্বল্প-প্রাণ মাসিক পত্রিকাগুলি বাঁচাইয়া রাখাই দায়! এত দিন, ছোট গল্পের জন্য কোনও রকম পাকাপাকি বন্দোবস্ত না থাকায়, ভবতারণ বাবুর "নবপ্রভা" অত্যন্ত নিবু নিবু হইয়া জ্বলিতেছিল। তবু রাত্রির যে অংশটা সব চাইতে বেশী অন্ধকার, প্রভাতের আলো তা থেকে বেশী দূরে নয়! "নবপ্রভার" এই চরম দুঃসময়ে, কুমারী বনজ্যোৎস্না, তার সুললিত ভাষার ফুল-পাতার ভিতরে ভাবের মুক্তা-গুচ্ছ ছড়ানো, জাপানী লেভেণ্ডারের গন্ধে ভরপুর, ছোট গল্পের রঙীন ঝাঁপিটী হাতে লইয়া, ভবতারণ বাবুর সাহিত্যের মজ-

লিশে দেখা দিল। "নবপ্রভা"য় তার নূতন ধরণের ঝক্‌ঝকে ছোট গল্পগুলির ঢেউ খেলিতে লাগিল।

বাংলা দেশের ছোট-গল্প-খোর পাঠক-সমাজ, সে গুলি এক চুমুকে নিঃশেষ করিয়া দিয়া, আরো যেন তৃষিত হইয়া উঠিল। বাংলা সাহিত্যের খাঁটি ভক্ত, পাঠিকা-সম্প্রদায়, জেনানা-মহালের কক্ষে কক্ষে বনজ্যোৎস্নার হাফ্‌টোন ছবি টানাইয়া দিলেন—কলেজের ছোক্‌রারা বনজ্যোৎস্নার ছোট গল্পের নাম শুনিতে মূর্চ্ছা যায়! এখন ভবতারণ বাবু প্রেসে কাগজ ছাপাইয়া ফুর্‌সুত পান না,—চারিদিক হইতে ছোট গল্পের তাগিদ আসিয়া, বনজ্যোৎস্নাকে অস্থির করিয়া দিল। নানা স্থানের নানাপ্রকার সম্পাদকদের ফরমাশ্‌ যোগাইতে গিয়া, তার আহার নিদ্রা একরকম বন্ধ! এমন হিংসুটে সম্পাদকগুলির পাল্লায় পড়িয়া, বনজ্যোৎস্নার চাইতেও বেশী ব্যাকুল হইতে হইল ভবতারণ বাবুকে। যাতে বনজ্যোৎস্নার লেখার উপর "নবপ্রভা"র একচেটে অধিকারটা চিরকাল বজায় থাকে, সে জন্য কোনও একটা ফন্দি না আঁটিলে আর চলে না!

এই মনে করিয়া এক দিন ভবতারণ বাবু বনজ্যোৎস্নাকে, একেবারে নাছোড়বান্দা হইয়া, ধরিয়া পড়িয়া বলিলেন,—

"আপনার ছোট গল্পের ধারা "নবপ্রভা"য় যে ভাবে চলেচে, চলুক; কিন্তু একখানা ধারাবাহিক রকমের বড় উপন্যাস না ফাঁদ্‌লে এখন তো আর কিছুতেই বাংলার পাঠক-পাঠিকাদিগকে থামিয়ে রাখা যাচ্চে না!"

বনজ্যোৎস্না বিস্তর ওজর-আপত্তি করিল, কিন্তু সেক্ষপীয়রের নারী-চরিত্র বুঝিবার মূল সূত্রটী অবলম্বন করিয়া, তার "না"র মানে 'হাঁ'র

অর্থে বুঝিয়া লইয়া,—ভবতারণ বাবু কিছুতেই জেদ ছাড়িতে রাজি হইলেন না! সে না-বুঝ জেদের ঝড়ে পড়িয়া, বনজ্যোৎস্নাকে অগত্যা হার মানিতে হইল। অনেক কথাবার্ত্তা, হাঁ-না, তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল, বনজ্যোৎস্না 'বন্য-মধু' নাম দিয়া, নাটক ও নভেল মিশাইয়া নূতন ধরণের একখানা বড় উপন্যাস ফাঁদিবে। সে বৈঠকে ইহাও স্থির হইয়া গেল যে, মাসে মাসে "নবপ্রভা"য় 'বন্য-মধু' ধারাবাহিক রকমেই চলিবে এবং এমন ভাবে চলিবে, যেন চলিত বছরেই গল্পটী শেষ না হইয়া সমুখের বছরের কয়েক সংখ্যায়ও চলে।

চপল স্ত্রী-চরিত্র কি করিয়া বশে আনিতে হয়, সে কল ভাল রকম জানা ছিল মনে করিয়া, ভবতারণ বাবুর মনে মনে একটা জবরদস্ত রকমের অহঙ্কার ছিল। এমন কি, এ ব্যাপারে তিনি নিজেকে মস্ত একটা "আর্টিষ্ট" বলিয়াই মনে করিতেন। বনজ্যোৎস্নার সহিত উপন্যাসের বন্দোবস্তটা পাকা করিয়া ফিরিবার সময়, তাঁর মুখ দেখিলে যে-সে লোকে মনে করিতে পারিত, ইনি বুঝি এই মাত্র এড্রিয়ানোপল্ জয় করিয়া আসিলেন! আপিসে ফিরিয়া আসিয়া, রং-দার জম্‌কালো কথায়, বনজ্যোৎস্নাকে বাংলার মারি করোলি নাম দিয়া, তার স্বরচিত, "নবপ্রভা"র জন্য বিশেষ ভাবে লিখিত, 'বন্য-মধু'র খবরটা বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে চারিদিকে রাষ্ট্র করিয়া দিলেন। তাতে "নবপ্রভা"র গ্রাহক-সংখ্যা জোয়ারের জলের মত সহসা আরো বাড়িয়া গেল!

নবজ্যোৎস্নার লেখার মধ্যে তাৎপর্য্য ছিল এই যে, সে আগে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া কিছু লিখিতে বসিত না। যে ভাবে বিচিত্রতার ভিতর দিয়া গল্পগুলি আপনাআপনি মিছরির দানার মত বাঁধিয়া

উঠিত এবং চরিত্রের অভিব্যক্তিতে ভাবের উচ্ছ্বাস যখন যেমন করিয়া ফেনাইয়া উঠিত, সে তাদের অবিকল তেমনি রাখিয়া দিত, কোনও রকম কাটা-ছাটা করিত না। তাই তার রচনার স্বাভাবিকতার মধ্যে কোথাও প্রায়াসের চিহ্ন দেখা যাইত না। একঘেয়ে হাসির স্রোতে কোথাও পাঠকের মন ক্লান্ত হইয়া পড়িবার যো ছিল না, অশ্রুর মধ্যে দুঃখের মূর্ত্তিটী নির্ম্মল পরিচ্ছন্ন ভাবেই দেখা দিত,—কোথাও থিয়েটারী হা হুতাশের একান্ত বাড়াবাড়ি থাকিত না। কিন্তু এরূপ রচনার যে একটা মহৎ দোষ আছে, বনজ্যোৎস্নাও তার হাত এড়াইতে পারে নাই; অর্থাৎ গল্পের আরম্ভের মুখে সে নিজেই জানিত না, গল্পটা কোথায় গিয়া কেমন ভাবে শেষ হইয়া যাইবে। তাই গল্পগুলি যেন অর্দ্ধ-পথে আসিয়া, সহসা কোন ছায়ালোকে অদৃশ্য হইয়া যাইত। সমাপ্তির দিকে স্বাভাবিকতার উপর আর্টের আলো-ছায়ার তেমন মধুর সমাবেশ হইত না বলিয়া, সময় সময় গল্পগুলি যেন অঙ্গহান ঠেকিত!

যথা সময়ে 'নবপ্রভা'য় 'বন্য-মধু' বাহির হইল। আউন্স গ্লাসের ড্রামের মাপে, 'নবপ্রভার' কয়েক সংখ্যায় 'বন্য-মধু' চলিয়া আসিয়া, হঠাৎ ফাল্গুণের সংখ্যায় বন্ধ হইয়া গেল। হায় নিদারুণ বিধি! সম্পাদকের এত বড় বিঘ্নটা কি আদত বসন্ত-কালের জন্য মুল্‌তবি ছিল! কিন্তু ভবতারণ বাবু সহজে হাল ছাড়িয়া দিবার মত লোক হইলে, বাংলা মাসিকের সম্পাদক হইতে রাজি হইতেন না!

এই দুর্ঘটনাটা ঘটিতে না ঘটিতে, ভবতারণ বাবু হাঁপাইতে হাঁপাইতে বনজ্যোৎস্নার সারস্বত-কুঞ্জে আসিয়া হাজির! হঠাৎ 'বন্য-মধু' এমন করিয়া গল্পের মাঝখানে বেথবরি থামিয়া গেল কেন,

উৎগঠাকর সঙ্গে যথেষ্ঠ বিনয়ের মিশাল দিয়া, ভবতারণ বাবু সে কথাটা বনজ্যোৎস্নাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে হাসিয়া বলিল;—

"বন্য-ফুলের মধু দিয়ে কখনও চৌবাচ্চা ভরা যায় না, বড় গল্পে হাত দেয়াটাই আমাদের মস্ত একটা বুঝ্‌বার ভুল হয়ে গেছে!"

তবু এমন স্পষ্টাস্পষ্টি জবাবের পরেও, ভবতারণ বাবু না-বুঝ ছেলের মত অনেক বাহানা করিলেন, অনেক খোসামুদী করিলেন, কিন্তু তিনি আজ কিছুতেই বনজ্যোৎস্নার কল্পনা-পুষ্প হইতে, আর এক ফোঁটা বন্য-মধু নিংড়াইতে পারিলেন না! বনজ্যোৎস্না যা বলিল, তার সার মর্ম্ম মোটামুটি এই ঃ—আমার ছোট্ট শিশিটাতে ভাবের গন্ধ একটু বই তো নয়! এত বড় গল্পের ক্লান্তিকর দৈর্ঘ্য-প্রস্থের মাঝে তার সবটুকু সুঘ্রাণ একেবারে উড়ে গেছে! এখন ভাবের দিক্‌টা একেবারে নীরস হয়ে পড়েছে, দিন কয়েক বিশ্রাম ক'রে নেই আগে! ভাব কিছু জমা হোক, তার পর দেখা যাবে এখন। মোদ্দা, কাজ করিবার ইচ্ছা না থাকিলে, ওজুহাতের অভাব হয় না!

এযাত্রা শুধু গায়ের জোরে ভবতারণ বাবু বিদ্রোহী স্ত্রী-চরিত্রকে আপন ইচ্ছাধীন করিতে পারিলেন না। এ বিষয়ে ঠেকে শেখার অভিজ্ঞতাটুকু ভবতারণ বাবুর জীবনে এই প্রথম! জেদের মাত্রাটা আরও একটু চড়াইবার মতলব ছিল, কিন্তু মেয়ে-সাহিত্যিকদের সঙ্গে এ সব ব্যাপার লইয়া বাড়াবাড়ি করাটা শোভা পায় না; সুতরাং সে যাত্রা তাঁকে নিতান্তই হার মানিয়া ফিরিয়া যাওয়া বই আর উপায় ছিল না। ভবতারণ বাবু ঘরে ফিরিলেন বটে,—কিন্তু 'নবপ্রভা'কে লইয়া ভারি দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়িয়া গেলেন। রাত্রিতেও ঘুমের বড়ই

ব্যাঘাত হইতে লাগিল। গিরীশ ডাক্তারের ব্যবস্থা মত, কয়েক ডোজ অকৃত্রিম আশু ঘুমের ঔষধ খাইয়াও বিশেষ কোন ফল হইল না!

সে যা হোক, 'নবপ্রভা'র ফাল্গুনের সংখ্যা 'বন্য-মধু'র সুধারসে বঞ্চিত হইয়াই প্রকাশিত হইল। "গতস্য শোচনা নাস্তি"—কিন্তু যাতে চৈত্রের মধুমাসে 'বন্য-মধু' আবার 'নবপ্রভা'কে সরস করিয়া তোলে, তার ফন্দি আঁটিবার জন্য সম্পাদক দুর্ভাবনার নীল-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

ঘসিতে ঘসিতে পাথরও ক্ষয় হয় এবং ভাবিতে ভাবিতে মুস্কিল-আসানের চেরাগের আলো লাগিয়া সহসা ধাঁ করিয়া একটা নূতন ফন্দি ভবতারণ বাবুর মাথার ভিতর খেলিয়া গেল। তিনি মনে মনে খুসী হইয়া বলিলেন, যদি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সদ্য প্রস্ফুটিত বন-ফুলের সৌরভ শিশিতে আটক করিয়া রাখা সম্ভব হয়, তবে এ ফন্দিতে 'বন্য-মধু' আর না চুয়াইয়া যায় না! জটিল স্ত্রী-চরিত্রের আর একটা গুপ্ত রহস্য-দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল মনে করিয়া, ভবতারণ বাবু আপনা-আপনি হাসিয়া উঠিলেন। তাঁর উচ্চ হাসিতে দপ্তরখানায় কাচের আলমারীগুলো চড়্ চড়্ করিয়া উঠিল!

[২]

বিকাল বেলা ভবতারণ বাবু 'নবপ্রভা'র আপিসে বসিয়া কতকগুলি প্রুফ-সীট্ দেখিতেছিলেন, এমন সময় তরুণ কবি নলিনবিহারী হেলিতে দুলিতে হাসি-মুখে সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন;—

"এই যে ভবতারণ বাবু এখানেই! হঠাৎ তলপ্ কেন বলুন দেখি! 'অতিশয় অসময়ে অভাজন পরে, অযাচিত অনুগ্রহ'!"

ভবতারণ বাবু মৃদু হাসিয়া গোঁফ জোড়াটা বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—

"আস্তে আজ্ঞা হোক, নলিন বাবু! বলি, কবি-লোক হ'লে কি একেবারে ডুমুর ফুলটী হ'তে হবে! সম্পাদক বেচারীদের অন্ততঃ মাসে মাসে পায়ের ধূলোটা আস্টা দিতে হয় তো!"

ইতি পূর্ব্বে, ভবতারণ বাবুর দরবারে, নলিনবিহারী কখনো কল্কে পান নাই! তাই আজকার আশাতিরিক্ত সমাদর পাইয়া নলিনবিহারী মনে করিলেন, এতদিন পরে যে খাঁটি কবিত্বের দিকে সম্পাদকদের ঝোঁক পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, বাংলা সাহিত্যের সেটা একটা ভারি সুলক্ষণ! তাই খুব খুসী হইয়া বলিলেন ;—

"আজ কাল একটা বড় রকমের খণ্ড-কাব্য নিয়ে পড়া গেচে, ভবতারণ বাবু! তাই বড় একটা বেরুতে টেরুতে পারি না! ঠিক করেচি, এবারের বসন্তকালটা যেন নিতান্ত মাঠে মারা না যায়!"

ভবতারণ বাবু অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত বলিয়া উঠিলেন ;—

"বড় সুসংবাদ! আপনারা সাহিত্যের জন্য এমন খাট্‌বেন শুন্‌লে, আমাদের বড় আশা হয়। ভবিষ্যত তো আপনাদেরি পানে তাকিয়ে আছে! এরি মধ্যে কাব্য-সাহিত্যে আপনার প্রতিভার মার্কা পড়ে গেছে। তা ছোট কবিতার খাতাখানি নিয়ে আস্তে লিখেছিলাম,—সেটী আনা হয়েচে কি?"

নলিন বাবু পকেট হইতে, অতি সন্তর্পণে, একখানা নীল কাগজের পুরু মলাট দেওয়া খাতা বাহির করিয়া, সম্পাদকের টেবিলের উপর রাখিয়া বলিলেন,—

"আন্‌বো না!—বলেন কি? আমার যতগুলি ভাবের শিশু এ পর্য্যন্ত জন্ম-গ্রহণ করেচে, তাদের সকলেরি ফটো এই খাতা খানায় রেখে দিয়েচি!"

ভবতারণ বাবু অত্যন্ত গরজের সহিত বলিলেন;—

"বেড়ে হয়েচে, ওদের জন্যে পুরু এন্টিক কাগজে পাইকা অক্ষরে ছাপা, রেশমী কাপড়ে বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা, এই সব সাজ-পোষাকের বন্দোবস্ত করে দিচ্চি আমি, যদি আপনি দয়া ক'রে আমার জন্যে একটী কাজের ভার নেন"—

"সে কথা আর বল্‌তে, আপনি বলুন না, কি কর্‌তে হবে!"

"আপনার মত কবির পক্ষে সেটা এমন কিছুই কঠিন কাজ নয়, হপ্তায় তিনটী ক'রে আমায় সনেট্‌ লিখে দিতে হবে।"

"চমৎকার, তার জন্যে আবার অত ভনিতা কচ্চেন কেন? কি ভাবের কবিতা চান আপনি?"

"যে ভাবের কবিতা সকলের চাইতে লেখা সোজা!—"

"প্রেমের কবিতা?—তা বেড়ে ফরমাস্‌ কিন্তু! রাগাত্মিক ভাবে, না বিয়োগান্তক ভাবে লিখ্‌তে হবে?"

"সম্প্রতি পূর্ব্বরাগটাই চালাবেন! তবে সঙ্গে সঙ্গে রূপ-বর্ণনার দিকে বিশেষ ঝোঁক থাকে যেন! লিখ্‌তে হবে একটী সুন্দরীকে লক্ষ্য ক'রে!"

"একটী সুন্দরীকে লক্ষ্য ক'রে!—কেমন ধারা সুন্দরী?"

ভবতারণ বাবু কবির অদ্ভুত জেরায় একটু বিরক্ত হইয়াই জবাব দিলেন,—

"এই ধরে নিন্ না ম'শায়, চন্দন-সই গোছের। উপমাটার বেজায় বাড়াবাড়ি কর্‌বেন না!"

নলিন বাবু রঙীন আকাশের পানে উদাসভাবে তাকাইয়া, ধীরে ধীরে বলিলেন;—

"ওঃ বুঝেছি, হৃদয়ের সৌন্দর্য্য তাঁর বাইরের সৌন্দর্য্যের কাছে পরাভব মানে নি!"

ভবতারণ বাবু, রুদ্ধ হাসিটাকে বহুকষ্টে চাপা দিয়া বলিলেন;—

"ঠিকটী ধরেচেন ম'শায়! ধন্য বাহাদুরী আপনার! রূপের দিকে বেশী না দিয়ে হৃদয়ের দিকেই ঝোঁক্‌টা দেবেন বেশী!"

নলিন বাবু, ভাবের নেশার মত্ততা আরো কিছু চড়াইয়া লইয়া, অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত ভাবে বলিলেন;—

"বুঝেছি,—সব বুঝেছি ভবতারণ বাবু। বাহিরে তার নীল, কিন্তু হৃদয়খানি তারায় তারায় শোভাময়!"

এই বলিয়া তরুণ কবি মধুকরের মত গুণ্ গুণ্ স্বরে গান ধরিলেন;—

"বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে,
কোথা হ'তে এলে তুমি হৃদি-মাঝারে।
ঐ মুখ, ঐ হাসি—"

ভবতারণ বাবু কবির উৎকট ভাবের দিক্‌বাজি-খেলা আর বরদাস্ত করিতে না পারিয়া, গানটার মাঝ খানেই রস-ভঙ্গ করিয়া দিয়া, একেবারে চিৎকার করিয়া বলিলেন;—

"আসুন, আসুন নলিনবিহারী বাবু, আর কথায় কাজ কি!

ঠিকটী মিলে যাচ্চে, ভারি চমৎকার তো দেখ্‌চি আপনার কল্পনা-শক্তি! এই ধরণের হ'লেই চল্‌বে।"

• সম্পাদকের রকম-সকম দেখিয়া, নলিনবিহারী বাবু কয়েক ঘাট খাদে নামিয়া, খানিকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন ;—

"যাক্, বিষয়টা একরকম আঁচ্ করা গেল! শুধু একটা কথা আমায় বলে দিন আপনি,—চোকের রংটা কেমন ধারা,—সদ্য অপরাজিতার রং, না সজল মেঘের স্নিগ্ধ আবছায়া জড়ানো"—

বলিতে বলিতে কবির মুখের কথা আবার ভাবের জড়তায় অস্পষ্ট হইয়া উঠিবার মত হইয়া দাঁড়াইল!

সেটা লক্ষ্য করিয়া ভবতারণ বাবু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন ;—

"সেটা তত ভাল করে দেখা হয়নি। খোঁজ করে কাল আপনাকে লিখে জানাবো এখন!"

নলিনবিহারী ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন ;—

"তা হ'লেই চল্‌বে এখন। কিন্তু যা-ই বলুন আপনি, বিষয়টার সৌন্দর্য্যে আমি একেবারে ডুবে গেছি! ছন্দটা যেন আমার বুকের ভিতর দুলে দুলে উঠ্‌চে!"

ভবতারণ বাবু কাব্যের এমন উৎকট উচ্ছ্বাস আর কিছুতেই সহিতে পারিলেন না। তাই এবার একেবারে চেয়ার হইতে অসহিষ্ণু-ভাবে উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন ;—

"তা হলে আর দেরী কর্‌বেন না, উদ্দীপনা থাক্‌তে থাক্‌তে লেখা সুরু করে দেয়া ভালো! কাল দুপুরে যেন একটা 'সনেট' পেতে পারি!"

কবির হৃদয়টা তখনো সত্ত গ্লাসে ঢালা, তেজস্কর মদ্যের মত, ভাবের রঙীণ বুদ্বুদে ভরিয়া গিয়াছে! ভাবের মত্ততায় চলিয়া যাইবার সময়, নলিনবিহারী ভবতারণ বাবুকে একটা নমস্কার করিয়া যাইতেও ভুলিয়া গেলেন!

নলিনবিহারী চলিয়া গেলে ভবতারণ বাবু মনে করিলেন, "ঠিকটী জুটেচে এদ্দিন পর! সপ্তাহে তিনটী করে এমনধারা বেনামী কবিতা বন-জ্যোৎস্নাকে পাঠাতে পার্‌লে, তার কল্পনা এমন সতেজ ও পুষ্ট হয়ে উঠ্‌বে যে—চাইকি, 'বন্য-মধু'র বাকী ক'টা পরিচ্ছেদ শেষ কর্‌তে তার মাসেকও লাগ্‌বে না!"

এই নূতন আবিষ্কারের তরুণ আনন্দে সম্পাদকের মানসিক উৎকণ্ঠা অনেকটা কাটিয়া গেল। কথিত আছে,—পুরাকালের মানুষদের এই রকম দু'চারটা ভুলের নমুনা পাইয়াই চিত্রগুপ্ত মহাশয় ভবিষ্যতের মানুষের অদৃষ্ট লিপি এমন নির্ভুল করিয়া লিখিয়া রাখিতে পারিয়াছেন। কারণ, মানুষের চরিত্র মোটামুটী হিসাবে চিরকাল এক ছাঁচেই গড়া হইয়া আসিতেছে!

[৩]

নলিনবিহারী বাবু বাসায় ফিরিয়া, আদা জল খাইয়া রাত জাগার পালা সুরু করিয়া দিলেন। একেই কবিকুলের অকারণ দুঃখবোধের নাড়ীটা বিশেষ টনটনে। তার উপর, নলিনবিহারী বাবুর একটা সকারণ দুঃখের ছিট্ যে না ছিল, তা নয়। নলিনবিহারী একটী বালিকাকে গোপনে গোপনে ভালবাসিতেন। কথাটা কাউকে খুলিয়া না বলিলেও, তাঁর চাপা প্রেমটা কবিতার ভিতর অনেক দিন ধরিয়াই গুমরাইতেছিল। সে যখন সেদিন নীরদ লাহিড়ী উকীলের দ্বিতীয়

পক্ষের স্ত্রীরূপে, হঠাৎ স্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া দিয়া, পাল্কীতে চড়িয়া শ্বশুর বাড়ী চলিয়া গেল, নলিনবিহারী তখন ভারি মুসড়াইয়া গিয়াছিলেন। নায়িকা চলিয়া গেল বটে, কিন্তু নলিনবিহারীর ব্যথিত ভালবাসাটা, তার হৃদয়ের চারিদিকে, আকাশের জ্যোৎস্না-সিক্ত মেঘের মত, যেন অত্যন্ত মধুর হইয়া লাগিয়া থাকিল! সে দুঃখের মেঘখানি আজ আরেক অজানা সুন্দরীর রূপের আলো পড়িয়া হঠাৎ গোলাপী হইয়া উঠিল। সে রাত্রিতে তিনি হৃদয়ের সুখ দুঃখ, মথিত করিয়া যখন সনেটরূপে, সে অদৃশ্য সুন্দরীর পূজার অর্ঘ্য-রচনা সমাপ্ত করিলেন, তখন গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিয়া গেল।

পরদিন সকালে, রাতজাগার পাণ্ডুর চিহ্ন মুখে লইয়া, ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখে, সনেট লেখা কাগজখানি হাতে করিয়া, নলিনবিহারী ভবতারণ বাবুর মজলিসে আসিয়া হাজির! ভবতারণ বাবু তখন সবে আপিস ঘরে ঢুকিয়াছেন মাত্র। নলিন বাবুকে দেখিয়া, স্মিত-মুখে বলিয়া উঠিলেন,—"এরি মধ্যে লেখা হয়েচে,—বটে!"

"আজ্ঞে। তা ইন্‌স্পিরেসন্ হলে আর কতক্ষণ!—এই নিন্ না।"

নলিনবিহারী কাগজখানা ভবতারণ বাবুর হাতে দিতে যাইতে-ছিলেন ভবতারণ বাবু তা'তে বাধা দিয়া বলিলেন,—

"না না, আপনি পড়ুন, আমি শুনি,—কবির নিজের মুখে না শুন্‌লে, আজকালকার কবিতা ভাল করে বোঝা যায় না।"

নলিন বাবু কপালের উপর হইতে, কোঁকড়ান চুলের গোছা বা হাত দিয়া সরাইয়া, গলা কাঁপাইয়া, অস্বাভাবিক মেয়েলি সুরে, পড়িতে লাগিলেন;—

"মনে পড়ে কবে যেন কোন জন্মান্তরে,
তোমাতে আমাতে দেখা হয়েছিল প্রিয়া,—
রেখে গেছ, বুকে মোর, স্মৃতির মাঝারে,
আরক্ত মঞ্জুল তার গোলাপের ছায়া !"

ভবতারণ বাবু হাসিয়া বলিলেন ;—

"আর পড়্‌তে হবে না। খাসা হয়েচে,—দিব্যি গোলাপের ছায়া পড়েচে। সমুখের সনেটে যেন একটু সস্তা রকমের ফুলের গন্ধ থাকে, মোদ্দা, বেশী দামী ফুলের দিকে যাবেনি না ! হেনা, চেরীর কথা মুখেই আন্‌বেন না।"

নলিনবিহারী বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িয়া বলিল ;—

"কবিতা বনিতাচৈব আয়াতা রসদায়িকা !" এসব বিষয়ে সম্পাদ-কেরা বড্ডো আটোক্রেসী দেখাতে চান ! তাতে অনেক সময় ভাল জিনিষও খেলো হয়ে পড়ে।"

ভবতারণ বাবু একটু নরম হইয়া বলিলেন ;—

"সে কথা আপনারা বল্‌তে পারেন আবশ্যি। ফুলের চাষে আগাছা বাছ্‌তে গেলে কবিরা বড্ডো চটে যান। আমি আর কোনো ফর্‌মাশ কর্‌বো না ! শুধু চোখের বর্ণনাটায় যত বেশী নীল গুলে দিতে পারেন, দেবেন ! সে বিষয়ে উপমার কিছু বাড়াবাড়ি হলেও ক্ষতি হবে না ! কাব্য-জগতে অত্যুক্তিটাকে একটা অলঙ্কার বলে সাহিত্য-দর্পণ ব্যাখ্যা করেচেন !"

চোখের কথা উঠিতেই, নলিনবিহারীর মন স্নিগ্ধ-দৃষ্টির কোমল রাজ্যে উড়িয়া গেল ! ভবতারণ বাবুর কথায় আর তাঁর

মন ছিল না। গতিক সুবিধা-রকম নয় দেখিয়া, ভবতারণ বাবু বলিলেন ;—

"আচ্ছা, এখন আপনি আসুন তবে। যাবার আগে দয়া করে ঐ ফুল-পাতার বর্ডার দেয়া কাগজ খানির উপর, খাসা করে, ভায়লেট কালী দিয়ে, কবিতাটী লিখে রেখে যান দেখি! দেখ্‌বেন, যেন নীচে আপনার নাম না থাকে।"

নলিনবিহারী বেশ ধরিয়া ধরিয়া, সুন্দর ছোট ছোট অক্ষরে, ডাক-কাগজখানির উপর কবিতাটী মুক্তার মত সাজাইয়া রাখিয়া, ভবতারণ বাবুকে নমস্কার করিয়া বিদায় হইয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে পর, ভবতারণ বাবু কবিতা-লেখা পুরু ডাক-কাগজখানি রাম-ধনুর রং-মাখানো এক খানা খামে পূরিয়া, শিরোনামাতে বনজ্যোৎস্নার নাম লিখিলেন। তার পর, গোলাপের কাঁটা-ভরা, পাতা-ঢাকা, কুড়ি-ধরা ডাল ভাঙ্গিয়া তার উপর চিঠি খানি রাখিয়া তার উপর আবার গোলাপ ফুলের চাপা দিয়া একটী ছোট জাপানী বেতের সাজি সাজাইলেন।

তার পর, মুটে ডাকিয়া সেটী বনজ্যোৎস্নার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। মুটেকে তিনি বার বার সতর্ক করিয়া দিয়া বলিলেন ;— "খবরদ্দার, আমার নাম, কি এ আফিসের খবর কিচ্ছু বলিস্‌ নি। চুপি চুপি চাকরের কাছে সাজিটী রেখে আস্‌বি, নৈলে জানিস তো, কার সঙ্গে আমার ইয়াকি! পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর,—আর কেউ নয়!" বেচারী থতমত খাইয়া ফুলের বোঝা লইয়া প্রস্থান করিল,— ফুলের বোঝার মজুরিটা পর্য্যন্ত চাহিতে সাহস করিল না!

এইটাই ভবতারণ বাবুর ষড়যন্ত্র। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, এমন গোলাপের সাজিতে অজ্ঞাত ভক্তের প্রেম ও ফুলের সহিত হৃদয়-নিবেদন পাইয়া, বনজ্যোৎস্নার হৃদয়ের রুদ্ধ কল্পনার ফোয়ারা নিশ্চয় আপনি খুলিয়া যাইবে। তার পর আরও কবিতা আরও ফুল, দিনের পর দিন অধিকতর কবিতা, মধুরতর ফুল—

এমন ভাবে অজানা ভক্তের নিত্য আবেগময় পুষ্প ও উন্মাদনাপূর্ণ প্রেমের অঞ্জলি পাইয়াও কি বনজ্যোৎস্নার ভাব ও ভালবাসা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিবে না! তাই যদি হয়, তবে 'বন্য-মধু'র বাকী ক'টা পরিচ্ছেদ শেষ করিতে আর কত ক্ষণ! সুতরাং সপ্তাহ দুই এই ভাবে অজস্র ফুল ও বেনামী প্রেম-কবিতা বর্ষণ করিয়া ভবতারণ বাবু পূরা-দমে বনজ্যোৎস্নার দুর্ব্বল হৃদয়-দুর্গের উপর বোম্বার্ড্‌মেণ্ট চালাইতে লাগিলেন!

[৪]

বিকাল বেলা বনজ্যোৎস্না তার বাড়ীর সংলগ্ন ছোট্ট বাগান-খানিতে একলা পায়চারি করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তার মুখের উপরকার রাঙা ছায়াটুকুর মাঝে, ডাগর ডাগর চোখ দুটীতে, কেমন একটা ভুলভুল উদ্‌ভ্রান্ত ভাব!—দেখিয়া মনে হয়, আজ যে বাগানের শ্যামল অঙ্গ ভরিয়া বসন্তের ফুলের সাড়া পড়িয়া গেছে, ফাল্গুনের উতলা হাওয়ায় বাগানের সবুজ পত্র-পল্লবের ঘাগরীপরা গাছপালাগুলির ভিতরে যে একটা নাচনার ধূম পড়িয়া গেছে, তার ভিতর দিয়া যেন বনজ্যোৎস্নার হৃদয়ের আনন্দের রাগিণী ও ছন্দটুকুই রূপান্তরিত হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল! এমন মধুর ভাব-রাজ্যের মধ্যে বনজ্যোৎস্না

যখন একলা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, এমন সময় সহসা পিছন দিক হইতে ভবতারণ বাবুর আগমন-সূচক কাশি-ধ্বনি শুনিয়া, প্রথমে সে একেবারে চমকিয়া উঠিয়াছিল। কারণ, যে দেশে সে তখন বেড়াইতেছিল, সে দেশে এমন মোটা গলার নীরস ধ্বনির স্থান ছিল না। সে থতমত খাইয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইতেই, ভবতারণ বাবু সমুখের দিকে অগ্রসর হইয়া হাসি-মুখে বলিলেন ;—

"আজকে আপনাকে এমন করে একলা ফুল-বাগানে দাঁড়িয়ে ভাবতে দেখে 'বন্য-মধু'র বিষয়ে আমি এক রকম নিশ্চিন্ত হ'লুম! এ ক'দিনে অনেকটা এগিয়েচেন বোধ করি!"

বনজ্যোৎস্না ক্লান্তভাবে ছোট্ট রকম একটা হাই তুলিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল ;—

"না, ভবতারণ বাবু, মনটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেক্‌চে, আজ ক'দ্দিন থেকে কাজে হাত দিতে পাচ্চি কই? 'বন্যমধু'র আর এক পরিচ্ছেদও লিখ্‌তে পারি নি।"

সংবাদটা সম্পাদক মহাশয়ের পক্ষে সম্পূর্ণ বজ্রাঘাত তুল্য! তাই তিনি একেবারে ঘাব্‌ড়াইয়া গিয়া অত্যন্ত অস্থিরভাবে বলিয়া উঠিলেন ;—

"দোহাই আপনার! আমাদের অনুরোধে না হোক, অন্ততঃ সাহিত্যের খাতিরে ওটা আপনাকে করে দিতে হচ্চে—"

বনজ্যোৎস্না সম্পাদকের এতটা আগ্রহ দেখিয়াও, কোনও রূপ উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া নাতিদীর্ঘ রকমের একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল ;—

"নিজের মনের উপর তো আর কা'রো জোর জুলুম খাটে না! কি আর কর্‌বো, বলুন!"

সম্পাদক মহাশয় নিতান্ত হতাশ ভাবে বলিলেন ;—

"তবে 'বন্য-মধু'র কি উপায় হবে?"

বনজ্যোৎস্না একটু ম্লান হাসিয়া বলিল ;—

"সে ভারটা আপাততঃ কিছুদিনের জন্যে মৌমাছিদের উপর রেখে দিন না"—

"তাতে তো আর পাঠক-পাঠিকাদের থামিয়ে রাখা যাবে না! তারা যে একেবারে 'বন্য-মধু' 'বন্য-মধু' বলে ক্ষেপে উঠেচে!"

বনজ্যোৎস্না একটা রাঙ্গা গোলাপের পাঁপড়ি ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে বলিল ;—

"তাঁদের জন্যে আমি যে আর কিছু করে উঠ্‌তে পারবো, সে ভরসা হচ্চে না। তবে দরকার হ'লে গভরমেণ্টে তাদের জন্যে নতুন পাগলা-গারদ খুল্‌তে দরখাস্ত দিন্‌ না!"

"দেখুন, আমাদের বাংলা সাহিত্যের কি আপনার উপর কোনো দাবীই নেই?"

বনজ্যোৎস্না একটু মধুর হাসিয়া বলিল ;—

"তার দাবী শোধ করে করেই তো এখন একেবারে নিঃশেষ হয়ে ফুরিয়ে গেছি।"

"ও-সব কোনো কাজের কথা নয়। আমার মনে হয়, আপনার কোনো রকম অসুখ অশান্তি হয়েচে।"

বনজ্যোৎস্না হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর একটু তামাসা করিয়া বলিল ;—

"তবে আর কথা কি,—একটা প্রকাণ্ড রি (Re) লিখে দিয়ে প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন্‌টা শুদ্ধু করে ফেলুন—অষুধটা আর বাকী থেকে যায় কেন ?"

"তেমন সোজা ব্যামো বলে তো মনে হচ্চে না। ডাক্তারদের নিদানে এ রোগের কোনো অষুধ লেখে না। কাজেই সরকারী হাঁসপাতালে কিম্বা বেসরকারি অষুধের দোকানে এ রোগের কোন অষুধ মিল্‌বে না ! কারণ, আপনার ব্যারামটা সম্পূর্ণ মানসিক। তবে শোনা যায়, স্বপ্নে নাকি অনেক সময় অনেক আশ্চর্য্য অষুধ লোকে পেয়ে থাকে !"

ভবতারণ বাবুর বাক্য-বাণ যখন এমন সাঙ্ঘাতিক ভাবে ঠিক লক্ষ্যটী ভেদ করিয়া চলিয়া গেল, তখন বনজ্যোৎস্নার মুখ একেবারে লাজে লাল হইয়া উঠিয়াছে। তাতে মনের অবস্থাটার অনেকখানি ধরা পড়িয়া গেল। তবু স্ত্রী-জাতি-সুলভ উপস্থিত-বুদ্ধির সাহায্যে, মনের ভাব একটু ম্লান হাসির নীচে চাপা দিয়া, সে বলিয়া উঠিল ;—

"আমার কথা বলচেন্ ?—আপনি কি ক্ষেপেচেন্ ?"

সম্পাদক একটু রহস্য করিয়া বলিলেন ;—

"তা ঠিক্ বল্‌তে পাচ্চি না। কিন্তু পাঠক-পাঠিকারা আমায় ক্ষেপিয়ে তুল্‌তে, একটুও কসুর কচ্চে না।"

বনজ্যোৎস্না একটু অন্য-মনস্ক ভাবে বলিল ;—

"তাইতো দেখ্‌চি, এখন কি করা যায় একবার ভেবে দেখ্‌বো এখন। দু'টো বুঝি বাজলো ভবতারণ বাবু !"

ভবতারণ বাবু চালাক লোক, নিজে ব্যবসা করিয়া খান, সুতরাং এই "ভেবে দেখা" ও "করে দেখা"র মধ্যে যে কতটুকু ব্যবধান, তা তিনি বুঝিলেন। ঘড়ি দেখার প্রস্তাবের মধ্যে যে তাঁর জন্য একখানা সুমধুর অর্দ্ধ-চন্দ্র প্রদানের সাধু ইচ্ছাও প্রচ্ছন্ন ছিল, সেটা আঁচ্ করিতেও তাঁর বেশী দেরী হইল না। তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন ;—

"তাই তো, দু'টো বেজে গেছে দেখ্‌চি, আমিও আজ তবে আসি এখন! তবে আর একটা মতলব নিয়ে এসেছিলাম, আজকে—"

বনজ্যোৎস্না বলিল ;—

"কি রকম, বলুন দেখি!"

"আপনি জানেন কিনা বল্‌তে পারি না,—একটী নতুন কবি আপনার 'বন্য-মধু' পড়ে, একেবারে মুগ্ধ হয়ে পড়েচেন। আজ ক'দিন হ'লো আমাদের আপিসে এসে তিনি আপনার নাম ও ঠিকানা নিয়ে গেচেন। কাল আবার এসে আমার কাছে একেবারে ধন্না দিয়ে পড়েচেন,—একবার আপনার সঙ্গে যাতে তাঁর দেখা হয়,—আপনার যদি কোনো আপত্তি না থাকে অবিশ্যি।"

কবির নামে কবিতা ও ফুলের উপহারের সুমধুর কাহিনীখানি হঠাৎ বনজ্যোৎস্নার মনে পড়িয়া গেল। বসন্তের হাওয়া-লাগা বন-লতাটীর মত একটু অধীরভাবে আন্দোলিত হইয়া, সে সুধা-মাখা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল ;—

"কবি—কে তিনি?"

কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া, সে আবার ভবতারণ বাবুর মুখের পানে চাহিল। সে অধীর আয়ত দৃষ্টি লজ্জা ও ঔৎসুক্য মাখা!

ভবতারণ বাবু মাটি হইতে কয়েকটা ছেঁড়া ফুলের পাপড়ি কুড়াইয়া লইয়া বলিলেন ;—

"নাম তাঁর নলিনবিহারী, নূতন কবি, 'কবিতা ও ফুল' নামে তাঁর কবিতাগুলো আমাদের প্রেসে ছাপা হচ্চে !"

কবিতা ও ফুলের নামে, অদৃশ্য কবির পানে বনজ্যোৎস্নার কৌতুহল সহসা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। সেটা আড়াল দিবার চেষ্টায় সে একটা গন্ধরাজ গাছের ডাল হইতে কতকগুলি পাতা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে বলিল ;—

"তা বেশ তো, তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়াটা তো আমি সৌভাগ্য মনে করি। 'বন্য-মধু' সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গেও একবার পরামর্শ ক'রে দেখ্‌তে পারি।"

এবার খুব উৎসাহের সহিত ভবতারণ বাবু বলিলেন ;—

"তাহ'লে আস্‌চে শনিবার তাঁকে নিয়ে আস্‌বো ?"

বনজ্যোৎস্না একটু লাল হইয়া উঠিয়া বলিল ;—

"তা বেশ তো।"

ভবতারণ বাবু আবার 'বন্য-মধু' সমাপ্ত হইবে, এই আশার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে বাড়ী ফিরিলেন। ভাবিলেন, এতদিন পরে যে ষড়যন্ত্রটা ফলনোন্মুখ হইয়াছে, সে ও মন্দের ভাল !

[৫]

বসন্তের সুমিষ্ট হাওয়া বাগানের ফুল-পাতা কাঁপাইয়া শির্‌শির্ করিয়া বহিতেছিল। চারিদিক হইতে মত্ত মধুপের অস্ফুট গুঞ্জন-ধ্বনির মাঝে কোকিলের কুহু-তান, শিশির-সিক্ত আম্র মুকুলের স্নিগ্ধ গন্ধের সহিত

বাতাসের তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া বনজ্যোৎস্নার ঘরখানিকে বসন্তের রঙীন স্বপ্নে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছিল। এমন সময়, রঙ্গ-ভূমির উপর হইতে যবনিকা উঠিয়া গেল,—নলিনবিহারী লজ্জিতভাবে বনজ্যোৎস্নার ঘরে প্রবেশ করিলেন।

নলিন বাবুকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িবার সময় বন-জ্যোৎস্নার খোপা হইতে বেনামী সনেট সমেত কয়েকটা গোলাপ-ফুল নলিনবিহারীর সম্মুখে ঝরিয়া পড়িয়া কবির অভ্যর্থনাটীকে যথার্থই কাব্যময় করিয়া তুলিয়াছিল। নলিন বাবুর কিন্তু সে সময় কাব্যের প্রতি কিছুমাত্র খেয়াল ছিল না। কাগজ ক'খানা ও ফুলগুলি কুড়াইয়া লইয়া, সেগুলি মালীককে ফেরৎ দিয়া তার মনোরঞ্জন করিবার জন্যই তখন তিনি অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেটা কার্য্যে পরিণত হওয়ার পূর্ব্বেই, বনজ্যোৎস্না কাগজ ও ফুল ক'টা চট্‌ করিয়া কুড়াইয়া লইয়া, নলিন বাবুর ব্যস্ততাটা উদ্যোগ-পর্ব্বেই একরকম মাটী করিয়া দিল! এত বড় সুযোগটা এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে মাঠে মারা গেল দেখিয়া, নলিন বাবু অপ্রতিভ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন,—এমন সময় বনজ্যোৎস্না প্রচুর ভদ্রতার সহিত কবির পানে সহাস্য কটাক্ষপাত করিয়া বলিল,—

"বস্‌তে আজ্ঞা হোক্!"

বনজ্যোৎস্না আরেকখানা চেয়ারের হাতার উপর তার পদ্মের মৃণালের মত হাতখানা সুললিত ভাবে আলগোছে রাখিয়া দিয়া, এমন সুন্দর কায়দা করিয়া দাঁড়াইল যে এটিকেট বে-দুরস্ত কোন সেকেলে লোক দেখিলে মনে করিতে পারিত, সে বুঝি ফটো তুলিবার জন্য

দাঁড়াইয়াছে! ফুর্‌ফুরে লেস্‌ ও ফ্রিলের প্রগল্‌ভ আলাপে, চুড়ির সলজ্জ-মধুর আওয়াজে, টেবিল-স্থিত ফুলদানীতে রাখা ফুলের তোড়ার উদ্ভ্রান্ত মধুর গন্ধে তখন, সকাল বেলাতেই, নলিনবিহারীর চোখে যেন মধ্য-নিদাঘের নিশীথ স্বপ্নখানি উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিতেছিল!

বনজ্যোৎস্না দাড়াইয়া থাকিতে নিজে আগে চেয়ারটা দখল করিয়া বসিয়া পড়িবেন, নলিন বাবু ততটা অসভ্য নয়। কিন্তু চেয়ারে বসিতে নলিন বাবুকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া বনজ্যোৎস্না একটু মুচ্‌কে হাসিয়া বলিল;—

"দাঁড়িয়ে রইলেন যে,—ছারপোকার ভয় হচ্চে বুঝি?"

নলিনবিহারী সার্টের গলার কাছের বোতামটা স্নায়বিক উত্তে-জনার সহিত অস্থির ভাবে ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিলেন,—

"না, আপনি বসুন আগে,—"

বনজ্যোৎস্না তখন একখানা চেয়ারের উপর সটান বসিয়া পড়িতেই নলিন বাবু বেতের চেয়ার খানাতে ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িলেন! এমন "বিনা ওজরে আজ্ঞাকারী" ভক্ত কবির সাক্ষাৎ পাইয়া বনজ্যোৎস্না যে খুসী হইয়াছিল সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

নলিন বাবু আরক্ত মুখখানা নত করিয়া মেঝের পানে চাহিয়া থাকিলেন। সহসা মুখ ফুটিয়া কথা বলিতে পারিতেছিলেন না। বনজ্যোৎস্নাও কি করিয়া কোন কথা পাড়িবে, তার কোন দিশা না পাইয়া, চুপ করিয়া থাকিল। তারা দুটী যেন বায়স্কোপের ছবি,—অভি-নয়টা তাই যেন অত্যন্ত নিঃশব্দে চলিয়াছে। সে সময়, তাদের

সঙ্কোচ ও নীরবতা ভঙ্গ করিয়া দিয়া, পাশের বাড়ী হইতে একখানা মেয়েলি গলা হার্ম্মোনিয়ামের সঙ্গে মিশিয়া গাহিতেছিল,—

"আমার কুঞ্জ কুটীর দুয়ারে, অতিথি এসেছে আজ!"

গানের পদটা কাণে বাজিতেই আজ বনজ্যোৎস্নার অকারণে লজ্জা করিতে লাগিল। সে এ গান আরো অনেক বার শুনিয়াছে, কিন্তু গান শুনিয়া সে আর তো কখনো এমন লজ্জা অনুভব করে নাই! লাজটা ঢাকা দিবার জন্য সে এখন একটু পালাইয়া চোখের আড়াল হইলে বাঁচে। কিন্তু মুখ যে ফোটে না! শেষকালে অনেক কষ্টে, বহু চেষ্টার পর, আর কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া নখ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল,—

"আপনার জন্যে একটু চা করে নিয়ে আসি?"

কবি হাসি মুখে সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়িয়া এখন অনেকটা হাল্কা বোধ করিলেন। বনজ্যোৎস্নাও কথাটা বলিয়া যেন একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। মহামতি লিপ্‌টনের জয় হোক!—আজ এ বিপদের সময় লিপটনের চা সহায় না হইলে এই দুটী নর-নারীর দুর্গতির আর সীমা ছিল না!

যথা সময়ে গায়ে রং-বেরঙ্গের ফুল-পাতা-আঁকা চীনা-মাটির চা-পেয়ালাটী হাতে করিয়া বনজ্যোৎস্না পুনরায় রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল। তার হাত হইতে চা পেয়ালাটী লইবার সময়, বনজ্যোৎস্নার মুখখানার পানে তাকাইতেই নলিনবিহারীর দৃষ্টিটা সহসা অত্যন্ত সতৃষ্ণ হইয়া উঠিল। পেয়ালাটী হাতে ধরিয়া তুলিয়া দিবার সময় বনজ্যোৎস্নার হাত খানাও, বসন্তের মাতাল হাওয়ায় মাধবীলতার রাঙ্গা-ফুল-ফোটা শাখাটীর

মত হঠাৎ অত্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। এমন মধুর অবস্থা-সঙ্কটে সহজেই মহাকবি কালিদাসের কবিত্বময় ভাব-বর্ণনার কথাটা মনে পড়িয়া যায়,—

হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্ত ধৈর্য্যশ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।
উমা মুখে বিম্বাফলাধরোষ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি॥
বিবৃণ্বতি শৈলসুতাপি ভাবমঙ্গৈঃ স্ফুরদ্ বাল কদম্ব কল্পৈঃ।
সাবীকৃতা চারুতরেণ তস্থৌ, মুখেন পর্য্যস্ত বিলোচনেন॥

সে যা হোক, চা পেয়ালায় ঝড় তুলিয়া দিয়া, কেমন করিয়া মাধবী ফুলের আভা, আম্র-মুকুলের গন্ধ, ও জীবন্ত মানুষের হৃদয় এক সঙ্গে জড়াইয়া গেল, কেমন করিয়া দুটী মিলনোৎসুক হৃদয় প্রেমের নবারুণ প্রভায় প্রথম জীবনের অনাস্বাদিত মধু আস্বাদন করিল, সে কথা তিনিই ভালো জানেন, যিনি শিবের ত্রিনেত্র-নিক্ষিপ্ত সংহার-বহ্নিতেও কিছুমাত্র জখম না হইয়া অতি পুরাকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত নর-নারীর হৃদয়-রাজ্য একটী মাত্র ফুল-ধনুর জোরে শাসন করিয়া আসিতেছেন! শুধু তাই নয়,—আজ রেকাব, পেয়ালা ও চাম্‌চেতে মিলিয়া, ঠুন্ ঠুন্ করিয়া মধুর আওয়াজ দিয়া যে উৎসবের আভাসটী জাগাইয়া তুলিল, তাতে বিবাহ মজলিসের সানাইয়ের মুখে সাহানার মৃদু মধুর আলাপের কথাটাই ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে পড়ে!

'বন্য-মধু'র লেখিকার স্বহস্তে প্রস্তুত চা-টুকুর মধ্যে অতিরিক্ত মাধুর্য্য ছিল কিনা জানিনা, কিন্তু নলিনবিহারী একচুমুকে সব খানি নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন, তবু যেন তাঁর শুষ্ক গলাটা ভাল করিয়া ভিজিলই না! যে ক্ষেত্রে পিপাসাটা কেবল জিহ্বায় সীমাবদ্ধ নয়, সে খানে শুধু চা দিয়া পিপাসা মিটাইবার চেষ্টা করাটাই বনজ্যোৎস্নার পক্ষে

উচিত হয় নাই! তবু কবির পিপাসাধিক্য দেখিয়া বনজ্যোৎস্না একটু হাসিয়া বলিল,—

"আরেক পেয়ালা চা তৈরি করে আনি তবে?"

নলিনবিহারীর মুখ-চোখ ইস্তক চোখের পাতা শুদ্ধ লজ্জায় লাল হইয়া গেল। তিনি বেজায় অপ্রস্তুত ভাবে জবাব দিলেন,—

"মাপ করুণ! ঢের হয়েচে,—আর না!"

বনজ্যোৎস্না একটু ন্যাকা সাজিয়া বলিল;—

"চায়ে চিনি খুব বেশী দিয়েচি বুঝি?"

নলিনবিহারী অত্যন্ত অপ্রতিভ ভাবে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন;—

"সে জন্যে আপনি কিছু মনে কর্‌বেন না। চিনির উপর আমার ছেলেবেলা থেকেই ঘোরতর আসক্তি!"

বনজ্যোৎস্না এবার হাসিতে এক পশলা সুধা-বৃষ্টি করিয়া বলিল;—

"তা হলে আরেক পেয়ালা?"

নলিনবিহারী হাত জোড় করিয়া কাতরভাবে বলিলেন;—

"মাপ করুণ! তা হলে সারা রাত জেগে কাটাতে হবে এখন! চা খাওয়াটা আমার মোটেই অভ্যাস নেই!"

বনজ্যোৎস্না একটা কৃত্রিম অনুশোচনার ভাণ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল;—

"ওঃ! তবে আপনাকে চা দিয়ে তো ভারি অন্যায় করেচি!"

নলিন তাড়াতাড়ি সমুদয় ত্রুটীর বোঝা নিজের ঘাড়ে চাপাইয়া ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন,—

"না—না, বলেন কি আপনি! আমিই তো আপনার ঠেঙ্গে চেয়ে নিয়েচি, তা নৈলে কি আর আপনি দিতেন!"

চার রহস্য-প্রসঙ্গে দুজনার মনের কুণ্ঠা অনেকটা তরল হইয়া গেলে পর, বনজ্যোৎস্না আলাপের চাবিটা বিষয়ান্তরে ঘুরাইয়া দিয়া বলিল,—

"আপনি সাধারণতঃ কখন লিখে থাকেন?"

নলিন বাবু একটু প্রফুল্ল হইয়া বলিলেন,—

"গভীর রাত্রে; সেই সময় আমার flowটা বেশ আসে ভালো।"

"আমার কিন্তু ভোরের আলো না হলে লেখা টেথা কিছু আসে না!"

নলিন বাবু কিছু চমৎকৃত, কিছু খুসী হইয়া বলিলেন;—

"বাঃ! অত বড় কথাটা আমার মোটেই জানা ছিল না, কি আশ্চর্য্য! সেগুলো আমায় দেবেন তো একদিন। দেখে শুনে 'নবপ্রভা'য় দেয়া যাবে এখন!"

বনজ্যোৎস্না অবাক হইয়া বলিল;—

"'নবপ্রভা'য় যে আমি রীতিমত লিখে থাকি! কেন, আপনি আমার 'বন্য-মধু' পড়েন নি?"

নলিন, একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন;—

"কৈ,—মনে পড়্‌চে না তো!"

বনজ্যোৎস্না অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া গেল! কিছুক্ষণ পরে বলিল,—

"মাপ কর্‌বেন। আমি ভেবেছিলাম, পড়েচেন বুঝি! ভবতারণ

বাবুও তাই বলেছিলেন! তিনি আরো বলেছিলেন যে 'বন্য-মধু' পড়েই আমার উপর আপনার আজ এত অনুগ্রহ।"

নলিনবিহারী বাবু বনজ্যোৎস্নার কথা শুনিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। ব্যাপারখানা কেমন যেন আগা-গোড়া রহস্যময় বলিয়া ঠেকিতে লাগিল, অথচ সে রহস্যটা কিছুতেই ভেদ করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

এমন সময় বনজ্যোৎস্না একটু মুরুব্বিয়ানা ভাবে বলিয়া উঠিল,—

"আপনার সনেটগুলি কিন্তু ভারি চমৎকার হচ্চে'।—

নলিনবাবু আরো বিস্মিত হইয়া বলিলেন;—

"আমার সনেট! এখনো তো ছাপা হয়নি সেগুলো, প্রেশে কেবল দিয়েচি মাত্র! আপনি দেখলেন কি করে, বলুন দেখি!"

বনজ্যোৎস্না হেমন্তের বনজ্যোৎস্নারই মত অত্যন্ত ম্লান হইয়া গেল। কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অত্যন্ত ক্ষীণ ভাবে বলিল;—

"ব্যাপার আর কিছু নয় নলিনবাবু, ফুলের সাজিতে করে আজ ক'দ্দিন থেকে আমার কাছে কতগুলি ফুল ও কবিতার ঢেউ আস্‌চে! আমি ভাব্‌চিলাম সে গুলো বুঝি আপনারি স্নেহের দান!"

নলিনবিহারী বাবু বিস্ময়-বিহ্বল চোখে বনজ্যোৎস্নার পানে তাকাইয়া বলিলেন,—

"আমার দান! আমি তো কখনো আপনাকে কোন কবিতা বা ফুল পাঠাই নি! পাঠাতে পার্‌লে তো সেটা নিজের সৌভাগ্য ব'লে মনে কর্‌তুম! আচ্ছা, কবিতার এক আধটা নমুনা আমি দেখ্‌তে পারি কি?"

বনজ্যোৎস্না রাইটিং টেবিলের ড্রয়ার টানিয়া সুন্দর কাগজে নলিনবিহারীর নিজের হাতে লেখা কবিতাগুলি বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। নলিন তার মধ্যে একখানা তুলিয়া লইয়া হাত তাঁলি দিয়া বলিয়া উঠিলেন ;—

"এগুলো যে সবি আমারি হাতের লেখা! রচনাও আমারি! কিন্তু হলপ্ করে বলচি, এগুলো তো আমি আপনাকে পাঠাই নি! ভবতারণ বাবুর ফরমাশ্ মতো এগুলো তাঁর কাছে লিখে, রেখে আস্‌চি!"

বনজ্যোৎস্না গভীর মনোভঙ্গের সহিত একটা ব্যথিত দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল ;—

"ও সব তবে ভবতারণ বাবুর চালাকি! আমি—আমি ভাব্-ছিলাম কি,—আপনি বুঝি এগুলো সত্যি সত্যি আমারি উদ্দেশ্যে—"

নলিনবিহারী বাবু উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,

"সে কথা একটুও মিথ্যে নয়! এগুলো সবি আপনার উদ্দেশ্যে লেখা! আপনার সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না বটে, কিন্তু আপনার সুন্দর হৃদয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েচে—অদৃশ্য কল্পনার মায়া-রাজ্যে,—বোধ হয় জন্মান্তরেও হয়ে থাক্‌বে"—

এই বলিয়া তিনি ভাব-গদ্‌গদ কণ্ঠে তাঁর হাতের কাগজ হইতে সুর করিয়া গলা কাঁপাইয়া নিজের সনেটটী পড়িতে লাগিলেন,—

মনে পড়ে কবে যেন কোন জন্মান্তরে,
তোমাতে আমাতে দেখা—

চৌদ্দ অক্ষরের বাকী লাইনটা পড়িবার সময় নলিনবিহারীর

গলাটা বার বার আট্‌কাইয়া যাইতেছিল। এমন সময় বনজ্যোৎস্না একটু হাসিয়া বলিল ;—

"মানেটা ভালো করে বুঝে উঠ্‌তে পার্‌চি না. সোজা গদ্যে ভেঙ্গে বল্লে হয় না ?"

নলিনবিহারী বাবুর হৃদয়ের ফোয়ারাটা তখন পুরাপুরি খুলিয়া গেছে। তিনি খুব স্ফূর্ত্তির সহিত বলিলেন,—

"কবিতাগুলি যদিও ভবতারণ বাবুর ফরমাশ মতই আমি রচনা করেচি, কিন্তু আমি তাঁর মুখে শুনেচি, যে অদৃশ্য নারীকে কবিতা-গুলিতে ইঙ্গিতে লক্ষ্য করা হয়েচে,—সে আপনি ! ঐ লক্ষ্যটুকুই আমার কবিতার প্রাণ,—ফুলের সাজিতে করে, ফুল-চাপা দিয়ে, সেগুলো পাঠাবার সৌভাগ্যটা যদিও আমার হয় নি ! কিন্তু এ কবিতাগুলি তো আমারি অন্তরের নিবেদন, অঞ্জলির মতো আপনার রাঙ্গা পায়ের উপর এসে ঝরে পড়েচে ! আপনি কি তাদের গ্রহণ কর্‌বেন না ?—বিমুখ করে ফিরিয়ে দেবেন ?"

বনজ্যোৎস্না অভিমানটাতে কিঞ্চিৎ হাসি মাখাইয়া সংক্ষেপে জবাব দিল,—

"সে আলাদা কথা ! ভবতারণ বাবুর পক্ষে কাজটা কিন্তু ভারি অনুচিত হয়েচে !"

নলিনবিহারী কিন্তু ভাবের মত্ততা কাটাইতে না পারিয়া পূর্ব্ব-চিন্তার প্রতিধ্বনি করিয়া মাতালের মত বলিতে লাগিলেন,—

"নিশ্চয় ! তাতে কি আর সন্দেহ আছে ! আমার নিজের পক্ষেও ঠিক হতো কিনা, সন্দেহ ! কিন্তু ফুলের কি ফুল হওয়াটাই মানুষের

আনন্দের পক্ষে যথেষ্ট নয়! কোত্থেকে এলো, কেমন করে ফুটলো—তাতে কি আর তার ঘ্রাণ ও শোভার কিছু বাড়্তি কম্তি হবে?"

বনজ্যোৎস্নার নিজের স্তুতিবাদ শুনিয়া বেখুসী হইবার কোনও কারণ ছিল না। সে অস্ফুট ফুলের মতো রাঙ্গা ঠোঁট দুখানির উপর একটু সোণালি হাসি ছড়াইয়া দিয়া বলিল;—

"ভবতারণ বাবুর পক্ষে যা অনুচিত, তাতেই আজ আমাদের দেখা হবার সুযোগ ঘটেচে, তা অবিশ্যি মানি!"

ভাবোন্মত্ত নলিনবিহারী তরল বাগ্মিতার সরস উচ্ছ্বাস-তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে বলিলেন;—

"যে দেবতা, কার্য্য ও কারণের শুভ সূত্রের ভিতর দিয়ে আমাদের জন্যে আজ এমনতর মঙ্গলময় পরিণাম গড়ে তুলেচেন, মানুষ হয়ে কি তা আমরা মেনে নোবো না?"

নলিন নিজের কথার মদির ঝঙ্কারে নিজেই মুগ্ধ হইয়া গেলেন! সহসা বনজ্যোৎস্নার স্নেহ-বিহ্বল চোখ দুটীর পানে তাঁর চোখ পড়িল। সে চোখ দেখিয়া তাঁর মনে হইল সে যেন চোখ নয়,—নীল-স্নিগ্ধ সুধা-বিগলিত মমতার অকূল-জলধি! সে নীল সিন্ধু-জলে সোণার স্বপ্ন-জাল ছড়াইয়া দিয়া, যেন জাগিয়া উঠিতেছেন—তাঁর হৃদয়-কুঞ্জের অম্লান-যৌবনা সদ্য-স্নাতা কাব্য-লক্ষ্মী! আজ যেন নলিনের বহুকালের দুর্লভ স্বপ্ন মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁর কাছে আপনি যাচিয়া ধরা দিতে আসিয়াছে! নলিনের বারে বারে মনে হইতে লাগিল,—অথচ এই স্বপ্ন অঞ্চলার কমল-লাঞ্ছিত চরণ-তলে, তার নিজের দান করিবার মত ধন আজ কত তুচ্ছ, কত অকিঞ্চিৎকর!

মৃগনাভি

চারি চক্ষের মিলন হইল! বাহিরে বসন্তের পাগলা-হাওয়া বাগানে ফুল ফুটাইয়া ফুল ছড়াইয়া সহসা উদ্দাম উচ্ছ্বাসে বহিয়া গেল! তখন, সুসময় বুঝিয়া, প্রেমের অন্ধ দেবতা, ঘাসের সবুজ তৃণ হইতে ফুলের পঞ্চ-শর, আপনার বাসন্তী রঙ্গের ধনুকের ছিলায় আরোপিত করিয়া, হাসিতে হাসিতে সে মুগ্ধ স্ত্রী-পুরুষের উপর নিক্ষেপ করিলেন। সে অন্ধ দেবতার অব্যর্থ সন্ধান!—মুহূর্ত্তে দু'টী রাঙ্গা হৃদয় একটী তীরে বিদ্ধ হইয়া এক হইয়া গেল! * * * * *

এই ঘটনার এক সপ্তাহ পরে, ভবতারণ বাবু বনজ্যোৎস্নার যে চিঠিখানা পাইলেন, সম্পাদকের অনুমতি লইয়া সেখানা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"সুচরিতেষু,

.. ভবতারণ বাবু, 'বন্য-মধু'র আর কোন আশা নাই। 'বন্য-মধু'র যেটুকু ভাব-রাজ্য থেকে চুয়াইতে পারিয়াছিলাম, তা 'নবপ্রভা'কে দিয়াছি। আর দিবার মত কিছু নাই। নলিনবিহারী বাবু বলেন, এখন আমারো ছেলে মেয়েদের উপযোগী শিশু-সাহিত্য রচনা করিবার সময় হইয়াছে। আমারো সেই মত। তাই শিশু-সাহিত্য রচনায় নিজের ক্ষুদ্র শক্তি নিযুক্ত করিব, মনে করেচি।

ভাল কথা,—বলিতে ভুলিয়াছি, আজ সপ্তাহ কাল ধরে আপনার 'কবিতা ও ফুল' পাইতেছি না। থাক্, আর তাদের দরকার নাই। আপনার কি মতলব ছিল জানি না, কিন্তু প্রজাপতির শুভ উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। গতকল্য নলিনবিহারী বাবুর সঙ্গে আমার শুভ-

বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেছে। সে জন্য আমরা উভয়েই আপনার নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী!

আমাদের মিলনটী যেন সাহিত্যের অক্ষয় সৌন্দর্য্য ভাণ্ডারে পূর্ণতা লাভ করে, সে জন্য আপনি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।

আপনার স্নেহের শ্রীবনজ্যোৎস্না রায়।

ভবতারণ বাবুর সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া গেল! তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—হায় 'নবপ্রভা' হায় 'বন্য-মধু'!—

আমার,—"সেই সুখের সাগর শুকাইল—
এখন আমার মেঘের পানে, চাইতে হ'ল,—
তৃষিত চাতকের মত!"

বাস্তবিক স্ত্রী চরিত্র দেবতারও বুঝা ভার!

দর্পহারী ভগবান।

[১]

শ্রীযুক্ত হরকিশোর বাবু মফঃস্বলের এক সহরে মস্ত এক সাহেবের আপিসের বড় বাবু। তাঁহারই হাতে বড় বড় তিন তিনটা বিলাতী কোম্পানী ফেল পড়িয়াছে, সুতরাং ঘরে অখণ্ড মণ্ডলাকার রজত-খণ্ডের কোন অভাব ছিল না। তবে যে আজও, চাকুরী ইস্তফা দেন নাই, সেটা নিতান্ত সখ্ করিয়া নয়,—চাকরীর নেশাটা বংশানুক্রমে একেবারে মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া!

সে যা হ'ক, সম্প্রতি ঘরে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী লইয়া তিনি বড় গোলের মধ্যেই পড়িয়া গেছেন। বয়স বিয়াল্লিশ পার হয় নাই, এবং এ সম্বন্ধে কোষ্ঠী-পত্রে জ্যোতিষী-ঠাকুরের লিখিত সংবাদটা যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, এ কথাটা নূতন গৃহিণীকে বুঝাইয়া দিতে তিনি কখনো চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, অথচ ইহাতে যে একটা "কিন্তু"র গোলযোগ থাকিয়া যাইত, তাহা উভয় পক্ষের কাহারও মনের অগোচর থাকিত না; তাহা প্রমাণের জন্য বিশেষ সাক্ষী-সাবুদেরও প্রয়োজন ছিল না। কারণ, হৃদয়ে যৌবন-মত্ততার তরঙ্গ ছিল না। হরদম্ হাত পাখা চালাইয়াও মরা গঙ্গায় কিছুতেই ঢেউ উঠিত না।

মনের নদীতে এমন অবস্থায় ভাঁটার টান যখন অত্যন্ত প্রবল, তখন হরকিশোর বাবু মনের জিনিষ ছাড়িয়া দিয়া, দোকানের জিনিষ দিয়া, নব-যুবতীর মন হরণের জন্য অনেক প্রকারে চেষ্টা করিলেন। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হরকিশোর বাবু এ ক্ষেত্রে নিজের ত্রুটি কিছুমাত্র দেখিতে না পাইয়া, মনে মনে কেবল পত্নী লীলাকেই দোষী সাব্যস্ত করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, লীলা যেন হল্‌করা তাসের হরতনের বিবিটি,—তার রূপ আছে, যৌবন আছে, পারিপাট্যের বাহার আছে, কিন্তু হৃদয় নাই। তাহাতে ঘর সাজানো যায়, কিন্তু মন বসানো যায় না! তবু শরীরে যত দিন বল ছিল, বিশেষতঃ মনে যত দিন অহঙ্কার ছিল, তত দিন এক রকম কাটিয়াছে; কিন্তু এই ভাঁটির মুখে, হরকিশোর বাবু নিজেকে লইয়া নিজে বড় আরামে ছিলেন না!

"অজীর্ণে ভোজনং বিষম্" একথাটা ভুক্তভোগী হরকিশোর বাবুর ভাল রকম জানা ছিল। কিন্তু "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" যে অজীর্ণে ভোজন

অপেক্ষাও গুরুপাক পদার্থ, সেটা এখন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া, হরকিশোর বাবু ভারি কাহিল হইয়া গেলেন।

[২]

সে দিন হরকিশোর বাবু দুপুর বেলা ছেকৃড়া গাড়ীর ঘোড়ার মত ক্লান্ত দেহটাকে কষ্টে টানিয়া লইয়া, আফিস হইতে ঘরে ফিরিলেন। স্নানাহার তাড়াতাড়ি সারিয়া লইয়া আবার ২টা ৩৩ মিনিটের সময়, সাহেবকে পাটের দাদনের টাকার হিসাব বুঝ করিয়া দিতে হইবে; দুই দিন দেরী হইয়াছে বলিয়া সকালে বড় সাহেব ভারি তম্বি করিয়াছেন। তাই বাসায় ফিরিয়াও আপিসের দুর্ভাবনা দূর হইল না!

আষাঢ় মাস। চারিদিকের সবুজ গাছ-পালার উপর যেন একটি সজলতা ছল্‌ছল্‌ করিতেছে। সারা আকাশময় একটা অবয়বহীন মেঘের বিষণ্ণতা;—তার মাঝে এক জায়গায় উজ্জ্বল কুজ্ঝটিকার ন্যায় একটা তেজের আভাস সূর্য্যদেবের নিরুৎসাহ সূচনা করিতেছে।

হরকিশোর বাবুর বাড়ীর পেছনে একটি ছোট্ট খাল। বর্ষার কপিশ জল তার দুই কূল ছাপাইয়া উঠিয়াছে। পানাগুলি সারি বাঁধিয়া, সবুজ তারার ছিন্ন হারের মত, জলের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। লালা সেই খালের ঘাটে একটা পড়া-গাছের গোড়ার উপর বসিয়া আন-মনে হাতে বার বার সাবান মাখিতেছিল, আবার জল দিয়া ধুইয়া বার বার তার স্বচ্ছ সোণার চুড়ি-পরা হাতখানি দেখিতেছিল। খালের জল ভিনোলিয়া সাবানের ফেনা ও সুগন্ধে প্রায় আধাআধি মাখাইয়া গিয়াছিল। ঘাটের পাশে একটা কামিনী ফুলের গাছ ফুলে ফুলে ভরিয়া

গিয়াছে। তার নীচে কয়েকটি পাতি-হাঁস কাছাকাছি হইয়া বসিয়া-ছিল। একটা বড় সবুজ গোল পাতার উপর একটা অকাল পদ্মের কুঁড়ি লীলার পায়ের কাছে তার আরক্তিম মুখখানি তুলিয়া ধরিয়াছে!

লীলাকে এমন সময় একাকী ঘাটে দেখিতে পাইয়া হরকিশোর বাবু বড় আমোদ পাইলেন না, অথচ আসল মনের কথাটা ব্যক্ত করিতেও সাহস পাইলেন না।

একে হিসাবের চিন্তা, তার উপর সাহেবের কড়া হুকুম, তার উপর জ্বলন্ত ক্ষুধা! এই ত্র্যহস্পর্শের জ্বালায় লীলাকে এমন মধুর আবেশময় ভাবরাজ্যের মধ্যে নাগাল পাইয়াও তিনি নিজের মনে যে যথেষ্ট কাব্যের উত্তেজনা অনুভব করিলেন না, সে জন্য তিনি বঙ্গদেশের সমুদয় দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী-সম্প্রদায়ের নিকট বিশেষ ভাবে মার্জ্জনীয়!

হরকিশোর বাবু কল-তলায় তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া খাবার ঘরে আসিয়া দেখেন, লীলা তখনো বসিয়া বসিয়া হাতে সাবানই মাখিতেছে! এবার তিনি মনে মনে বিলক্ষণ চটিয়া উঠিলেন। তবু তো দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী,—মুখ সামলাইয়া কথা বলিতে হয়! স্বরটি তাই কিছু নরম করিয়া লইয়া ডাকিলেন,—

"লীলা, ও লীলা! আজকে কি চব্বিশ ঘণ্টা খালি স্নান-যাত্রাই চলবে, না, কারো খাবার টাবার দেখে শুনে দিতে হবে!"

লীলার স্নানযাত্রার সমারোহ চোখের নিমিষে ভাঙ্গিয়া গেল। হরকিশোর বাবুর ডাকটা জরুরী রকমের মনে করিয়া, সে তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া রঙীন চারখানা গামছা দিয়া চুল হইতে জল মুছিতে মুছিতে ভিজা কাপড়েই তার স্বামীর নিকট হাজির হইল। হাসি-হাসি মুখখানি

চারি ধারে কুঞ্চিত কুন্তল-রাশি, দেখিতে মেঘের ঝালরের মতো।
কিশোর বাবুর মনে হইতেছিল, বুঝি বা স্বয়ং প্রাবৃট-লক্ষ্মী, শস্য-শ্যামল প্রান্তর ভুলিয়া গিয়া সিক্ত স্বর্ণ-বাসে আজ তাঁর দীন-ভবন আলো করিয়া দাঁড়াইয়াছেন! মনের অবস্থাটা খুব হাল্‌কা থাকিলে ভক্তিভাবে সে দিন হরকিশোর বাবু যে কি করিয়া বসিতেন, তা বলা যায় না! কিন্তু স্ত্রী-জাতির, বিশেষতঃ দ্বিতীয়-পক্ষগ্রস্তাদিগের বিশেষ দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁর মনটা সে দিন নিতান্ত বিরস,—কে যেন তাতে যথেষ্ট পরিমাণে 'কষ্টিক-লোসন' মাখাইয়া দিয়াছিল!

নিজের মন যখন তিক্ত থাকে, তখন সমুদয় দুনিয়াটাই বিস্বাদ হইয়া যায়। লীলা হরকিশোর বাবুর আহারের যোগাড় করিয়া দিল। কিন্তু আহারে বসিয়াই তিনি মুখটা বেজায় বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"কি রান্নাই করেচ মাথা মুণ্ডু! ডাল্‌নাটা তো কেউ মুখে দিতে পারে না, অত ঝাল! দেখ রাগ করোনা লীলা,—পেটের জন্যই তো অত ঝক্‌মারী! যে রোজগার করে, তারো তো দুমুঠো খেতে হবে! কি ছাই খাব,—এ সব খেয়ে খেয়ে যে ডিস্‌পেপ্সিয়া ধরে গেল! কাল মাছের ঝোলটা নুন দিয়ে পুড়িয়ে রেখেছিলে, আজকে ডাল্‌নাটার এই ভাব!"

লীলার মুখের উপর এতক্ষণে একটা খণ্ড-প্রলয়ের মেঘ বেশ ঘনাইয়া আসিয়াছে। প্রায় বর্ষণোন্মুখ! কিন্তু আজ হরকিশোর বাবু কিছুতেই ঘাবড়াইলেন না। সাহেব আজ তাঁহাকে বেশ কড়া রকমের দম্‌ দিয়াই বাড়ীতে পাঠাইয়াছিলেন!

লীলা মুখখানা বেজায় ভারি করিয়া বলিল,—

"তা আর কি কর্‌বো বল! পরশু অত করে তোমার জন্য ডিমের 'কারি' করে দিলাম, নলিনী দিদি নিজে দেখিয়ে দিলে! তুমি তো দেখেই চীৎকার দিয়ে উঠ্‌লে, এত মস্‌লা দিয়ে রেখেছ, হজম করবে কে? সে দিন ইলিশ মাছ দিয়ে ঝোল হলো, টক হলো, তুমি ত চাকরটাকেই বকে অস্থির—বেটা বারো আনার মাছ আনলি কি বলে! পয়সা দিবে একটি, গান শুন্‌বে অক্রুর সংবাদ! তা আমাকে নিয়ে যদি তোমার ঘর-কন্না না চলে, তবে আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলেই চলে!"

লীলা যখন শরাসন ধারণ করিয়া হরকিশোর বাবুর প্রতি হৃদয়-ভেদী বাণ নিক্ষেপ করিল, পাটের 'বড়-বাবু' তখন কিছু দমিয়া গেলেন। পরে কতকটা আপোষের ভাবে কহিলেন,—

"আহা, রাগ কর্‌চো কেন লীলা, আমি তো তোমায় কিছু বল্‌চি না। আমার পেট্‌টাই হচ্চে কিনা বড্ড খারাপ,—যা খেয়ে হজম কত্তে পারব না মনে হয়, তা দেখ্‌তেই ঘাব্‌ড়ে যাই! আর তুমি যখন হচ্চ আমার স্ত্রী—ঘরের লক্ষ্মী, তখন আমার সুবিধা অসুবিধা সব তো তোমাকেই বল্‌তে হবে! কেমন, তাই নয় কি, লীলা?"

বাস্তবিক লীলাও আপোষের প্রস্তাবে কোনও দিনই বিমুখ নয়। আপন হৃদয়ের সঙ্গে আপোষ করিয়াই তো সে হরকিশোর বাবুর সংসারে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছে! নতুবা লীলার পক্ষে হরকিশোর বাবুর ঘর করা অসম্ভব। তিনি তার ঠাকুরদাদার বয়সী!

লীলা একটু সন্দিগ্ধ ভাবে বলিল,—"তা-তো-বটেই!"

হরকিশোর বাবু কিছু ভরসা পাইয়া বলিলেন,—

"এই দেখ, তপ্‌সী মাছটা অত নরম করে ভাজ্‌তে হয় না. ভেতরটা এক রকম কাঁচাই রয়ে গেছে!"

লীলা নাকের নোলকটাতে একটা প্রবল নাড়া দিয়া বলিল,—

"আহা, তা কি আর আমি জানি! কড়া ভাজলে তোমার যে আবার পেটে সয় না! শ্যাম রাখ্‌বো না কুল রাখ্‌বো এবার?"

হরকিশোর বাবু আরো কয়েক ধাট খাদে নামিয়া বলিলেন,—

"আহা, চট কেন লীলা; আমি কি আর বল্‌চি তুমি পার না! মোদ্দা কথাটা হচ্চে এই যে, পেটের অবস্থা বুঝে রান্নাটার মাঝে একটু রকম-সকম করে নিতে হয়। কিন্তু তাই বলে একেবারে কাঁচা মাছ খাওয়া,—তা হলে রান্না করার তো আর মোটেই দরকার দেখি না!"

এবার একেবারে ধারা-বর্ষণ!

কান্নার প্রথম উচ্ছ্বাসটা কিছু থামলে পর, লীলা অশ্রু-রুদ্ধ অভিমানের সুরে বলিল,—

"তোমার ঘরে যখন টাকার দুঃখু ছিল না, তখন দেখে শুনে একটা দ্রৌপদী ঘরে আনলেই হতো! আমার না আছে রূপ, না আছে গুণ,—না আছে একটার বেশী স্বামী।"

কথাগুলির ভিতর দিয়া আহত চাতকিনীর তৃষ্ণা ও নিরাশার বেদনা দুইই অতি করুণ সুরে ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু তাতেও দ্বিতীয় পক্ষের ঝাঁজ পুরাপুরি বর্ত্তমান! হরকিশোর বাবু একটু আশ্বস্ত হইয়া ভাবিলেন,—এবার কথা যখন ফুটিয়াছে, তখন যুবতীর হৃদয়-আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। পরে ভাব-গদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন,—

"পাগলামো করো না লীলা! তোমার রান্নায় কোনো খুঁত নাই! তবে কি না—আমার ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার মুখ, সর্ব্বদাই বিরস; আর মেজাজটা আমার সব সময় ঠিক থাকে না! কখন যে কি বলে ফেলি, ঠাহর থাকে না।"

লীলা তার মুখে চুপ্ করিয়া থাকিল,—"সাভ্রেহহ্নীব স্থল কমলিনী ন প্রবুদ্ধা ন সুপ্তা।"

হরকিশোর বাবু লীলাকে খুসী করিবার জন্য বেশ একটু ফেনাইয়া কথাটা পাড়িলেন,—

"জান কি লীলা, যেমন তেমন লোকের যে সে রকম রান্না হলেই এক রকম চলে যায়। কিন্তু আমাদের বংশে কেউ খারাপ রান্না কখনো দেখে নাই। আমাদের পলাশপুরে আজো মা দিদিমার লোকে কত সুখ্যাতি করে,—কেবল এই জন্যে! আমি বেটা ছেলে, কিন্তু এক বার হাতা-বেড়ী নিয়ে যদি লেগে যাই, তবে কেউ একেবারে ফেলে দিতে পারবে না তা বলে রাখ্‌চি! মোট কথা, এ বিদ্যেটা বংশানুক্রমে আমাদের মধ্যে চলে আসচে বলে এখন আমাদের একেবারে মজ্জাগত হয়ে পড়েচে!"

লীলা হরকিশোর বাবুর কথা শুনিয়া অতি সংক্ষেপে এমন ভাবে একটা "হুঁ" ঠুকিয়া জবাব দিল, তাহাতে সে যে তাঁহার কথাগুলা ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিল, এমন বোধ হইল না! স্বামীর কথার উপর আবার সন্দেহ! শুধু লীলার উপর কেন,—হরকিশোর বাবু বাংলা মুলুকের সমুদয় দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী-সম্প্রদায়ের উপর আন্তরিক চটিয়া গেলেন। কিন্তু সেটা খুব মনে মনে। কারণ এক বার হার মানিয়াছেন,

পুনরায় লীলার সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিলেন না! পরে একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন ;—

"যা হোক, এখন থেকে রান্নার উপর তোমার খুব ঝোঁক হবে আশা করি।"

লীলা গামছার জল নিঙ্‌ড়াইতে নিঙ্‌ড়াইতে বলিল ;—

"আশা অমর, মরণ কাল! আমার বাপের কুলে রান্নাবান্নার কোনো কালে তেমন নাম ডাক ছিল না! কাজেই আমি যে তোমার 'আশা' এ জন্মে পূরণ করে যেতে পার্‌বো, আমার তো তেমন ভরসা হচ্চে না!"

হরকিশোর বাবুও দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর স্বামী ;—কিছুতেই হাল ছাড়িয়া দিবার লোক নন। বক্তৃতাটা অন্তঃপুরে যে বিশেষ কাজে লাগে, প্রথম বিবাহের পর হইতেই সে কথাটা হরকিশোর বাবু জানিতেন। তিনি এবার অত্যন্ত স্ফূর্ত্তির সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন ;—

"বল কি লীলা, তোমরা না পার কি? চোখের জলে তোমরা ত্রিভুবন জয় করে রেখেচ!"

লীলা খুসী হইল। সে যে এমন হাতে হাতে সার্টিফিকেট পাইবে এতটা মনে করে নাই। তাড়াতাড়ি মনে মনে কি যেন একটা ফন্দি আঁটিয়া লইয়া, লীলা হঠাৎ বলিয়া উঠিল ;—

"তুমি মাছের দমটা খুব পছন্দ কর, না?"

হরকিশোর বাবু খুব উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন ;—

"ঠিক ঠিক বলেচ লীলা! তুমি সে দিন যে দমটা রান্না করেছিলে তা বেশ হয়েছিল। তবে কি না মাছটা একটু শক্ত ছিল, আর ঝোল

রেখেছিলে কিছু বেশী! আর তত তেল ঘি না ঢাল্‌লেও হতো; ঝালটা একটু জেয়াদা হয়েছিল, আর কিস্‌মিস একেবারে দেওই নি!”

লীলা একটু মুচ্‌কে হাসিয়া বলিল;—

“বাঃ, সেদিন তো আমায় এ সব কিছু বল নি! তোমায় যেটুকু দিয়েছিলাম, তার এক ফোঁটাও তো পাতে পড়ে ছিল না! তা যা হোক, তোমাদের বাপের বাড়ীর রান্নাটা এত দিন কেন আমায় শিখিয়ে দিচ্চ না আমি তাই ভাবি!”

হরকিশোর বাবু খুব উৎসাহের সহিত বলিলেন;—

“তা নিশ্চয় শিখিয়ে দেবো। তোমার এমন শিখ্‌বার আগ্রহ আছে বলেই তো এ সব কথা বল্‌চি; নৈলে আমার হজমের শক্তি একেবারে লোপ পেলেও তোমায় এ সব কিছু বল্‌তুম না।”

লীলা নিজের প্রশংসা শুনিয়াও কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল;—

“আস্‌চে কাল বুঝি রবিবার, তোমাদের আপিস বন্ধ?”

হরকিশোর বাবু সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়িলেন।

লীলা একটু গম্ভীর হইয়া বলিল,—

“দেখ, আস্‌চে কাল নলিনী দিদির ননদের বর আস্‌চে। নলিনী দিদি আজ মাথার দিব্যি দিয়ে বিকেল বেলা থেকে তাদের বাড়ীতে গিয়ে হাতাহাতি কাজ-কর্ম্ম করে দিতে বলে পাঠিয়েচে। তার শাশুড়ীর অসুখ, সে নিজে কোলের ছেলে ফেলে সব কাজ কর্ত্তে পারে না। মাছ, ঘি, তেল, মস্‌লা, সব আমি ঠিকঠাক করে রান্না ঘরে রেখে যাব। তুমি শুধু তোমার বাপের বাড়ীর ধরণে মাছের দমটা

করে রেখে দিও। আমি এসে তাড়াতাড়ি ভাতটা নামিয়ে নেবো এখন, নৈলে বড্ড দেরী হয়ে যাবে।"

হরকিশোর বাবু মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিলেন ;—
"তা পার্‌ব না ? নিশ্চয় পার্‌ব, কিন্তু জান কি—"

লীলা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল,—

"কিন্তু কিন্তু নয়, তোমায় দমটা করে রাখতেই হচ্চে। আমার মাথার দিব্যি ; তোমাদের বাপের বাড়ীর রকম করে মাছের দমটা করা চাই।"

হরকিশোর বাবু আরও একটু ঘাবড়াইয়া গিয়া বলিলেন,—

"বাঃ, লীলা তুমি আমাকে নিজে রান্না কর্ত্তে বল্‌চো ? বরঞ্চ, তুমি সব করো, আমি দেখিয়ে শুনিয়ে দেবো এখন !"

লীলা হাসিয়া উঠিল ; সে হাসি যেন আর থামিতে চায় না ; অনেক কষ্টে হাসির ঝঙ্কারটা শেষে থামাইয়া বলিল,—

"সে আবার কি ! তোমাদের বংশে রান্না করাও যা, হাসের ছানার জলে সাঁতার কাটাও তা ; নিছক্ বংশের গুণ ; তোমায় কোনো ল্যাঠায় পড়্‌তে হবে না !"

লীলার ব্যঙ্গ-মিশ্রিত হাসিটা হরকিশোর বাবুর উত্তপ্ত দর্পের উপর যেন খানিকটা ঠাণ্ডা বরফ-জল ঢালিয়া দিল। হরকিশোর বাবু আবার মনে মনে কিছু চটিলেন, কিন্তু মনের ভাবটা চাপা দিয়াই বলিলেন,—

"তা তো নয়,—তবে কি না,—নিজে নিজে উনুন ঠেলা, সেটা কি পুরুষের কর্ম্ম !"

লীলা পুনরায় হাসিয়া বলিল,—

"তা খুলে বল না যে, পারবে না, তা হলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। আমি না হয় নলিনী দিদিদের বাড়ী তবে আর নাই গেলাম!"

হরকিশোর বাবুর অভিমানের একটা কচি ডগা মিছরির ছুরির আঘাতে ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি সরোষে আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"কি, পারব না! সামান্য একটা মাছের দম রান্না করা, তাই পারবো না! নৈলে পলাশপুরে বুনেদি রায়দের ঘরে আমার জন্মানোটাই মাটি!"

বক্তৃতাটা শেষ করিয়া, হরকিশোর বাবু স্বর একটু নামাইয়া বলিলেন,—

"তবে কি না, সকলে বলাবলি হাসাহাসি করবে, বলবে বাবু বুড়ো বয়সে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর খাবার কত্তে হেঁসেলে গেছে!"

লীলা মুচকে হাসিয়া বলিল,—

"ইস্! তুমি বুঝি আবার বুড়ো,—না?"

হরকিশোর বাবু কয়েক বার ঢোক গিলিয়া বলিলেন,—

"তা বুড়ো হই বা না হই, সে কথা হচ্চে না; কিন্তু ছোট লোকগুলো যে বলাবলি হাসাহাসি করবে, সেইটে আমার অসহ্য।"

লীলা হাত নাড়া দিয়া বলিল,—

"তবে তো বয়ে গেল! বেশ তো, দিক্ না ওরা সব কথা খবরের কাগজে ছাপিয়ে! বেশ তো নূতন রকম একটা মজা হবে এখন!"

হরকিশোর বাবু রাহু-গ্রস্ত সূর্য্যের মত নিস্তেজ ভাবে বলিলেন,—

"মজা আর এতে কি বেশী হবে!"

"কেন, তোমার নিজের হাতে তৈরী মাছের দম,— ঐতো মজা! সেটা পুরুষ লোকের পক্ষে কি কম কথা?"

"আমি তো আর মোগলাই ফ্যাশনে রাঁধ্‌বো না,—আমার সব প্লেনের উপর।"

"আর কথায় কাজ কি,—কাজেই দেখা যাবে এখন!"

হরকিশোর বাবু তখন খুব তেজের সহিত বুক ফুলাইয়া বলিলেন,—

"বহুত আচ্ছা, আজ দেখাবো তোমায়, মাছের দম কাকে বলে!"

সহসা হরকিশোর বাবুর এতটা তেজের কারণ এই যে, শ্রীযুক্তা প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর "আমিষ ও নিরামিষ আহার" নামক বইখানা ঘরেই ছিল!

[৩]

সন্ধ্যায় পাখীগুলি যখন কলরব করিয়া আপন আপন নীড়ে ফিরিয়া যায়, তখন হরকিশোর বাবু বড় সাহেবের সঙ্গে বুঝ প্রবোধ করিয়া সবে বাড়ী ফিরিয়াছেন। মনের গতি কিছু ভাল, কারণ সাহেব হিসাবের ফাঁকি ধরিতে না পারিয়া জমা-খরচ পাশ করিয়া দিয়াছেন। বাড়ীতে আসিয়া আপিসের কোটটা সবে আল্‌নার উপর রাখিয়াছেন, এমন সময় লীলা বিদ্যুতের ঝিলিকের মত তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় তাঁহাকে বলিয়া গেল;—

"আমি যাচ্চি কিন্তু, মস্‌লা, ঘি, নুন, মাছ, লঙ্কা তেজপাত সব ঠিকঠাক্ করে রান্না ঘরে রেখে দিয়েচি!"

হরকিশোর মেঘনাদী ছন্দে জবাব দিলেন —

"নিবাস পলাশপুরে, পত্নী লীলা মোর, আমি কি ডরাই সখি মাছের দমেরে!"

সিঁড়ির দিকে লীলার হাসির তরঙ্গটা কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বাতাসে মিলাইয়া গেল!

তখন ঘরে আলো জ্বলিয়াছে।

লীলা যখন চলিয়া গেল, তখন হরকিশোর বাবু দৃঢ় সংকল্প করিলেন, —"আজ আমি এমন মাছের দম রান্না করব, যা লীলার চৌদ্দ পুরুষে কেউ কখনো খায় নাই!" এই ভাবিয়া সার্টের আস্তিনটা কনুই এর কাছে গুটাইয়া লইয়া, একটা সিগারেট ধরাইলেন! তার পর কি কি জিনিষ লাগিবে, তার একটা খস্‌ড়া ফর্দ্দ করিবার জন্য কাগজ পেন্‌সিল লইয়া টেবিলের ধারে গিয়া বসিলেন। কাটিয়া ছাঁটিয়া খস্‌ড়া ফর্দ্দ মনোনীত হইলে পর, কালী কলম দিয়া "ফেয়ার কপি" করিয়া লইলেন, এবং প্রজ্ঞা সুন্দরীর বই দেখিয়া কোন্ জিনিষটা কখন কি পরিমাণে দিতে হইবে "মারজিনে" তার একটা "নোট" লিখিয়া রাখিবেন, স্থির করিলেন। তারপর এমন আশ্চর্য্য দম তৈয়ারী হইয়া যাইবে, যা লীলার বংশে কেউ কখনও চোখেও দেখে নাই!

এই সঙ্কল্প করিতে করিতেই রাত্রি ৭৷৷টা বাজিয়া গেল। ইতিমধ্যে হরকিশোর বাবু তিনটি সিগারেট ধ্বংশ করিলেন। তারপর আলমারী হইতে প্রজ্ঞাসুন্দরীর বইখানা বাহির করিয়া আনিতে গেলেন। আলমারীর কাছে আসিয়া হরকিশোর বাবু দেখিলেন—ভীষণ ষড়যন্ত্র! পুঁথির আলমারীর গায়ে আজ একটির স্থানে দুইটি তালা পড়িয়াছে!

চাকরের নিকট শুনিলেন লীলা তালা বন্ধ করিয়া চাবির গোছা আঁচলে বাঁধিয়া তার সই নলিনীদের বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছে। হরকিশোর বাবুর বাপের বাড়ীর রান্নার অনেক খানি দর্প এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইল!

হরকিশোর বাবু ভাবিয়া হয়রাণ হইয়া গেলেন। অবশেষে অনেকগুলি সিগারেট পোড়াইয়া ঠিক করিলেন যে, আজ মাছের দম্ এমন আশ্চর্য্য মৌলিক ধরণে তৈরী করা যাইবে যে, লীলা দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া থাকিবে। তারপর ফর্দ্দে পেনসিল দিয়া লিখিলেন,—মাছ সাড়ে এগার ছটাক। ঘি লাগিবে কি তেল লাগিবে, এ সংবাদ কোন্ অভিধানে লেখা আছে? আর কি লাগিবে? লঙ্কা, হলুদ, দারুচিনি, লবঙ্গ, ধনে, এলাচ, মাথামুণ্ডু সব তো আছে। এর মধ্যে কি লাগিবে কি লাগিবে না, কে বলিয়া দিবে? আগে ঘি গরম করিয়া কি তাহাতে মাছ চড়াইয়া দিতে হইবে, না আগে মাছ সিদ্ধ করিয়া লইয়া পরে ঘি দিতে হইবে?

হরকিশোর বাবুর কপাল ঘামিয়া উঠিল, বাক্সের পর বাক্স সিগারেট খরচ হইয়া গেল,—কিন্তু আজ বিপদের দিনে এ জটিল সমস্যা মিমাংসা করিবার কোনও উপায় ছিলনা! অবশেষে কোন উপায়ান্তর না দেখিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "এর চাইতে পাটের দর কসা ঢের সোজা!"

সে সময় হরকিশোর বাবুর ঘরের পশ্চিমা চাকর মঙ্গলু রান্না ঘরে বসিয়া মশলা পিশিতেছিল। তিনি তাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"হাঁরে মঙ্গলু, মছ্‌লি ক্যায়সে পাকানে হোতা, তা বল্‌তে পারিস্‌?"

মঙ্গলু কামানো মাথার উপরকার টিকিটি জোরে নাড়িয়া দিয়া সংক্ষেপে বলিল ;—

"মছ্‌লি হাম্‌লোক কব্‌হি নাহি খাতা, বাবুজী !"

মঙ্গলু কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ হরকিশোর বাবুর মনে হইল, যা যা আছে, সবই তো ভাল ভাল জিনিষ,—আদা, নুন, লঙ্কা, ধ'নে জাফ্রাণ, হলুদ, মাছ ইত্যাদি! এ সমুদয়ই তো খাবার জিনিষও বটে! এ সব দিলে তো আর রান্না খারাপ হ'তে পারে না আর এ সব যখন দিতেই হইবে, তখন আর অগ্র-পশ্চাৎ করিয়া দিয়া বিশেষ লাভ কি ? সব জিনিষ-পত্র মাছের সহিত এক সঙ্গে ডেকচিতে তুলিয়া দিলেই আপদ শান্তি! পরিমাণ হাতের আন্দাজ! রসনা হাতের আন্দাজের সাহায্য করিবে। এ রসনা-পথে বহু সুরস মাছের দম তলাইয়াছে, সে কি আজ এ বিপদের দিনে হাতের আন্দাজকে একটুও সাহায্য করিবে না ?- মন বলিল, "করিবে বৈ কি !" বেইমান রসনা চুপি চুপি বলিল, "না, কখনই না"!

তার পর, হরকিশোর বাবু ডেকচি ভরিয়া উনুনের উপর জল তুলিয়া দিলেন। তার পর, তেল, ঘি, নুন, হলুদ, জাফ্রাণ তেজপাতা, ধ'নে সব এক সঙ্গে চড়াইয়া দিয়া একখানা থালা দিয়া ডেকচির মুখ ঢাকিয়া দিয়া ঘাড় খুলিয়া বসিলেন। মনে মনে হরকিশোর বাবু স্থির করিলেন, ৪৫ মিনিটের পর ডেকচি নামাইয়া মুখের থালা খুলিয়া দেখা যাইবে যে, অতি সুস্বাদু মাছের দম রান্না হইয়া গেছে!

এতক্ষণ চুপটি করিয়া উনুনের জ্বালের সামনে বসিয়া থাকা! হর-কিশোর বাবু, আর একটা সিগারেট ধরাইয়া খবরের কাগজটা কোলের উপর টানিয়া লইয়া পড়িতে বসিলেন। তখন রুষ-জাপানে ভয়ানক যুদ্ধ! বল্টিক্ ফ্লিট্ জাপানীরা উড়াইয়া দিয়াছে! খবরের কাগজ নানা সংবাদ ও কাহিনীতে পূর্ণ। পড়িতে পড়িতে হরকিশোর বাবু পুরা দুই ঘণ্টা যে কেমন করিয়া কাটাইয়া দিলেন, তা নিজেই টের পাইলেন না। তিনি যে রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, খবরের কাগজ হাতে লইয়া সে কথাটা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন!

সহসা একটা কেমন গন্ধ অনুভব করিয়া হরকিশোর বাবুর চমক ভাঙ্গিল। হরকিশোর বাবু ভাবিলেন. ডেক্‌চির ভিতরে যে একটা নিগূঢ় রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলিতেছে, এ বোধ হয় তারই গন্ধ। তিনি ডেক্‌চির মুখ হইতে থালা সরাইয়া দেখিলেন, জল সব শুকাইয়া গিয়াছে, এবং পোড়া মাছ হইতে দুর্গন্ধযুক্ত ধোঁয়া উঠিতেছে। তাড়া-তাড়ি ডেক্‌চি নামাইয়া ফেলিয়া, হরকিশোর বাবু বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, কতক মাছ পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে, আর উপরে কতক মাছ এখনও কাঁচাই রহিয়া গেছে! হরকিশোর বাবু ভাবিলেন রান্নাটা যে ভাল হয় না, তা কেবল লালার দোষে নয়। আসল কথা,—ডেক্‌চিটাই যায়গায় যায়গায় অত্যন্ত পাতলা হইয়া গেছে। সামান্য আঁচ লাগিলেই ভিতরের অনেক জিনিষ ঝল্‌সে যায়।

[৪]

রান্না-ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সবে বড় আয়নার কাছে হরকিশোর বাবু দাঁড়াইয়াছেন। আয়নার ভিতরে দেখিলেন, ডেক্‌চির

তলার প্রায় সমুদয় কালি তাঁহার নাকে মুখে লাগিয়া গিয়াছে, এবং চেহারাটা যাহারা সেকালে লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছিল, অনেকটা তাহাদেরই এক জনের মত হইয়া পড়িয়াছে! তাড়াতাড়ি আল্না হইতে তোয়ালেখানা পাড়িয়া লইয়া সাবানশীর জন্য আয়নার দেরাজে হাতড়াইতে ছিলেন, এমন সময় পেছন হইতে একটা হাসির তরঙ্গ কাণে আসিয়া পৌঁছিল! হরকিশোর বাবু মুখ ফিরাইলেন না, কিন্তু আয়নার মধ্যে দেখিতে পাইলেন, হাসিতে হাসিতে লীলা তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছে! লীলাও আয়নার মধ্যে হরকিশোর বাবুর অপরূপ মুখ দেখিয়াই হাসিয়া উঠিয়াছিল!

তাড়াতাড়ি তোয়ালে দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে হরকিশোর বাবু বলিলেন,—

"তবু তুমি এলে যা হোক! নয়টার সময় আস্‌বে বলে গেলে, আর এখন রাত ১১॥ টা!"

লীলা হাসিয়া বলিল,—

"কেন, আমি আর নলিনী দিদি ঠিক ৯। টায় ঘরে ফিরে এতক্ষণ পালিয়ে তো তোমার রান্নাই দেখ্‌ছিলাম! নতুন ধরণের রান্না তোমার! তোমাদের বাপের বাড়ীর নমুনাটা দেখে শিখে রাখ্‌তে হবে তো!"

হরকিশোর বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—

"তামাসা রাখ লীলা, দম্ নিতান্ত মন্দ হবে না খেতে!"

লীলা হাসিয়া বলিল,—

"আমি কি তাই বল্‌চি!"

আহারে বসিলে পর, লীলা যখন হরকিশোর বাবুর পাতে তাঁহার সুপক্ক মাছের দম্ আনিয়া দিল, তখন তাঁহার অন্ন-প্রাশনের অন্ন শুদ্ধ পেটের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিতে চাহিল! এমন অবস্থায় তো আর বাপের বাড়ীর রান্নার গর্ব্ব বজায় রাখা যায় না! তবু হর-কিশোর বাবু নিজের বাহাদুরী ছাড়িতে রাজি হইলেন না। এটা তাঁর পাটের আপিসের শিক্ষা! তিনি কিছু মুরুব্বিয়ানা ভাবে বলিলেন,—

"দেখ লীলা, হাল-ফ্যাশনের বাবুরা আজকাল আর মোগলাই দম্ টম্ তত পছন্দ করেন না। এটা হচ্চে বিলিতী দম্—খাঁটী ইংলিশ প্যাটার্ণ!"

লীলা খুব এক পশ্‌লা হাসিয়া বলিল,—

"তা ভাল জিনিষ, পাতে রাখ্‌তে হবে না, সবখানি তুমিই না হয় খেয়ে ফেল!"

কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয়, আজ হরকিশোর বাবুর আহারে বিশেষ রুচি দেখা গেল না। আঙুল দিয়া "বিলাতী দম্‌টা" কয়েকবার নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন,—

"তুমি বুঝি কখ্‌খনো কোলকাতায় যাও নি, লীলা?"

লীলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"না"।

"ওঃ, তবে এ সব তোমার তত ভাল লাগ্‌বে না! এ সব সাহেবী খানা,—গ্রেট্ ইষ্টার্ণ হোটেলে এই দম্ খেয়ে বড় বড় সাহেবেরা কত তারিফ্ করে। আমি এক বাবুর্চ্চিকে নগদ তিন টাকা দিয়ে তবে এ রান্না শিখেছিলাম।"

লীলা উদাসীনভাবে উত্তর করিল,—

"অমন ভাল জিনিষটা তোমার মুখে একেবারেই রুচ্‌ল না কেন, আমি শুধু তাই ভাব্‌চি!"

হরকিশোর বাবু এবার লজ্জায় লাল হইয়া উঠিলেন। বার কয়েক কাশিয়া বলিলেন,—

"পেটের গতিকটা আজ বড় ভাল বোধ হচ্চে না, লীলা! ডিস্পেপ্‌সিয়ার ভাব! কাল তোমার কাঁচা তপ্‌সী মাছ খেয়ে অবধি আজ পর্য্যন্ত পেটটা বুটবুট কচ্চে। আর আমি খাবো না, তুমি দম্‌টা চেকে দেখো একবার!"

লীলা একটু মুচ্‌কে হাসিয়া বলিল,—

"ও সব আদত বিলিতী খানা,—শুধু আমরা কেন ভাই, আমাদের চৌদ্দ পুরুষে এ সব জিনিষ কখনো চোখেও দেখে নি!"

হরকিশোর বাবু নিতান্তই অভুক্ত অবস্থায় উঠিয়া যান দেখিয়া লীলা হাসিয়া বলিল,—

"নলিনী দিদি তাদের ঘরে যে মাছের দম্‌ করেছিল, তা একটু পাঠিয়ে দিয়েচে। একটু মুখে দিয়ে দেখ দেখি!"

হরকিশোর বাবু নিঃশব্দে ভাল মানুষের মত লীলার সঙ্গত প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। হরকিশোর বাবু সে রাত্রিতে যে ভাবে লীলার প্রদত্ত মাছের দমের সদ্ব্যবহার করিলেন, তাহা দেখিয়া কেহ বলিতে পারিত না যে, হর কিশোর বাবুর কোনো কালেও ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার ব্যারাম ছিল!

পরদিন প্রাতে আপিসে যাইবার জন্য ধরা-চূড়া পরিয়া হরকিশোর বাবু তাকের উপরে চসমার কেস্‌টা খুঁজিতেছিলেন, এমন সময় লীলা সহাস্যে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—

"কিছু খেয়ে গেলে হয় না? আপিস থেকে ফিরবে তো সেই এগারোটায়!"

"কেন, তোমার নলিনী দিদির বাড়ীর দমের খানিকটা আজো রেখে দিয়েচো নাকি?"

লীলা মধুরভাবে হাসিয়া বলিল,—

"না,—কিন্তু তোমার সেই বিলিতী দম্‌টা,—প্রায় সবখানিই মজুত আছে। এক টুক্‌রো পাঁ'রুটী দিয়ে খানিকটে খেয়ে যাও না।"

"ওটা টেপী কুকুরটাকে দিয়ে ফেলো!"

এই বলিয়া হরকিশোর বাবু হাসিতে হাসিতে, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সহিত রণে ভঙ্গ দিয়া, তাড়াতাড়ি আপিসের দিকে পালাইলেন।

নিতান্ত প্রথম পক্ষের ছেলে-মেয়েগুলির দেখা-শুনার জন্য, কোনো নিরীহ ভাল মানুষ ভদ্রলোকের পত্ন্যন্তর গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক হইয়া থাকিলে, তাঁহার নিকট গ্রন্থকারের কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন,—তাঁরা যেন হরকিশোর বাবুর নাকাল অবস্থাটা স্মরণ করিয়া সময় থাকিতে দিব্য জ্ঞানলাভ করেন! কারণ, নবাবিস্কৃত কল্কী-পুরাণের একটী লুপ্ত অধ্যায়ে কথিত আছে, সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার না করিয়া সম্মুখ-সমরে, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে, এ পর্য্যন্ত কোনো জীবন্ত মনুষ্য আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। পরলোকগত কোনো মহাত্মা এ সম্বন্ধে কৃতকার্য্য হইয়াছেন কি না, কোনো অলৌকিক রহস্য বিষয়ক মাসিক পত্রে সে সম্বন্ধে কোনো সঠিক সংবাদ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই!

দেবতার দান।

গুরুদেবের প্রশান্ত মুখ-কান্তি স্নিগ্ধ হাস্য-ছটায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি শিষ্যের পানে তাকাইয়া প্রীতি-মধুর কণ্ঠে বলিলেন,—

"বৎস! অতি নিপুণ ভাস্কর-শিল্পী তুমি! কিন্তু শুধু তাই বলে নয়;—সমুদয় ললিত-কলা-বিধির চাইতেও যা শ্রেয়, তুমি সে উদার হৃদয় ও নির্ম্মল চরিত্র-ধনের অধিকারী।

"আমাদের মঠে একটী শান্তি-স্বরূপা দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কর্ত্তে হবে। কাল রাত্রে ভগবান তথাগত স্বপ্নে দেখা দিয়ে, আমায় এ আদেশ করে গেছেন। এ প্রত্যাদেশ রক্ষা করবার সমুদয় দায়িত্ব তোমায় দিয়ে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছি। তুমি এখন থেকেই এমনভাবে কাজ সুরু করে দাও যেন বোধিসত্বের জন্মতিথি উৎসবের দিনে, তোমার শান্তি-স্বরূপিণী, কল্যাণে ও সৌন্দর্য্যে, আমাদের মঠখানা উজ্জ্বল করে তোলেন।"

যিনি এই কথাগুলি বলিলেন, তিনি প্রাচীন ভারতের একটী সমৃদ্ধ সংঘারামের ঋষি-কল্প প্রবীণ যতি। তাঁর স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ের প্রচুর বাৎসল্য-ধারা তাঁর পদোচিত গাম্ভীর্য্যকে সরস করিয়া দেওয়াতে তাঁর আদেশ-বাণী অতি মধুরভাবে প্রচারিত হইল! যার উপর প্রচারিত হইল, তার নাম শুদ্ধানন্দ—ঐ সংঘারামেরই একটী যুবক ভিক্ষু

শুদ্ধানন্দ গুরুদেবের আদেশ শুনিয়া, যেন কতকটা অপ্রতিভ ভাবে, নতশিরে, মাটির পানে চাহিয়া থাকিল,—কোনও জবাব দিল না।

মঠের প্রবেশ পথে,—যেখানে রঙীন পাথরের উজ্জ্বল লতা-পুষ্প-জালে আচ্ছন্ন হইয়া সদর দরজার উপরকার বিশাল খিলানটী কারু-কার্য্য-শোভিত মর্ম্মর স্তম্ভরাজির উপর বিরাজ করিতেছিল, সেইখানে গুরু-শিষ্যে আলাপ হইতেছিল।

বাস্তবিকই সে মঠটী বিচিত্র কারুকার্য্য-শোভিত। যে স্বর্ণযুগে মানুষ জীবনব্যাপী অক্লান্ত শ্রম এবং হৃদয়ের ভাব-সৌন্দর্য্য ভগবানের প্রিয়কার্য্যে সমর্পণ করিয়া প্রাণের পিপাসা ও দানের পিপাসা দুইই চরিতার্থ করিত,এ মঠ সেই ভক্তি-নিষ্ঠ কালের মনোহর আলোক-স্তম্ভ! সেকালে লোকের ভগবানের শক্তি ও মহিমার উপর অন্ধ বিশ্বাস ছিল বলিয়া তাদের সত্যের মর্য্যাদা ও ধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিবার মত সুমতি ও সাহস ছিল। তাদের প্রবৃত্তি যদিও উদ্ধত, চিত্তবৃত্তি যদিও উদ্দাম ছিল, তবু সত্য ও ধর্ম্মের পুণ্য প্রভায় সে কালের লোক-চরিত্র উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছিল।

এখন আর সে দিন নাই। এখনকার মানুষ অহঙ্কার ও বিলাসের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আপনার ক্ষুদ্র মৃত্যুশীল পরিণামের কথা ভুলিয়া গিয়াছে! যারা শ্রমজীবিদের আজন্মের নিপুণ সাধনা ও অসীম ধৈর্য্যের ফলে, সুন্দর সুন্দর বহু-ব্যয়-সাধ্য মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহকালে সুখ ও পরকালে শান্তনার স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তারা কি কখনো ভাবিয়াছিল, মানুষই একদিন অর্থ ও লুণ্ঠন লোলুপ হইয়া সে পবিত্র স্থান বীভৎস তাণ্ডব-নৃত্যের লীলা-ভূমি করিয়া তুলিবে! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তারা যা ভাবে নাই, কালে মানুষেরই হাতে তা সংঘটিত হইয়াছিল। কত নক্ষত্র-স্পর্শী মন্দিরের ভগ্ন-চূড়া, কত ধ্বংশাবশিষ্ট

মঠের বিপুল কলঙ্ক-স্তূপ, সে ভগ্ন-চূড়া ও ভগ্ন-স্তূপ হইতেও সমধিক ধ্বংশপ্রাপ্ত, অপরিণামদর্শী মানুষের দুরপনেয় কলঙ্ক-কাহিনীর মর্ম্মস্পর্শী করুণ সাক্ষ্যস্বরূপ এখনো পৃথিবীর বুকে দাঁড়াইয়া আছে!

শুদ্ধানন্দকে নীরব দেখিয়া গুরুদেব স্নিগ্ধ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন ;—

"মঠের নিয়ম পূজা সেরে নিয়ে তুমি যতটা সময় এ কাজে দিতে পারো দিয়ো! কাজের সময় তোমায় বিরক্ত করে আমরা কেউ তোমার দৈব প্রেরণার স্রোতে কোন রকমে বিঘ্ন ঘটাবো না।

"বৎস! কর্ম্ম দৈবায়ত্ত! কর্ম্ম চেষ্টার ভিতরে আমরা যে উদ্দীপনা ও ভাব-সম্পদ পেয়ে থাকি, ঠিক জেনো, সেটা ভগবানেরই দান, মানুষের নিজস্ব কিছু নয় ; জ্যোৎস্না জিনিষটা যেমন সূর্য্যের আলো হয়েও চাঁদের মুখে সোণার হাসি ফুটিয়ে তোলে,তেমনি প্রতিভা জিনিষটা ভগবানের নিজস্ব হয়েও মানুষ বিশেষের হৃদয়ের ভিতর দিয়েই কাজ করে থাকে।

"তুমি যাঁর মূর্ত্তি গড়্‌তে যাচ্চ, তিনিই তোমার এ কাজে সহায় হবেন। তাঁরি স্নেহ ও আশীর্ব্বাদে একদিন সুপ্রভাতে স্বর্গের দেবতা তোমার অন্তরের সৌন্দর্য্য হতে নূতন রূপে জেগে উঠে আমাদের মঠটী উজ্জ্বল করে দেবেন, একথা ঠিক জেনো।

"কেমন শুন্‌চো? আমার কথা গুলো বেশ খেয়াল কর্‌চো তো?"

শুদ্ধানন্দ এবার মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে গুরুদেবের পানে চাহিল। শুদ্ধানন্দ মানুষটী দিব্য সৌম্য মূর্ত্তি, কিন্তু তার শীর্ণ ও চিন্তাক্লিষ্ট মুখ-মণ্ডলের উপর যেন কি এক অস্ফুট বিষাদের ম্লান ছায়া ভাসিতেছিল।

চিন্তার রেখাগুলি, দুঃখের অস্ত্রাঘাতের ক্ষত চিহ্নের মত, তার নিটোল ললাটের উপর গভীর ভাবে অঙ্কিত! কেবল তার সমগ্র মুখের পাণ্ডুরতা ছাপাইয়া দুটী কোটর-গত উজ্জ্বল চক্ষু যেন সকলকে বলিয়া দিতেছিল,—হৃদয়টী আগাগোড়া অনুশোচনার দাবানলে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে,—কিন্তু সে হৃদয়ের অনল তখনো নিভে নাই! শিখাহীন উত্তপ্ত জ্বলন্ত অঙ্গারের মত, সে সদ্য-দগ্ধ হৃদয়ের জ্বালা অতি ভয়ঙ্কর!

শুদ্ধানন্দ অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া অতি মৃদুস্বরে উত্তর করিল;—

"শুনেচি গুরুদেব! আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য! কিন্তু বার বারই আমার মনের ভিতর থেকে কেমন একটা সংশয় ঠেলে উঠে বল্‌চে, কাজের ভারটা আর কোন যোগ্যতর লোকের হাতে দিলে যেন ভাল হতো। অত বড় কাজ করার অধিকার আমার আছে কি না,—জানি না।"

গুরুদেব সস্নেহে শুদ্ধানন্দের মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন;—

"বৎস! তোমার যদি অধিকার না থাকে তবে [illegible] মঠে এমন কে আছে যে, তোমার চাইতে বেশী যোগ্যতার দাবী করতে পারে? শুদ্ধানন্দ! মানুষের চরিত্রে বিনয় ভাল, নম্রতা ভাল, কিন্তু যে প্রতিভা জগদীশ্বরের বিশেষ দান, তা নিয়ে দর-দস্তর করা ভাল নয়। ঈশ্বরের দান ঈশ্বরের প্রিয় কাজে সমর্পণ করে নিজে ধন্য হও। আর বেশী কথায় কাজ নাই! এখন বল দেখি,—তুমি এ কাজের ভার খুসী হয়ে গ্রহণ কর্‌লে তো?"

শুদ্ধানন্দ গন্ধহীন কাঠ-গোলাপের মত শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল;—

"না, গুরুদেব! কাজ এড়াবার ফন্দিতে কোনো অজুহাত

দিচ্চি না আমি। আমি বল্‌ছিলাম কি,—যার এ পর্য্যন্ত স্বর্গের দেবতাকে স্বপ্নে দেখার সৌভাগ্য টুকুও ঘটে উঠেনি, তাকেই স্বর্গের দেবতার রূপ কল্পনা করে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি কত্তে হবে? সে যে আমার কাছে আকাশ-কুসুম বলে বোধ হচ্চে। তবে গুরুদেবের আদেশ,—সাধ্যমত কর্ত্তব্যে ত্রুটি হবে না, এটুকু বল্‌তে পারি!"

গুরুদেব প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়া বলিলেন ;—

"বেশ কথা, তুমি সাধ্যমত কাজ কর্‌লেই আমরা আশাতীত ফল পাবো তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু হাতের কাজটী শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত, তোমার পূজা-অর্চ্চনা ও ব্রত-নিয়মের ঘটা কিছু কমাতে হবে। খাওয়া দাওয়া চাই। অত উপবাসের দৌরাত্ম্য সইবে না। আরো ঘুমানো দরকার। অত শত হেঙ্গাম বজায় রেখে, তার উপর কঠিন পরিশ্রম চাপালে তোমার রোগা শরীর টেঁকানোই শক্ত হয়ে উঠবে যে।

"ভালো শিল্পীর পক্ষে আরাম বিরাম দুটী জিনিষই আলো বাতাসের মতো। এ না হলে হাতের কাজ মনের মত সুন্দর হয়ে উঠে না। তুমি নিজের খুসী মতো কাজ করবে, তোমার কাজের সময় আমাদের কেউ তোমার চিত্রশালায় ঢুক্‌তে পাবে না। এখন থেকে কিছু দিনের মত তোমাকে আমরা সেই শান্তি-স্বরূপা দেবকন্যার হাতেই সঁপে দিলাম। এখন থেকে তাঁকেই তোমার নিত্য-সঙ্গিনী জ্ঞান করো!"

কথাগুলি শেষ করিয়া গুরুদেব সস্নেহ-নেত্রে শুদ্ধানন্দের শুষ্ক হৃদয়ে সুধা-সিঞ্চন করিয়া, মঠের ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। দেখিতে দেখিতে বহু-সূক্ষ্মাগ্র-খিলান-শোভিত প্রকোষ্ঠ গুলির মাঝে সে মুণ্ডিত-মস্তক, গৈরিক-বসন-পরিহিত, মহিমা-মণ্ডিত দীর্ঘ মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল!

যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ শুদ্ধানন্দ গুরুদেবের পানে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাকাইয়া থাকিল। তারপর সে মূর্ত্তি দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেলে পর, শুদ্ধানন্দের জীর্ণ বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া একটা অশ্রু-সিক্ত ব্যাকুল, উচ্ছ্বসিত দীর্ঘ নিশ্বাস বেগে বাহির হইয়া আসিল। সেখানে কিছুকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, সে দ্রুতপদে মঠের ভিতরস্থিত একটী নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ করিল।

সে কক্ষের ভিতরে সুন্দর বেদীর উপর মর্ম্মর নির্ম্মিত শুভ্র বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত। কক্ষের ভিতরটা তখনো সুগন্ধি ধূপ-ধূমে ছায়া-স্নিগ্ধ হইয়া থাকায়, দিনের আলো অনধিকার সঙ্কুচিত পূজারিণীর মত, অতি মৃদুভাবে প্রবেশ করিয়াছে!

সহসা হাওয়া লাগিলে যেমন করিয়া বর্ষার জলরাশির সকল আবেগ, সমুদয় ব্যাকুলতা তরঙ্গে তরঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া শ্যামল তট-রেখার উপর ভাঙ্গিয়া পড়ে, শুদ্ধানন্দও তেমনি তার সমুদয় ব্যথিত হৃদয়খানি বেদনায় আর্ত্তনাদে, রোদনে অশ্রু-ধারায়, উচ্ছ্বাসে দীর্ঘনিশ্বাসে, সে সুন্দর বুদ্ধ-মূর্ত্তির চরণতলে লুটাইয়া দিল। বেদীটী চারিদিক হইতে বেদনাক্ষিপ্ত হৃদয়ের তরঙ্গাঘাতে পীড়িত হইয়া উঠিল। সে বেদনাক্ষিপ্ত হৃদয়ের উর্দ্ধে,—স্থির-নিশ্চল, শুভ্র-সুন্দর, আকর্ণ-চক্ষু, প্রিয়-দর্শন, সহাস্য-বদন বুদ্ধদেবের করুণাময় মূর্ত্তি, জ্যোৎস্নারঞ্জিত নীল সাগরের উচ্ছ্বসিত বক্ষের উপর লম্বিত পূর্ণচন্দ্রের মত, শোভা পাইতেছিল!

শুদ্ধানন্দ ব্যথাভরা সুনীল নয়ন দুটী সে মর্ম্মর মূর্ত্তির ভাষাতীত করুণামাখা সুন্দর মুখটীর উপর রাখিয়া অতি করুণস্বরে বলিয়া উঠিল;—

"এখনো তোমার পরীক্ষা শেষ হয় নি দয়াময়? একবার বুকের ভিতরে চেয়ে দেখ, কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে তোমার অধম সন্তান তোমারি মুখের পানে আশা করে চেয়ে আছে; একবার তোমার সুন্দর প্রেমময় চোখ দুটী মেলে আমার দিকে তাকাও প্রভু! আমার হৃদয় থেকে কলঙ্কের দাগ মুছে যাক্—আমার কলুষিত চিত্তের ঊর্দ্ধ-গতি হোক! দয়া করে আমায় তোমার ক্ষমার যোগ্য করে তোলো। মনের হারাণো শান্তি কেমন করে ফিরে পাবো, সেই মন্ত্রটী আমায় শিখিয়ে দাও—"

শুদ্ধানন্দের বুক ফাটিয়া আজ যেন তার অসহ্য বেদনারাশি বার বার তার কণ্ঠরোধ করিয়া দিতেছিল। যেন কার নির্দ্দয় অঙ্কুশাঘাতে তার ফুলের মতো কোমল হৃদয়টা বার বার রক্তাক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল! শুদ্ধানন্দ মনে করিল, অসহ্য মনের যন্ত্রণা এবার বুঝি তাকে পাগল করিয়া দিবে!

তাই শুদ্ধানন্দ দুই হাতে মুখ আচ্ছন্ন করিয়া সেই বুদ্ধ-মূর্ত্তির পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে অশ্রু-ধৌত নির্ম্মল স্মৃতির ভিতরে অতীতের সুখ দুঃখের সমুদয় কাহিনীগুলি জীবন্ত বাস্তব ঘটনার বেশে আকাশের এক একটী তারার মত উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল! জীবনের উজান স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে, নদীর দুইকূলে অনেক লতা-বিতান কুঞ্জ-বন মুহূর্ত্তের জন্য স্বপ্নালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়া, আবার তৎক্ষণাৎ অন্ধকারের দিকে সরিয়া যাইতে লাগিল।

তরী যখন ঢেউএর উপর ভাসিতে ভাসিতে শৈশবের পদ্ম-ফোটা

সেঁওলা-ঘেরা ঘাটটীর কোলে আসিয়া ভিঁড়িল, অমনি শুদ্ধানন্দের মনে পড়িয়া গেল—সে সরলতা মাখা, আশার কিরণে সুন্দর, মধুর শৈশবের কথা! যখন সৌন্দর্য্যের প্রথম নেশা লাগিয়া তার সমুদয় হৃদয় ফুলে ফুলে মধুময় হইয়া গিয়াছিল! কল্পনার সাহায্যে দেবতার মূর্ত্তি গড়িয়া চিত্তের সৌন্দ্যর্য্য পিপাসা মিটাইবার জন্য সে কেমন পাগল হইয়া উঠিয়াছিল! তারপর নিপুণ সাধনার ফলে তার হৃদয়ে ধীরে ধীরে সৌন্দর্য্য-দেবতা জাগিয়া উঠিলেন, তার নব নব ভাস্কর কীর্ত্তি-কলাপ দেখিয়া সমপাঠীরা নিরাশ হইতে লাগিল,—তার শিক্ষকগণ বিস্মিত হইতে লাগিলেন!

তারপর যখন কলা-লক্ষ্মী নুপুর-শিঞ্জনে দশদিক মুখরিত করিয়া শুদ্ধানন্দের শিরে যশের অম্লান-শুভ্র মালাগাছি বাঁধিয়া দিতে আসিলেন, শুদ্ধানন্দ অমনি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। লক্ষ্মীর হাতের যশের মালা দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া উঠিল। আর তো তার যশের আকাঙ্ক্ষা নাই! সে যে এবার যশের বহু ঊর্দ্ধে স্থিত শাশ্বত আনন্দ-ধামের খবর পাইয়াছে! সে রাজ্যে যিনি বাস করেন তাঁকে পাইলে যে আর কিছুই পাইবার সাধ থাকে না!—তিনি ভক্তের অধীন ভগবান! শুদ্ধানন্দ মুহূর্ত্তের মধ্যে ভবিষ্যতের দিক নির্ণয় করিয়া জাবনের গতি স্থির করিয়া লইল। স্থির হইল, আর যশ বা কমলার ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন নাই। সে কোন একটী নির্জ্জন মঠে আশ্রয় লইয়া বাকী জীবনটা সেইখানে ভগবানের আরাধনায় কাটাইয়া দিবে।

একবার যখন মনে মনে কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গেল, তখন পিতার হৃদয় ভরা স্নেহ, মায়ের মমতা-জড়ানো অশ্রু, বন্ধুজনের নিস্বার্থ প্রীতি,

গৃহের অনাবিল আনন্দধারা,—কিছুই আর শুদ্ধানন্দের চঞ্চল মন বাঁধিতে পারিল না। এক দিন সকালে কাকেও কিছু না বলিয়া, না কহিয়া, সকল মায়া-বন্ধন কাটাইয়া, সে মুক্ত পাখী নীলাকাশে উড়িয়া গেল! অনেক দেখিয়া শুনিয়া, শেষে এখানকার মঠটী দেখিয়া শুদ্ধানন্দের অনেক দিনের প্রাণের পিপাসা তৃপ্ত হইল।

চারিদিকে কি সুন্দর প্রান্তরগুলি সবুজ রঙে অঙ্গ রাঙাইয়া, চারিদিক হইতে সবুজ সহস্র-দল পদ্মের মত, দিগন্তের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে! প্রান্তরের কোথাও পল্লব-নিবিড় গাছের স্নিগ্ধ নীল-ছায়া, কোথাও প্রান্ত-বাহিনী নির্ঝরিণীর শীতল সলিল-শীকর-স্পর্শে হরিৎ-পাণ্ডুর আভা! সেই সুন্দর প্রান্তরের বুকের ভিতর জাগিয়া উঠিয়া, সে বিশাল মঠের চূড়াটী যেন মেঘের রাজ্য পার হইয়া বরাবর নক্ষত্র-লোকে প্রবেশ করিয়াছে।

তার পর, মঠের ভিতর প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া সে ধীরে ধীরে দিনের পর দিন অসীম ধৈর্য্য সহকারে ও আশ্চর্য্য নৈপুণ্যের সহিত সে মঠের ভিতরটা তার শিল্প-কলার নব নব সৌন্দর্য্য ও স্বপ্নে মণ্ডিত করিয়া তুলিতে লাগিল। তার নিরীহ স্বভাব, সুন্দর চরিত্র ও ধর্ম্ম-কর্ম্মে নিষ্ঠা দেখিয়া মঠের গুরুদেব মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তিনি বুঝিলেন, শুদ্ধানন্দ তো কেবল সাধারণ ভিক্ষু নয়, তার ভিতরে ভাস্কর্য্য-শিল্পের অসাধারণ প্রতিভা বিকশিত। এই প্রতিভার মন-ভুলানো বেশাতি লইয়া সে সংসারের হাটে প্রবেশ করিলে, পৃথিবী তার গুণের ঋণ সহজে বিস্মৃত হইতে পারিত না! কিন্তু শুদ্ধানন্দ তো যশ ও অর্থের কামনা করে না! সে যে এই মঠের ব্রত-নিয়ম আচার-নিষ্ঠাগুলিকে জীবনের

মাঝে একান্তভাবে গ্রহণ করিয়া, মঠের বাহিরে বিশাল সূর্য্যালোকিত পৃথিবীটাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছিল !

সে যেমন একদিকে পরম যত্নে পাথর খুদিয়া খুদিয়া মর্ম্মর জালায়ন তৈরি করিয়া মঠের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিত, তেমনি অন্যদিকে অপরিসীম আগ্রহে সে মঠের কঠোর ব্রত-নিয়মগুলি-পালন করিয়া যাইত। মুখে তার কথা ছিল না, কর্ম্মে তার আলস্য ছিল না, ভগবানে অনুরাগ তার সমুদয় চিত্তখানি সর্ব্বদা সরস ও মধুময় করিয়া রাখিত। সে সব কথাই একে একে মনে পড়িল। তারপর বহু দিবস এই ভাবে চলিয়া গেল। মনে হইল, বাকী দিনগুলিও এই ভাবেই চলিয়া যাইবে। এমন সময় হঠাৎ একদিন সে ভীষণ পরীক্ষার দিন আসিয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু কৈ,—শুদ্ধানন্দ তো সে ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষা হইতে অক্ষত-দেহে বাহির হইয়া আসিতে পারে নাই !

মোটামোটি কথাটা এই :—মঠের নিয়ম অনুসারে, শুদ্ধানন্দকে মাঝে মাঝে পল্লীগ্রামে যাইয়া দীন-দুঃখীদের খবর লইতে হইত। যেখানে রুগ্ন পল্লীবাসীর সেবা করিবার কেহ নাই, সেখানে তাকে আপনার মত যত্ন করিয়া সেবা করা, যেখানে কোন অনাথ দরিদ্র কিছুতেই তার দৈনন্দিন অভাবটী পূরণ করিতে পারে না, মঠ হইতে তার প্রয়োজনটী সংগ্রহ করিয়া দেওয়া, এগুলি ছিল শুদ্ধানন্দের নিত্য কর্ত্তব্যের মধ্যে।

শীঘ্র হোক, বিলম্বে হোক,—সকল মানুষের অদৃষ্টেই যা ঘটিয়া থাকে, শুদ্ধানন্দের ভাগ্যেও তাই ঘটিয়া বসিল। একদিন কর্ত্তব্য-পালনের সূক্ষ্ম সূত্রটী অবলম্বন করিয়া ভগবান পুষ্প-ধনু একটী মাত্র ফুল-বাণ নিক্ষেপ করিয়া, শুদ্ধানন্দের হৃদয় বিদ্ধ করিয়া দিলেন।

মৃগনাভি

প্রভাতের শিশির-মাখা পদ্মের মত একখানা মুখ, আফিমের ফুলের মত রাঙা নেশা জড়ানো দুটী অধীরয়াত চক্ষু, শুদ্ধানন্দের হৃদয়ে বাসনার এমন উদ্দাম তুফান তুলিল. যাহাতে তার সংযমের বাঁধ আর কোনো মতেই টিঁকিল না! হৃদয়ের তরঙ্গে তপের নিষ্ঠা, কর্ণ-হীন তরীর মত, ডুবিতে ডুবিতে কোথায় ভাসিয়া গেল! কিন্তু কে সে ছলনাময়ী, যে শুদ্ধানন্দের মত সন্ন্যাসীর চিত্ত ধর্ম্মের বন্ধুর পথ হইতে প্রেমের রাঙা পথে ভুলাইয়া লইয়া আসিয়াছিল?—সে একটী নিঃস্ব পল্লী-কৃষকের গ্রাম্য বালিকা মাত্র! সরলা, সংসারের অভিজ্ঞতা-হীনা, পুরুষের চিত্ত হরণোপযোগী ছলনায় সম্পূর্ণ অসমর্থা। গাল দুটী তার বড় বড় বন্য-গোলাপের মত টকটকে লাল, চোখ দুটীর দৃষ্টি বসন্তের নীল সাগরের মত স্নিগ্ধ!

সে তার ক্ষুদ্র পর্ণ-কুটীরের মাঝে বসিয়া তার পীড়িতা দিদিমার সেবা করিতেছিল। কর্ম্মে কুণ্ঠা নাই, সেবায় শ্রান্তি নাই। তাদের পর্ণ-কুটীর-খানি লতা কুঞ্জের মত সুন্দর,—ভিতরটী এমনি পরিচ্ছন্ন যে, মেঝের উপর সূঁচ্‌টী পড়িলে তা অমনি তুলিয়া লওয়া যায়।

গৃহে মূর্ত্তিমান দৈন্য বিরাজমান। রোগীর চিকিৎসা ও পথ্যের কোনও বন্দোবস্ত নাই। বালিকাটী কেবল তার অন্তর সম্বল করিয়া পীড়িতার সকল অভাব, শুধু স্নেহ ও সেবায় ঘুচাইয়া দিবার জন্য, প্রাণপণে খাটিতেছিল। তাই দৈন্যের সঙ্গে মুখামুখি হইয়া বসিয়াও বালিকার দৈন্যের অভাবের কথাটী একবারও মনে পড়িতেছিল না!

এমন স্থানে, এ হেন সময়ে বালিকার সহিত শুদ্ধানন্দের দেখা! সহসা চারি চক্ষের মিলন হইল। দারিদ্রের গৃহে আসন্ন মৃত্যুর সকরুণ

দৃশ্য দেখিয়া শুদ্ধানন্দের হৃদয় গলিয়া গেল। সে মঠে ছুটিয়া গিয়া পীড়িতার জন্য ঔষধ পথ্য ও বালিকার জন্য খাদ্য-সামগ্রী বহন করিয়া যখন কুটীরে আবার ফিরিয়া আসিল, তখন বালিকা যথার্থই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে তো সন্ন্যাসীর নিকট কিছুই চায় নাই! মানুষ যখন দুঃখীর মন বুঝিয়া, না চাহিতে দুঃখ দূর করিতে আসে, তখন মানুষ যে দেবতা হইয়া উঠে! বালিকা পৃথিবীতে জীবনে এই প্রথম দেবতার দেখা পাইয়া ধন্য হইল!

এখন এই পীড়িতার উপলক্ষ্য করিয়াই দুজনে বার বার দেখা-সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। শেষকালে পীড়ার উপলক্ষ্য যখন দূর হইয়া গেল, তখনো দেখা-সাক্ষাৎ থামিল না। বালিকার দরিদ্র সংসারের সুখ-দুঃখের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও ক্রমশঃ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া উঠিতে লাগিল। শুদ্ধানন্দও সে দীর্ঘ কাহিনী শুনিতে কখনো অবসরের অভাব বোধ করিত না। এমনি করিয়া যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তারা দুজনে কাজের কথা ভুলিয়া গিয়া, অকাজের কথাই বলিয়া শেষ করিতে পারিত না!

একদিন সন্ধ্যার আকাশে তখন সবে একটী মাত্র তারা দেখা দিয়াছে,—শুদ্ধানন্দ কৃষক-বালিকার সহিত কথা বলিতে বলিতে, তাকে তাদের কুটীরের দ্বার পর্য্যন্ত পঁহুছাইয়া দিতেছিল। দুপাশে গাছ-পালার সারি,—মাঝে সরু একখানা বন-পথ। কোথাও লোকজনের সাড়া-শব্দ নাই, কেবল রাস্তার দুই কিনারা ঝিল্লীর একটানা সুরে বাঁধা!

এমন সময়, সহসা একটা চপল বাতাস ছুটিয়া আসিয়া, তাদের দুজনার চারিদিকে নব বসন্তের মদির ফুল-গন্ধ ছড়াইয়া দিয়া গেল! হঠাৎ

শুদ্ধানন্দের তরুণ হৃদয় উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। তার বহুদিনের রুদ্ধ তৃষ্ণা, উপবাসী হৃদয় হইতে বেগে বাহির হইয়া, তার তৃষিত অধর-মূলে একটী নবীন মধুর অনাস্বাদিত চুম্বনের মত ফাটিয়া পড়িতে চাহিল! নব বর্ষাগমে স্ফীত উচ্ছ্বসিত নদীর উদ্দাম প্রবাহ আজ শুষ্ক বালির বাঁধ মানিল না! শুদ্ধানন্দ বালিকার সলজ্জ কপোল-তল রঞ্জিত করিয়া একটী স্নেহার্দ্র কোমল চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিল! বালিকা নীরবে সন্ন্যাসীর চিত্তের অসংযত আবেগ সহিয়া গেল,—তাড়াতাড়ি মুখখানা ফিরাইয়া নিয়া মুগ্ধ সন্ন্যাসীর প্রথম চুম্বনটী ব্যর্থ হইতে দিল না!

সন্ন্যাসীর অধর-মূলে ফুলের পরশটুকু লাগিয়া রহিল, সে সুন্দর কপোলের স্পর্শ-স্মৃতি সন্ন্যাসীর হৃদয়ে মদের নেশার মত জড়াইয়া থাকিল! প্রণয়ের অঞ্জন চোখে মাখিতেই তার দৃষ্টির সম্মুখে নন্দন বনের যে স্বর্ণ-ছায়া ফুটিয়া উঠিল, শুদ্ধানন্দ মঠের আচার-নিষ্ঠা নিয়ম-উপবাসে তো কোন দিনও তার একটী কণক-রেখাও দেখিতে পায় নাই!

দেখা-সাক্ষাৎ আরো ঘন ঘন হইতে লাগিল। আশ্রমের সে শুদ্ধ সংযত সন্ন্যাসী আজ কোথায়? কোথায় তার চরিত্রের বল, সাধুতার অভিমান? শুদ্ধানন্দ আজ উত্তপ্ত, উদ্দাম, উন্মত্ত, উচ্ছৃঙ্খল, অন্ধ প্রেমিক! সে প্রেমেও হীনতার কলঙ্ক মাখা!

পল্লী-কুঞ্জের সরলা কৃষক বালিকা সন্ন্যাসীর প্রেমের স্রোতে পূজার ফুলটীর মত তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া চলিল। সন্ন্যাসীর চরণে নিজের সুখ চির-জীবনের মত প্রেমাঞ্জলি দিয়া, সে যখন রিক্ত-করে দাঁড়াইল, তখন স্বর্গে মর্ত্ত্যে তার আর প্রার্থনীয় কিছু ছিল না!

যে প্রেম স্বপ্নের মত স্বচ্ছ ও সুন্দর, সে যে স্বপ্নেরই মত ক্ষণভঙ্গুর

হইবে, ইহাতে অস্বাভাবিকতা কিছু মাত্র নাই। কৃষক-বালিকার হৃদয় অতি সস্তা দরে পাইয়া শুদ্ধানন্দ হৃদয় জিনিষটাকেই নিতান্ত খেলো জিনিষ বলিয়া মনে করিল। তাই কিছুদিন যাইতে না যাইতেই শুদ্ধানন্দের হৃদয়ে ক্লান্তির ছায়া দেখা দিল, ভালবাসার আবেগ সহসা অত্যন্ত শিথিল হইয়া আসিল।

এখন সে বালিকার অকৃত্রিম হৃদয় অপেক্ষা তার নিজের সুনাম-টুকু বেশী খাঁটী জিনিষ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তাই এখন তার সুনামের ছদ্মবেশটী রক্ষা করিবার জন্য এতই ব্যস্ত হইয়া উঠিল যে, বালিকার সুখ-দুঃখ-জড়িত ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দিতেও আর এখন তার কোনো প্রকার কুণ্ঠা বোধ হইল না। যার সরল হৃদয় সে নিজে প্রলুব্ধ করিয়াছে তাহাকেই আজ শুদ্ধানন্দের কলঙ্কিনী বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সরল কৃষক বালিকার প্রেমের সবটুকু মধু নিঃশেষে পান করিয়া আজ এতদিন পরে তার সুপ্ত-বিবেক জাগিয়া উঠিয়া বলিল,—তুমি অপরাধী! এ অসঙ্গত ধর্ম্ম-বিগর্হিত গুপ্ত প্রণয়ে নিজকে ধরা দিয়া তুমি যে অপরাধ করিয়াছ, তার আর মার্জ্জনা নাই। সুতরাং শুদ্ধানন্দ এখন বালিকার সংস্রব কাটাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

সহসা সন্ন্যাসীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বালিকা বিস্মিতা হইয়া গেল। অবশেষে সে একদিন শুদ্ধানন্দকে নাছোড়বান্দা হইয়া ধরিয়া পড়িল,—সহসা এ ভাবান্তরের কারণ কি, তাহা সরলচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল। বালিকার প্রশ্নটী সঙ্কোচ-জড়িত মধুর বিনয়ে পূর্ণ। শুদ্ধানন্দও কথাটা বালিকার নিকট এতদিন বলি বলি করিতেছিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া

বলিতে পারে নাই। আজ যখন বালিকা নিজেই উপযাচিকা হইয়া প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করিল, তখন শুদ্ধানন্দের মনে আর দ্বিধা রহিল না। সে কঠোর ভাবে উত্তর করিল,—

"তোমার সঙ্গে এ ভাবে জড়িয়ে পড়ে আমার পাপের বোঝা দিন দিন ভারি হয়ে পড়্‌চে। এ পাপ থেকে আমার আর উদ্ধারের আশা নাই। আমার এ অধোগতির কারণ তুমি,—তোমার ঐ স্বপ্ন-মাখা সুন্দর চোখ দুটী, তোমার ঐ সোণালি বিজুলীর মত মুখের মধুর হাসি-টুকু! ঐ না আমায় স্বর্গ থেকে নরকের দিকে তিল তিল করে টেনে নিচ্চে। ভগবান জানেন বেশী দোষ কার—তোমার না আমার!"

তারপর কণ্ঠের স্বর একটু নরম করিয়া শুদ্ধানন্দ আবার বলিতে লাগিল,—

"আমি যদি তোমার কাছে কোন অপরাধ করে থাকি, মাপ করো। তুমি এখনো ছেলে মানুষ, আমার কথা মন থেকে মুছে ফেল, এখনো তোমার সুখী হবার সম্ভাবনা একেবারে ঘুচে যায় নি।"

কথাগুলির বিষ বালিকার কোমল হৃদয় খানিকে নিষ্ঠুর মৃত্যুবাণে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল। শুদ্ধানন্দ তা বুঝিতে পারিল না। সে ভাবিল বালিকা এবার ক্রোধে ভৎর্সনায় অশ্রুতে বেদনায় বৈশাখী ঝড়ের মত তার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কিন্তু, আশ্চর্য্য, বালিকা একটী কথাও বলিল না, নদীর জল যেখানে অত্যন্ত গভীর সেখানে ঢেউয়ের তত বাড়াবাড়ি হয় না। সে নিঃশব্দে মৃত্যুর মত কঠিন, পাষাণের মত নির্ম্মম দুঃখের মত সত্য, কথাগুলি শুনিয়া লইয়া একটী নিশ্চল শুভ্র তুষার মূর্ত্তির মত কতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। তারপর সাগর জলের মত

নীলোজ্জ্বল সে কোমল চোখ দুটী তুলিয়া একবার শুদ্ধানন্দের মুখের পানে চাহিল। চাহনিতে নিরাশার বেদনা, অপরাধীর প্রতি ক্ষমা ও নিজের পরিণাম-হীন জীবনের একান্ত নিষ্প্রয়োজনীয়তা, সকলি এক সঙ্গে অতি সকরুণ সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হইয়া পড়িল। শুদ্ধানন্দ সে চোখের ব্যথিত সুন্দর অশ্রুমাখা অপূর্ব্ব চাহনি এ জীবনে কখনো ভুলিতে পারে নাই!

তারপর একবার—শুধু একটী বারের জন্য—বালিকা শুদ্ধানন্দের বাহু দুটী মৃদুভাবে তার দিকে আকর্ষণ করিল, শুদ্ধানন্দ তাহাতে বাধা দিতে পারিল না। তার পর তার দুটী অঞ্জলি-বদ্ধ করতলে কম্পিত-ওষ্ঠে একটী মাত্র কোমল অশ্রু-সিক্ত চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিয়া সে ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেল। নিকটের তরু-লতাগুলি সহসা মর্ম্মরিত হইয়া উঠিল। আকাশের তারাগুলি যেন সবগুলি একসঙ্গে কাঁপিয়া উঠিয়া ম্লান হইয়া গেল। শুদ্ধানন্দের মর্ম্মস্থলে যেন কোন অদৃশ্য দেবতা বিদ্যুতের কশাঘাত করিলেন। সে ব্যাকুল হইয়া পেছন হইতে চীৎকার করিয়া ডাকিল,—

"দাঁড়াও—একটু দাঁড়াও! অমন করে চলে গেলে? আমার শেষ কথাটী পর্য্যন্ত শুনলে না?"

বালিকা যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিয়া গেল,—গিরি নির্ঝরিণী যেমন তার শুভ্র রজত রেখাটুকু লইয়া ঘন-স্নিগ্ধ বনানীর ভিতরে অদৃশ্য হইয়া যায় একবারও পেছনে ফিরে না, অভিমানিনী তেমনি মৃদু মন্দ গতিতে সেখান হইতে চলিয়া গেল, আর একবারও পিছন ফিরিয়া চাহিল না।

তার পর তাদের দুজনে আর কখনো দেখা হয় নাই। এই ঘটনার

তিন চারি দিন পর, একদিন শুদ্ধানন্দ পল্লীর দিক হইতে অন্য-মনস্ক ভাবে মঠে ফিরিয়া আসিতেছিল। গাছ পালায় সংলগ্ন নীহারের দানাগুলি প্রভাতী রোদে উজ্জ্বল প্রবাল বিন্দুর মত জ্বলিতেছিল। মঠের দক্ষিণ প্রান্তে ছোট্ট নদীর শাখাটী তরল আলোকের চন্দ্রহারটীর মত উজ্জ্বল সবুজের উপর ঝিকমিক করিতেছে। মৃদু-স্রোতা নদীর ধারে ধারে নল-খাগড়া বেতসী প্রভৃতি গাছ-পালা বাঁধিয়া উঠিয়াছে।

নদীর পারের কাছাকাছি আসিয়া শুদ্ধানন্দ দেখিতে পাইল, জলের একপাশে জলা ঘাসের সহিত সাড়ীর আঁচলের মত কি একটা জিনিষ জড়াইয়া রহিয়াছে! সাড়ীর প্রান্তখানি প্রভাতের সোণালি রোদে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। শুদ্ধানন্দ ছুটিয়া আসিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তারপর ঘাস-জলের ভিতর হইতে কোলে করিয়া তুলিয়া আনিল—তারি উৎসব শেষের পরিত্যক্ত কণ্ঠ-মালা,—সে কৃষক-বালার মৃতদেহ-খানি! সেই ক্ষীণ-ভঙ্গুর দেহ-লতা, ঠোঁটের কোণে এখনো সে হাসিটুকু লাগিয়া আছে। মাথার চুলে কাদা মাখাইয়া গিয়াছে। পরণের কাপড়ে ঘাস ও সেঁওলা লাগিয়া গিয়াছে। শুধু মুদ্রিত চোখ দুটীর মাঝে যেন চির-নিদ্রার শান্তি বিরাজ করিতেছে!

চারিদিকে কৃষক বালিকার আত্মহত্যার কাহিনী বিদ্যুৎবেগে ছড়াইয়া পড়িল। যথাসময়ে তার রুগ্না বৃদ্ধা দিদিমার নিকট এ দুঃসংবাদ পঁহুছিল। কিন্তু স্নেহ যেখানে শুধু স্নেহ নয় জীবনের একমাত্র অবলম্বন, সেখানে কি শুধু মুখের কথায় মৃত্যুকে মানিয়া লওয়া সহজ কথা? বৃদ্ধা কাঁদিতে লাগিল,—কিন্তু তার নাতিনী যে আর নাই, এ কথা তার ব্যাকুল প্রাণ কিছুতেই মানিতে চাহিল না!

তারপর যখন সারাদিন কাটিয়া গিয়া সন্ধ্যা হইল, আর আর দিনের মত তার নাতিনী হাসিমুখে ফিরিয়া আসিল না, তখনো বৃদ্ধা ঘরে সাঁঝের মিট্‌মিট্‌ দীপটী উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, খোলা দরজায় বাহিরের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে চাহিয়া তার নাতিনীর অপেক্ষায় বসিয়া রহিল—তবু—বিধি-লিপি দারুণ—নাতিনী আর ঘরে ফিরিয়া আসিল না!

কিছুক্ষণ পর শুদ্ধানন্দ চোরের মত সে বাড়ীতে প্রবেশ করিল। গুরুদেব বৃদ্ধাকে শান্তনা দিবার জন্য তাকেই পাঠাইয়া দিয়াছেন। সে শূন্য প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিতেই তার অন্তরাত্মা জোরে কাঁপিয়া উঠিল! যেন অন্তর্য্যামী তার ভিতর হইতে জলদ গম্ভীর স্বরে বলিতে ছিলেন,—"নারীহত্যা করিয়া তুমি যে দুঃখিনীকে অনাথিনী করিয়াছ, তাকে আজ কি শান্তনা দিতে আসিয়াছ? ধিক্ তোমার আত্ম-প্রবঞ্চনায়!"

শুদ্ধানন্দের হৃদয় অসহ্য বেদনায় ছিঁড়িয়া যাইতেছিল, কিন্তু আজ তা প্রকাশ করিবার একটু স্থান অত বড় পৃথিবীতেও মিলিতে ছিল না। সে অভাগিনী তো ডুবিয়া মরিল, কিন্তু নদীর শীতল জলে তার কোন শান্তনা মিলিয়াছিল কি না সে সম্বন্ধে কেউ কোন সঠিক খবর দিতে পারে নাই।

কয়েকদিন ধরিয়া গ্রামে তার মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক রকম আজগুবি গল্প মুখে মুখে রটনা হইয়া অবশেষে পুরাণো হইয়া গেল। কেহ দুঃখিত হইল, কেহ বিস্মিত হইল, কেহ বা শুধু কৌতুহলাক্রান্ত হইল! কিন্তু কে জানিত এ সুখ-দুঃখের বিচিত্র জগতে সে ক্ষুদ্র কৃষক-বালিকারও ভালবাসিবার মত একটী মানুষ ছিল! কে ভাবিয়াছিল সে ভালবাসার মানুষ আবার সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী! লোকে কেমন করিয়া মনে

করিবে সে কৃষক-বালিকা যাকে ভালবাসিয়াছিল, কৃষক-বালিকার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিল, সে আর কেহ নয়,—সে ঐ গ্রামেরই মঠের নিষ্ঠাবান সাত্ত্বিক ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দ!

আরো কিছুদিন গেল; সে অভাগিনী কৃষক বালিকার ক্ষুদ্র জীবন-লীলার শোচনীয় ইতিহাসটুকু লোকের মনে ধীরে ধীরে ঝাপসা হইয়া আসিল। আরো কয়েক বৎসর পার হইয়া গেল। সংসারের ছোট বড়, ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, সকল ঘটনারই পরিণামে যা হইয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও তাই হইল! আমাদের এই পৃথিবীর সঙ্গে সে কৃষক-বালার যে একদিন সুখ-দুঃখের,জীবন মরণের সম্পর্ক ছিল, লোকে সে কথাও ভুলিয়া গেল। আমাদের এ পৃথিবীতে নিত্য নূতন সুখ, নিত্য নূতন দুঃখ। এখানে পুরাতন দুঃখের বোঝা লইয়া নিত্য নূতন সুখ-দুঃখের ঘর-কন্না চলে না।

শুদ্ধানন্দের ভালবাসা যে কৃষক-বালিকার নিকট মৃত্যুর রূপ ধরিয়া দেখা দিয়াছিল, এ সংবাদ পৃথিবীর আর কেউ না জানিলেও, শুদ্ধানন্দের নিজের মনের অগোচর ছিল না! শুদ্ধানন্দ যখনি একটু একলা হইত, যখনি কর্ম্মের কোলাহল হইতে প্রক্ষিপ্ত মনটী গুটাইয়া লইয়া সে চিন্তার রাজ্যে প্রবেশ করিত, অমনি হৃদয়ের কুহেলী ঠেলিয়া ভাসিয়া উঠিত,—সে কৃষক বালিকার করুণা-কোমল ব্যথিত-সুন্দর মুখখানি! সেই চোখ, সেই ভুরু! সেই ঘন কৃষ্ণ নেত্র-পল্লবের ছায়া-ঢাকা, মায়া-মাখা, সুনীল-নয়নের শেষ বিদায়-প্রার্থী সজল দৃষ্টিটুকু!

সে চোখ দেখিয়া শুদ্ধানন্দ অস্থির হইয়া উঠিত,—তার বিশ্রামের সময়টুকু তার নিকট কণ্টকময় হইয়া উঠিত। সে চোখ দুটী ভুলিবার

জন্য শুদ্ধানন্দ আবার কর্ম্মের কোলাহলের মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়িত—বিশ্রামের সময়টুকু তার কাছে এমনি অসহ্য হইয়া উঠিল!

আজ বুদ্ধ-মূর্ত্তির পদতলে অনেক কাঁদিয়াও যখন তার বুকের বোঝা হাল্‌কা হইল না, তখন শুদ্ধানন্দ উঠিয়া বসিয়া তার গৈরিক উত্তরীয় দিয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। সে মনে মনে স্থির করিল, কর্ম্মের ভিতর আত্ম-বিস্মৃত হইয়া থাকা বই তার আর উপায় নাই। সুতরাং গুরুদেবের আদেশ যেমন করিয়াই হোক, প্রতিপালন করিতেই হইবে।

তাই শুদ্ধানন্দ আজ অনেকদিন পর মূর্ত্তি গড়িবার জন্য আবার মঠের ভিতরকার চিত্রশালায় প্রবেশ করিল। কিন্তু কল্পনা-সুন্দরীকে রূপের ভিতরে ফুটাইয়া তুলিতে শিল্পীর যে আনন্দ, শুদ্ধানন্দের ম্লানমুখে তার আভাস টুকু কোথায়? সে নিপুণ শিল্পীর কবিত্বের অভিমান আজ কোথায় গেল? বাস্তবিক এমন নিরানন্দ হৃদয় লইয়া সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে যাওয়ার চাইতে মানুষের আর কি কঠিন শাস্তি হইতে পারে!

পাথর দিয়া মূর্ত্তি গড়িবার আগে, শুদ্ধানন্দ সরু তুলি দিয়া ভূর্জ্জ পত্রে ছবি আঁকিয়া দেখিল,—দেবতার মুখখানা কেমন হইবে, সমুদয় দেহ-খানি লাবণ্য-মঞ্জুরিত করিয়া কোন সুমধুর ভঙ্গিতে বেদীর উপর দাঁড়া করিয়া দিতে হইবে, হাতে স্বর্ণ-বীণা থাকিবে, কি শিশির-মণ্ডিত লীলা-পদ্ম থাকিলে মানাইবে বেশী! কিন্তু শুদ্ধানন্দ আজ বড়ই গোলে পড়িয়া গেল। সে অনেকগুলি ছবি আঁকিল বটে, কিন্তু একটীও তার নিজের মনের মতন হইল না। অবশেষে বিরক্ত হইয়া সবগুলি ছবিই সে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, বলিয়া উঠিল,—

"নাঃ!—আমার কলঙ্কমাখা মনের ভিতরে স্বর্গের ছবি কখনো ফুটে উঠতে পারে না! যে পুরুষ স্ত্রীলোকের সুন্দর দুটী চোখের মোহ এড়িয়ে উঠ্‌তে পার্‌লে না, তার আবার দেবতা গড়্‌বার সাধ!"

সৌন্দর্য্য জিনিষটা নারীর রূপে না পুরুষের চোখে, তা লইয়া নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা নস্য টিপিয়া তর্ক করিতে থাকুন;—কিন্তু শুদ্ধানন্দ মনে করিল, নারীর রূপই তার সকল দুর্গতির মূল। নারীই তাকে ধর্ম্ম ও সত্যের পথ হইতে ভুলাইয়া আনিয়া অধঃপতনের পথে লইয়া আসিয়াছে! শুধু শুদ্ধানন্দ বলিয়া নয়,—সৃষ্টির আদিম যুগ হইতে চিরকাল পুরুষ এ অবস্থায় শুদ্ধানন্দের মতই ভাবিয়া আসিতেছে। পুরুষের লাঞ্ছনাই যে নারী জাতির অপূর্ব্ব কীর্ত্তি এবং তাতে যে নিরীহ পুরুষ জাতির স্বকৃত কিছুমাত্র দোষ নাই—চরম দুঃখের সময়ও পুরুষ জাতি অহমিকার নিকট এটুকু শান্তনা দাবী করিতে ভুলে না!

ছবিগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া শুদ্ধানন্দ ধীরে ধীরে পশ্চিমের দিকের খোলা জানালা দিয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া দেখিল—বন-রাজি-নীল দিগন্তের ললাটে অস্তোন্মুখ রবি উজ্জ্বল পদ্মরাগ মণিটীর মত তরল লোহিত প্রভায় মণ্ডিত। অনেকক্ষণ সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে শুদ্ধানন্দের চোখ ঝলসিয়া গেল—তার মস্তিকের ভিতরকার শিরাগুলির মধ্যে যেন উজ্জ্বল সূর্য্য কিরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। শুদ্ধানন্দ তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে মুখ ফিরাইতেই মর্ম্মর বেদীটীর পানে দৃষ্টি পড়িল। মর্ম্মর বেদীর পানে চাহিবামাত্র শুদ্ধানন্দের মুখ হইতে একটি অস্ফুট চীৎকার বাহির হইয়া গেল। সে দেখিতে পাইল মর্ম্মর বেদীর উপর কে যেন দাঁড়াইয়া! সে আবারও

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া দেখিল বেদীর উপরে এক অপূর্ব্ব দেবী-প্রতিমা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! ক্ষীণ সুন্দর দেহ-লতাখানি ঢাকিয়া লাবণ্যের পুষ্পরাশি গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটিয়া উঠিয়াছে! রাঙ্গা ফুলের মত অধর দুখানিতে নন্দনের সুধা হাসি মাখা, স্বচ্ছ নীল চোখ দুটী ভরা স্বর্গের স্নেহ! তার রূপের জ্যোৎস্নায় গৃহের স্নিগ্ধ অন্ধকার-জাল আলো হইয়া গিয়াছে! সে রূপ দেখিয়া মনে হয়, স্বর্গের নারী-সৌন্দর্য্যের আদর্শ বুঝি এমনি অপরূপ,—কারণ মানুষ কি কখনো এত সুন্দর হয়!

শুদ্ধানন্দ অবাক হইয়া বিহ্বল-চিত্তে, মুগ্ধ-নয়নে, একদৃষ্টে সে রূপ রাশির পানে চাহিয়া থাকিল, মুখে একটীও কথা ফুটিল না! আর সে সায়াহ্নের মায়া-জাল-গঠিতা স্বপ্ন-অঞ্চলা দেবী-মূর্ত্তিও প্রফুল্ল দৃষ্টিতে সহাস্য মুখে শুদ্ধানন্দের বিস্ময়-বিহ্বল মুখের পানে চাহিয়া থাকিল— মুখে একটিও কথা নাই!

আবার চারি চক্ষের মিলন হইল! সে নীরব মিলনের নিবিড় সুখে সন্ধ্যার আলো-ছায়া-মাখা চিত্রশালা মধুর স্বপ্নময় হইয়া গেল, সে মিলনের ভিতর দিয়া স্বর্গ ও মর্ত্ত্য, ইহকাল ও পরকাল, মানুষ ও দেবতা ভালবাসার রঙ্গভূমে পরস্পর পাশাপাশি হইয়া দাঁড়াইল!

শুদ্ধানন্দ ধীরে ধীরে ভাবে বিভোর হইয়া আবার রঙ মাখানো সরু তুলিটী হাতে তুলিয়া লইল। তার পর কম্পিত করে সে তুলিকা পুনরায় রঞ্জন দ্রব্যে সিক্ত করিয়া লইল। তার পর ভূর্জ্জ-পত্রে সেই দেবীর ছবিটি আঁকিয়া লইতে সবে সুরু করিয়াছে,—এমন সময় সূর্য্যদেব সহসা বনান্তরালে হেলিয়া পড়িতেই গৃহের ভিতর ম্লান সন্ধ্যার মলিন

যবনিকা খানি পড়িয়া গেল। শুদ্ধানন্দ চাহিয়া দেখে, সে নীলায়মান যবনিকার অন্তরালে স্বর্গের দেবীটী কখন তার অগোচরে অদৃশ্য হইয়া গেছে! শুদ্ধানন্দ মন্ত্রমুগ্ধের মত চিত্রশালার পুঞ্জীকৃত রহস্যের ভিতরে একাকী অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। এমনি ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে ধূসর সন্ধ্যা যে কখন নক্ষত্র-রঞ্জিত অন্ধকারের ভিতরে মিলাইয়া গেল, শুদ্ধানন্দ তার কোন খবর জানে না!

শুদ্ধানন্দ সে দিন সারা রাত ঘুমাইতে পারে নাই। সে সারা রাত ভরিয়া তার ছিন্ন স্মৃতির ভিতরে সে স্বর্গের দেবতার স্বপ্ন-অঞ্চলটী ধরিবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া মরিয়াছে, কিন্তু মনের জড়তা-বিকল কুহেলী জাল ভেদ করিয়া সে স্বর্গের দেবতার কোন সন্ধান পায় নাই। তাই রাত ভোর হইতে না হইতে, শুদ্ধানন্দ জাগরণ-পাণ্ডুর ম্লান মুখে পাগলের মত ছুটিয়া চিত্রশালায় প্রবেশ করিল।

ধীরে ধীরে পূর্ব্বাকাশটী কাচের মত স্বচ্ছ করিয়া দিয়া প্রদোষের শুভ্র আলো ফুটিয়া উঠিল। তার পর ধীরে ধীরে গোলাপী আভায় পূর্ব্ব-দিক-বধূর কোমল গণ্ডস্থল রক্তিম হইয়া উঠিল। তার পর ফুল ফোটা গাছের শাখাপল্লব স্পর্শ করিয়া দয়েলের পূরবী তানে শূন্যের উপর হইতে তালে তালে পা ফেলিয়া উষার স্বর্ণ-রৌদ্র পৃথিবীর শ্যামল গালিচার উপর সোণালি বর্ডার টানিয়া দিল, শুদ্ধানন্দ চিত্রশালায় প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পাইল বেদীর উপর সেই চিন্ময় মূর্ত্তি! সে দেবতার চরণ-জ্যোতিতে মর্ম্মর-বেদী রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার দেবতা প্রভাতের মুক্ত আলোকে উজ্জলতর হইয়া দেখা দিয়াছে। সেই মুখ, সেই হাসি, অমিয়-মদিরা-মাখা ভুবন-মোহন চক্ষু!

সে মুখ দেখিয়া আজ শুদ্ধানন্দের সারা দেহ পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। রঞ্জনদ্রব্যে তুলিকাটী সিক্ত করিবার সময় আজ আর হাতখানা কাঁপিয়া উঠিল না। আজ যেন কোন আশ্চর্য্য ইন্দ্রজালে তার নিভৃত হৃদয়-ভাণ্ডার সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া, কোন সুপ্ত-জগত হইতে তার সমুদয় শিল্প নৈপুণ্য ফিরিয়া আসিল! সে সূক্ষ্ম, ক্ষিপ্র, লঘু, সুন্দর, উজ্জ্বল রেখাপাতে দেবতার মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু সে দেবতার সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া হঠাৎ শুদ্ধানন্দের হাত হইতে রংএর তুলি পড়িয়া গেল, তার মুখখানা শুক্না পাতার মত ফ্যাকাসে হইয়া উঠিল। এ তো অচেনা মুখ নয়! এ মুখের ছবি যে শুদ্ধানন্দের হৃদয়ের ভিতরে অক্ষয় উজ্জল বর্ণে চির-কালের জন্য মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে! সে চিত্রশালা উজ্জ্বল করিয়া মর্ম্মর বেদীর উপর যে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া ছিল, তার মুখ অবিকল সেই কৃষক বালিকার মত! শুদ্ধানন্দ অশ্রু-রুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিল,—

"ভগবান! রক্ষা কর আমায়! আমার মাথা অমন করে গুলিয়ে দিয়ো না। হাতের কাজটা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত যেন আমি পাগল হয়ে না যাই!"

সে দেবী-মূর্ত্তি মর্ম্মর বেদীর উপর স্থির নিশ্চল প্রতিমাটীর মত দাঁড়াইয়া রহিল, একটুও নড়িল না! যেন সে স্বর্গের দেবতা শুদ্ধানন্দের নিকট ইচ্ছা করিয়া ধরা দিবার জন্যই আসিয়াছিল। রেখা-চিত্র শেষ হইলে পর, শুদ্ধানন্দ মর্ম্মর প্রস্তর কাটিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিল।

দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, সে দেবী মূর্ত্তি বেদীর উপর বিকশিত সৌন্দর্য্য রাশির মধ্যে অসীম ধৈর্য্যের সহিত দাঁড়াইয়া

থাকিল। শুদ্ধানন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমে, আশ্চর্য্য নৈপুণ্যে পাথরের মূর্ত্তি তিল তিল করিয়া সৌন্দর্য্যের মাঝে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। শুদ্ধানন্দ পূর্ব্বে মঠের বিধি-নিয়ম পালনে কিম্বা পূজা অর্চ্চনায় কোন দিন ঢিল দেয় নাই। এখন তাতে পদে পদে ভুল হইতে লাগিল। কর্ম্মের নেশা তাকে এমনি বিভোর করিয়া দিল যে এখন তার আহার নিদ্রায়ও ভুল হইতে লাগিল। মধুর কর্ত্তব্য পালনের উৎসাহে দিন গুলি যেন জলের মত চলিয়া যাইতে লাগিল, সেদিকে শুদ্ধানন্দের ভ্রূক্ষেপও ছিল না। ধীরে ধীরে শরতের কাঁচা সোণার মত উজ্জ্বল রোদ হেমন্তের ঘন কুহেলী জালের ভিতর জড়িত হইয়া অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া উঠিল। শীতের কন্‌কনে হাওয়ায় গাছের তলায় হল্‌দে পাতার রাশি জড় হইতে লাগিল। তখনো সেই স্বর্গের দেবতা শুদ্ধানন্দের নিত্য সঙ্গিনী। পারত পক্ষে শুদ্ধানন্দ এখন চিত্রশালার বাহির হইতে চাহিত না, কারণ শুদ্ধানন্দের হাতের দেবতা তখনো সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই।

সেদিন গুরুদেব সন্ধ্যার পর ভগবান তথাগতের প্রকোষ্ঠে আরতি শেষ করিয়া আপন বিশ্রাম কক্ষে যাইতেছিলেন। আরতির সময় সপ্তসুরে মন্দিরের ঘণ্টাগুলি চৌতালে বাজিতেছিল। এখন সে ঘণ্টা-ধ্বনি থামিয়াছে কিন্তু বাতাসে সে ধ্বনির সূক্ষ্ম অনুকরণটী তখনো একেবারে থামিয়া যায় নাই। ধূপ ও অগুরুর সুগন্ধি ধূমে কুয়াশাচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠের মধ্যে দীপগুলি অতি ম্লানভাবে জ্বলিতেছিল। পথে শুদ্ধা-নন্দের সহিত গুরুদেবের দেখা। শুদ্ধানন্দের মুখ এখন একেবারে রক্তশূন্য হইয়া গিয়াছে, দেহ কঙ্কালসার, কেবল মুখের উপকার সবটুকু কমনীয়তা তখনো দূর হয় নাই।

সে মুখ দেখিয়া গুরুদেবের স্নেহময় হৃদয় সমবেদনায় ভরিয়া গেল। তিনি শুদ্ধানন্দের চোখে চোখ রাখিয়া বলিলেন,—

"বৎস! তোমার হাতের কাজ কতদূর হোলো তা জানিনে, এখন জানতেও চাইনে। কিন্তু তোমার শরীর দেখ্‌ছি যে একেবারে গেছে। অত খাটুনিতে দরকার নাই। বরঞ্চ তুমি দিন কয়েক সব কাজ ছেড়ে দিয়ে একটু জিরিয়ে নাও।"

শুদ্ধানন্দ অস্থিরভাবে উত্তর করিল,—

"মাপ করুন গুরুদেব! এখন কাজের মাঝখানে হঠাৎ থেমে গেলে, হয় আমি পাগল হয়ে যাবো, নৈলে মারা যাবো। যাতে তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করে তুলতে পারি, সেই আশীর্ব্বাদ করুন।"

গুরুদেব বিস্মিত হইয়া শুদ্ধানন্দের অস্বাভাবিক উজ্জ্বল সুন্দর মুখখানির পানে নীরবে কতক্ষণ চাহিয়া রহিলেন! শুদ্ধানন্দ আবারও স্বপ্নাবিষ্ট পথিকের মত বলিয়া উঠিল,—

"যাতে তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করে তুলতে পারি, সেই আশীর্ব্বাদ করুন, নৈলে স্বর্গের দেবীকে আর কদ্দিন আমার শিল্প-শালায় বন্দী করে রাখবো!"

গুরুদেবের বিস্ময়ের উপর নব বিস্ময়ের কুহেলীরাশি জমা হইতে লাগিল। গুরুদেব শুদ্ধানন্দের কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু এ সম্বন্ধে শুদ্ধানন্দের সঙ্গে আর কিছু কথাবার্ত্তা না বলিয়া তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিলেন—শুদ্ধানন্দের মস্তক বিকৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে,—তার পাগল হওয়ার আর বুঝি বেশী দেরী নাই!

মৃগনাভি

গাছের বোঁটায় ফুলটি যেমন তিল তিল করিয়া লোক চক্ষুর অন্তরালে বাড়িয়া উঠিয়া একদিন স্নিগ্ধ প্রভাতে পূর্ণ সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে, তেমনি শুদ্ধানন্দ একদিন সকালে চাহিয়া দেখে, তার হাতের কাজ আজ হঠাৎ শেষ হইয়া গিয়াছে। তার হাতে গড়া মর্ম্মর মূর্ত্তি আর সে স্বর্গের দেবী মূর্ত্তি দুইই তার চোখের সম্মুখে নব-বিকশিত পূর্ণ সৌন্দর্য্যের ভিতর লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। একই রকম দুটি মূর্ত্তি—অঙ্গে প্রত্যঙ্গে, ভাবে ভঙ্গিতে, মুখে চোখে কোথাও কোন রকম অমিল নাই। কোন্‌টি দেবতা, কোন্‌টি মর্ম্মর মূর্ত্তি, চোখে দেখিয়া হঠাৎ ঠাহর করিবার যো নাই!

সে মূর্ত্তি কার, আজ আর সে সম্বন্ধে শুদ্ধানন্দের মনে কোন রকম সংশয় ছিল না। সেই বসন্তের সাগরের নীল মাধুরী ভরা চোখ দুটি, সেই প্রস্ফুটিত বন্য গোলাপের মত রাঙ্গা রাঙ্গা গাল দুটি, সেই চঞ্চল বিদ্যুৎ জড়ানো ঠোঁটের হাসিটুকু! সেই মূর্ত্তি দুটি স্বর্গের দেবীরই হোক, অথবা শুদ্ধানন্দের স্বপ্নের দেবীরই হোক, দুটিই যে তার সেই কৃষক-বালার প্রতিমূর্ত্তি সে সম্বন্ধে শুদ্ধানন্দের মনে আজ আর কোন দ্বিধা রহিল না। শুদ্ধানন্দ বাষ্পাকুল নয়নে স্বর্গীয় দেবীর পানে চাহিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল,—

"দেবি, স্বপ্নের সুন্দরি আমার! এখনো তুমি এ পাপিষ্ঠ হত-ভাগার কথা ভুলতে পারো নি? স্বর্গ থেকে তোমার হত্যাকারীর কাছে ফিরে এসেচো?"

এবার স্বর্গের দেবী কথা কহিল। নন্দনের মায়া-বীণার মধুর ঝঙ্কারের মত কোমল সঙ্গীতময় কণ্ঠস্বর! সে বলিল,—

"এখনো যে তোমায় আমি প্রাণভরে ভালবাসি। তাই এসেচি—বন্ধু, স্বর্গের আনন্দ ফেলে তোমার কাছে ছুটে এসেচি। তোমাদের পৃথিবীর ভালবাসার হ্রাস বৃদ্ধি জোয়ার ভাঁটা আছে, কিন্তু স্বর্গের ভালবাসা যে অক্ষয়!"

সেই কৃষক বালিকার পরিচিত কণ্ঠস্বর!

দেবী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিয়া উঠিলেন,—

"জান না কি, বন্ধু! স্বর্গ মর্ত্ত্য দুইই ভগবানের শৃঙ্খলে বাঁধা? মানুষের ভালবাসা—অক্ষয় মৃত্যুহীন! তাই মৃত্যুর পরপারেও বুকের ভিতর অক্ষয় ভালবাসা নিয়ে তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি! আজ তোমায় বল্‌তে এসেচি, আমাদের যিনি প্রেমের রাজা, তাঁর কাছে তোমাদের মঠের একটী সামান্য নিয়ম না মানাটা কোনও অপরাধই নয়। কিন্তু সে অজুহাতে অমন নিষ্ঠুরভাবে একটা হৃদয় ভেঙ্গে দেওয়া,—কিন্তু প্রেমময় তোমায় ক্ষমা করবেন—

শুদ্ধানন্দের হৃদয়ে যেন শত শত ভুজঙ্গ এক সঙ্গে দংশন করিল। সে দুই হাতে নিজের মুখ ঢাকিয়া মাতৃহীন শিশুর মত কাঁদিয়া উঠিল। তারপর অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে বলিতে লাগিল,—

"ভগবান,—প্রেমময়,—কোথায় তুমি! আজ আমায় বজ্ররূপে দেখা দাও। তোমার বজ্রে আমার হৃদয় বিদীর্ণ ক'রে, আমার সকল জ্বালা জুড়িয়ে দাও, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক!"

স্বর্গের দেবীর মুখখানি মধুর হাস্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তার মধুর কিরণে যেন চিত্রশালা জ্যোৎস্নাময় হইয়া গেল। দেবী আবারও মধুর কণ্ঠে সুধা বৃষ্টি করিয়া বলিলেন,—

"না, না—প্রিয়তম! আমাদের স্বর্গে প্রতিশোধ বলে কোনো জিনিষ নাই। মানুষের স্বার্থ-গন্ধহীন নির্ম্মল ভালবাসা দিয়ে স্বর্গের রাজ্য তৈরী হয়েছে। সেখানে একমাত্র ভালবাসারই আনন্দ স্বর্গ-রাজ্য আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সেখানে বজ্র থাকবে কেমন করে? আমাদের প্রেমের স্বর্গে ভালবাসা কোন প্রতিহিংসার আকাঙ্ক্ষা রাখে না। সে প্রেম ক্ষমার আলোকেই সুন্দর হয়ে ওঠে। তোমার হৃদয় এখন অশ্রু-গঙ্গায় স্নান করে পবিত্র হয়ে গেছে। এখন ভগবান তোমায় প্রেমের রাজ্যে আস্‌তে দেবেন।

তাই আমি এসেছি প্রিয়তম! প্রেমের ভিতর যে আনন্দের আরম্ভ আছে,—শেষ নাই, সেই প্রেমের সমাচার নিয়ে আমি পরলোক হতে তোমার কাছে বল্‌তে এসেচি,—এখন প্রেমময় ভগবান তোমায় তাঁর প্রেম রাজ্যে আস্‌তে দেবেন।"

শুদ্ধানন্দের সমুদয় আবেগময় হৃদয় নির্ম্মল অশ্রু-ধারায় তার নয়ন-পথে বাহির হইয়া আসিতে চাহিল। সে তার প্রকম্পিত হাতখানি সে দেবতার দিকে আগ্রহে বাড়াইয়া দিয়া, কাতর অশ্রু-ভরা কণ্ঠে উত্তর করিল,—

"তবে,—তবে আর দেরী করে কাজ কি ভাই! তুমি এখনি আমার হাতে ধরে সেখানে নিয়ে চল। পৃথিবী এখন আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে!"

দেবী স্নেহ-মধুর স্বরে বলিলেন,—

"আর একটু অপেক্ষা কর, আগে তোমার গঠিত শান্তি মূর্ত্তিটি মঠে প্রতিষ্ঠিত হোক।"

এই বলিয়া সেই সুন্দর দেবী-মূর্ত্তি উজ্জ্বল সূর্য্য-কিরণের অঙ্কুরের মত সে ঘরের ভিতর ছড়াইয়া গিয়া, দিনের শুভ্র আলোকের মাঝে মিলাইয়া গেল; দেবীমূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেলেই শুদ্ধানন্দ ছিন্ন-মূল সহকার তরুর মত তার স্বহস্তে রচিত দেবী প্রতিমার পদ-তলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। * * *

সে দিন বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব তিথির পূর্ব্বদিন। চিত্রশালার সদর দরজা বন্ধ। আজ কেউ সারাদিন শুদ্ধানন্দকে দেখে নাই। সেখানে কারো যাইবারও অধিকার নাই। অবশেষে সন্ধ্যারতির সময়ও যখন শুদ্ধানন্দকে কেহ দেখিতে পাইল না, তখন গুরুদেব অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। আরতি শেষ হইলে পর, তিনি মঠের আর ২।৩টী ভিক্ষু সঙ্গে লইয়া চিত্রশালা কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন।

কক্ষের নিকট আসিয়া দরজায় আঘাত করিতেই দরজা খুলিয়া গেল। সে দিন বসন্তের শুক্লা চতুর্দ্দশী। শীতের জড়তা দূর হইয়া আকাশে বাতাসে বসন্তের রঙ্গীন নেশা জড়াইয়া ধরিয়াছে। দরজা খুলিতেই বাহিরের নিষ্কলঙ্ক জ্যোৎস্না ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া সমুদয় চিত্রশালা উজ্জ্বল করিয়া দিল।

গুরুদেব ভিক্ষুদিগের সহিত চিত্রশালায় প্রবেশ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন,—শুভ্র বেদীর উপর মর্ম্মর গঠিত সুন্দর নারী মূর্ত্তি! সারা অঙ্গে লাবণ্যের অম্লান ফুলরাশি ফুটিয়া উঠিয়াছে। মুখখানি স্নিগ্ধ-হাস্যে সুমধুর, চোখ দুটী দিয়া যেন শান্তির অমিয় নির্ঝর ঝরিয়া পড়িতেছে। শুদ্ধানন্দের ভাস্কর্য্য-কীর্ত্তির আশ্চর্য্য নিদর্শন দেখিয়া গুরুদেব ও ভিক্ষুগণ অনেকক্ষণ ধরিয়া সে দেবীমূর্ত্তিই দেখিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে যখন চারিদিকে চোখ পড়িল, তখন গুরুদেব উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে দেখিতে পাইলেন, সে মর্ম্মর মূর্ত্তির পদতলে শুদ্ধানন্দ লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া আছে। গুরুদেব ব্যথিত হৃদয় স্নেহে ভরিয়া লইয়া অতি মধুরকণ্ঠে ডাকিলেন—"বৎস! শুদ্ধানন্দ!"

কেহ উত্তর করিল না।

তারপর সকলে ধরা-ধরি করিয়া শুদ্ধানন্দকে চিত্রশালা হইতে তার শয়ন গৃহে লইয়া গেল। অনেকক্ষণ সেবা শুশ্রূষার পর, শুদ্ধানন্দ আজ তার পুরাণো পরিচিত স্নেহের মুখগুলি দেখিয়া তার বিচিত্র সুখ-দুঃখ-জড়িত তরু-লতা-ঘেরা পৃথিবীটি কোনো মতে চিনিয়া লইল। সে সুস্থ হইলে পর গুরুদেব তাকে প্রফুল্ল করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন,—

"শুদ্ধানন্দ! আশ্চর্য্য দেবীমূর্ত্তি গড়েচো তুমি! মানুষের হাতে স্বর্গের দেবতার ছবি যে অতটা ফুটে উঠ্‌তে পারে, তা আমি জানতাম না। ধন্য তোমার সাধনা,—সার্থক তোমার পরিশ্রম!"

শুদ্ধানন্দের নিষ্প্রভ চোখ দুটী অস্বাভাবিক আলোকে জ্বলিয়া উঠিল।

সে উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল,—

"মাপ করুন গুরুদেব, আমি চক্ষে দেখে দেবতার মূর্ত্তি গড়ে তুলেচি, এতে আমার নিজের কোন বাহাদুরী নেই।"

গুরুদেব শুদ্ধানন্দকে আর কোন কথা না বলিয়া ভিক্ষু উপগুপ্তকে শুদ্ধানন্দের উত্তপ্ত মস্তকে আর্দ্র কমল দ্বারা বীজন করিতে আদেশ করিয়া বাহিরে আসিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভাবিলেন, শুদ্ধানন্দের সম্পূর্ণ মস্তিষ্ক-বিকার ঘটিয়াছে।

মৃগনাভি

বসন্ত পূর্ণিমার মধু-রাত্রি! স্নিগ্ধ আকাশ জ্যোৎস্না লাগিয়া নীল দর্পণের মত স্বচ্ছ দেখাইতেছে। বসন্তের হাওয়া বনফুলের গন্ধে ভার হইয়া ধীরে ধীরে বহিতেছে। শ্যামাঙ্গিনী প্রকৃতির নিবিড় আনন্দ যেন আজ ফুলে ফুলে বিশ্বের চারিদিকে ফাটিয়া পড়িতেছে!

আজ ভগবান অমিতাভের পবিত্র জন্ম-তিথি। মঠের ভিতরে সুবৃহৎ ভজনা-গৃহ পুষ্পে মাল্যে, চন্দনে গন্ধে, ধূপে দীপে উৎসবের উজ্জ্বল-বেশ ধারণ করিয়া হাসিতেছে। ভজনা-গৃহের প্রাঙ্গনের কেন্দ্র-স্থলে শুদ্ধানন্দের স্বহস্ত গঠিত মর্ম্মর-নির্ম্মিত সুন্দর শান্তি-মূর্ত্তি যথোচিত মঙ্গলাচার সহকারে স্থাপিত হইয়াছে। দেবীমূর্ত্তির সুন্দর কণ্ঠদেশ অসংখ্য ফুল-মালার ভারে ঢাকিয়া গিয়াছে। চারিদিকে অসংখ্য উৎসব-দীপে চঞ্চল কনক-প্রভা!

চারিদিকে উৎসবের বীণা, মৃদঙ্গ, রবাব বাজিতেছিল। গুরুদেব স্নিগ্ধ-গম্ভীর স্বরে ছন্দসহকারে অমিতাভের উদ্দেশ্যে মঙ্গল-মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। তাঁকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ঘেরিয়া বসিয়া মঠের ভিক্ষু-সম্প্রদায় থাকিয়া থাকিয়া তারস্বরে সে স্নিগ্ধ-গম্ভীর মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করিতেছিল। সকলের মিলিত কণ্ঠ-স্বর সাগরের জলোচ্ছ্বাসের মত থাকিয়া থাকিয়া বায়ু-মণ্ডলে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। শুদ্ধানন্দও সেখানে উপস্থিত ছিল। কিন্তু তার মন আজ উৎসবের আনন্দের ভিতর ছিল না। পর্ব্বতের শিখরে দাঁড়াইয়া পদতলে লুণ্ঠিতা বিশীর্ণা গিরি-নদীটি যেমন একটী সরু রজত-রেখার মত দেখায়, প্রান্তরে সবুজ ঢেউএর মাঝে মাঝে খয়েরি রংএর পল্লীগুলি মরীচিকার মত দেখায়,

তেমনি সেদিনকার উৎসব, সেখানকার আনন্দ, সকলি শুদ্ধানন্দের চোখে সুদূর স্বপ্নের মত ঠেকিতেছিল!

তখন এ পৃথিবীর কাজ তার শেষ হইয়া গেছে—স্বর্গের সোনার স্বপন তার চোখের উপর ভাসিতেছিল! তাই সে সমুদয় উৎসবের আনন্দ ভুলিয়া গিয়া, তাঁর স্ব-হস্ত নির্ম্মিত সুন্দর শান্তি দেবীর মুখের পানে ভাবে বিভোর হইয়া তাকাইয়াছিল! তার মুখ দেখিয়া মনে হয়, যেন সে ভাবিতেছিল, এ উৎসব-দৃশ্য, আনন্দের খেলা, সকলি ক্ষণিক,—কেবল ঐ শান্তি-দেবীর মুখে সে কৃষক-বালার সুন্দর সাদৃশ্যটুকুই জগতের একমাত্র নিত্য পদার্থ!

চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সহসা শুদ্ধানন্দ চমকিয়া উঠিল; যেন তার দেহ-মন এক অপূর্ব্ব বৈদ্যুতিক তরঙ্গে দুলিয়া উঠিল! শুদ্ধানন্দ দেখিতে পাইল,—সে পাষাণ-মূর্ত্তির মাথার উপর ঊষার আলোক-পুঞ্জের মত আর এক স্বর্গীয় দেবী-মূর্ত্তি আপনি গঠিয়া, শূন্যের উপর পদ্মের কুঁড়ির মত পা দুখানি রাখিয়া শুদ্ধানন্দের মুখের পানে চাহিয়া হাসিতেছে।

এ মূর্ত্তিওসেই কৃষক বালিকার!—যে এ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার কালে শুদ্ধানন্দকে ভালবাসিবার অপরাধে স্বেচ্ছায় মৃত্যু-দণ্ড গ্রহণ করিয়াছিল! যে শুদ্ধানন্দের সম্মুখে, দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, শান্তির-করুণা স্নিগ্ধ মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া, তাকে সৌন্দর্য্যের আদর্শ ও কর্ম্মের উদ্দীপনা যোগাইয়া দিয়া তার শান্তি-দেবীটীকে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের মধ্যে মূর্ত্তিগতী করিয়া তুলিয়াছে;—যে ঐ শান্তির মূর্ত্তির ভিতরে আপনার অঙ্গের অপরূপ সুষমাটুকুই

শুদ্ধানন্দকে দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে ;—সেই বসন্তের সাগরের মধুর নীলিমা-জড়িত চক্ষু, সেই রাঙ্গা বিদ্যুৎ মাখা মুখের মধুর হাসিটুকু !

শুদ্ধানন্দের মনে হইল, সে স্বর্গের দেবী তার মৃণাল-তুল্য বাহু দুটী তার দিকে বাড়াইয়া দিয়া স্নেহপূর্ণ নয়নে তাকে 'এসো' 'এসো' বলিয়া স্বর্গের পানে ডাকিতেছে !

চারিদিক হইতে উৎসবের আনন্দ-স্রোত বহিতেছিল। শুদ্ধানন্দ সহসা উন্মত্তের মত 'যাই' 'যাই' বলিয়া শূন্যের পানে দুই বাহু মেলিয়া দিয়া তীব্র-কণ্ঠে চীৎকার দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। কিন্তু শীর্ণ দেহ, অক্ষম চরণ তার পরিপূর্ণ প্রাণের আবেগ ধারণ করিতে পারিল না ;—শুদ্ধানন্দ মাটীর উপর জোড়ে উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল।

সঙ্গীতের গভীর উচ্ছ্বাসের ভিতরে সহসা উৎসবের দীপাবলী ম্লান হইয়া গেল। গুরুদেব তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া অচেতন শুদ্ধানন্দের মণিবন্ধে নাড়ীর সন্ধান করিলেন। মঠের আর আর ভিক্ষুগণ সকলে ছুটিয়া আসিয়া শুদ্ধানন্দকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তখন শুদ্ধানন্দের জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্কের অভিনয় সমাপ্ত হইয়া, রঙ্গভূমির উপর রহস্যের নীল যবনিকা পড়িয়া গিয়াছে। নীরব উৎসব প্রাঙ্গনে, ম্লান দীপালোকে, শুদ্ধানন্দের মুখখানি বিমল শান্তির কিরণে ঝিকমিক করিতে লাগিল !

সমাপ্ত।